প্রতাপকুমার সিংহ ও

প্রশান্তকুমার সিংহকে দিলুম

ভূমিকা

...ল থেকে বকামি করে বেড়ানোর দরুণ—সচরাচর চক্ষু মারফৎ ...পাতা পাল্টানো রূপ যে চিরাচরিত পড়াশোনা করার প্রথা ...—তা আয়ত্ত করা স্থুভো ঠাকুরের সম্ভব হয়নি। নিজের পড়ার ... নিজেই তৈরি করেছে ও' বই, তার পর—তাই পড়ে হতে হয়েছে ... বিদ্বান। ও' বই রচনা করেছে পায়-পায়, আর তার পাতাও উল্টেছে পা দিয়ে। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে ও' নিজে শ্রীহীন স্থুভো ঠাকুর হলেও ও'র চরণজোড়া শ্রীচরণকমলেষু বিশেষ।

স্থুভো ঠাকুর বলে :—যে, এ-সব ব্যাপারে ও'র সঙ্গে একমাত্র যারা ...বেদ রচনা করেছিল তাদের সঙ্গেই নাকি তুলনা দেওয়া চলে। ...—(কথাটা নিছক ডেঁপোমি হলেও শুনতে মন্দ লাগে না) এ ছাড়া ও'র ধারণা ইউনিভারসিটিতে 'পাস করার' পাশ কাটিয়ে, বে-সাধারণের মত ও' যেটুকু গা বাঁচাতে পেরেছে—তা কখনোই গায়ের জোরে নয়, ও'র পায়ের জোরেই। তাই এ-নিয়ে ইনফিরিঅরিটি কমপ্লেক্স-এর বদলে ও' অহঙ্কারে আটখানা।

ও'র এই নিজের তৈরি বইএর পাতা ওল্টাতে গিয়ে নানা ঘাটের ...ল খেতে হয়েছে, নানা ঘাটে বাড়াতে হয়েছিল পা—কখনো ও-পারে,

কখনো এ-পারে, কখনো অষ্ট্রিয়ায়, কখনো আসামের আনাচে-কানা
কখনো ভেনিসে, কখনো বাস্তারের মারিয়া ঘণ্ড-এর 'গড়লে'। উড়িষ
নানা উটকো গ্রামে—গঞ্জাম, কন্ধমাল এমনিতর কত জায়গা
কখনো অন্ধ্র দেশে, কাশ্মিরে, কখনো কেপ্-কমোরিনে। এই স
জায়গায় সুভো ঠাকুর কোথাও ছবি আঁকা শিখিয়েছে মেয়ে
কলেজে, কোথাও বা ওঁকে রাজা সাহেবের হতে হয়েছে মদের আস
মোসাহেব। কখনো বা হাজির হয়েছে ও'র পৈতৃক জমিদারির খা
এবং ব্যাংকিং বিজ্‌নেসের সুদের টাকা আদায় করতে এবং কখ
আবার পিতৃবিয়োগের পর—পূর্ব-পুরুষের সেই অর্জিত ধন-সম্পত্তি বি
করার উদ্দেশ্যে। তাইতো যেমন ও'র একেবারে নখদর্পণে অ
ও-দেশী আদমীদের আগা-পাস্তলা, তেমনি জানা আছে এ-দেশী ন
মহলের অন্দর-মহলের—নানা আজব ঘটনা, নানা বিচিত্র কীর্তি-কলা
যে ঘটনাগুলো অনেক সময় ও' নিছক বানিয়ে লিখলেও—নাকি নি
সত্যের ভিত্তিতে ভর করে দাঁড় করানো।

সুভো ঠাকুরের নিশ্চিৎ মাথায়, একটু কেন, বেশ ছিট আছে;
নৈলে কখনো বলতে পারে, 'ও' ছাড়া এ-দেশে সকলেই ন
কপিক্যাট! —এমন কি গভর্নমেন্ট অবধি।' তাইত ও' আজক
প্রায় প্রচার করে বেড়ায়—পনের বছর আগে ও'র বয়েস যখন
কুড়ির কোঠায়, তখন ও' ভবিষ্যৎবাণীর মত যে কাজ করেছিল, ত
জাতীয়-সরকার তাই করবার জন্যে কতরকম প্যাঁচ্ আর পাঁয়ত
কসছে—যার বাহাদুরিতে সরকার-বাহাদুর আজ নিজেই বিভ্র
বেসামাল!

ও'র আত্মীয়-স্বজনের দেওয়া 'ঠাকুরবাড়ির কালাপাহাড়' এই অ

অ্যাক্সেপ্ট করায় আর তাদের বিস্ফারিত চক্ষুর ওপর দিয়ে সপ্ত পুরুষের বনেদী জমিদারি অচল মনে করে খতম্ করে দেবার যে ভুজংভং দেখিয়েছিল—আজ এক গালে সরকার-বাহাদুরের, আর এক গালে প্রজাদের থাপ্পড় খেয়ে সেই সব আত্মীয়-বন্ধুদের সেই জমিদারি ছেড়ে দেবার ধুম আরম্ভ হয়ে গেছে। এই সব জমিদাররা বিশেষ দিনে রাজাবাহাদুর খেতাব পাবার আয়োজনের মত আয়োজন শুরু করেছে সিংহাসন-ত্যাগ উৎসবের। গুড়ো ঠাকুরের এ-ব্যাপারে বেজায় আপসোস যে একাধারে সরকার আর সম্মিলিত প্রজাবৃন্দের মিলিত হাতের 'মিঠে কড়া দিড়িকা' মত মিষ্টি চড়, আর সিংহাসন-ত্যাগ-পর্বের উৎসব, এ-দুটোই ওঁর জীবনে বাদ পড়ে গেল। —সত্যি, আপসোস হবার কথাই বটে! ও যেন সত্যিই অনুশোচনার সঙ্গে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, যে—অবনী জমাদার-মার্কা জমিদার আত্মীয়দের ওঁকে বংশের কুলাঙ্গার বলার বিলকুল জাস্টিফিকেশন আছে।

যাই হোক, আসলে আমার এই গুড়ো ঠাকুরকে নিয়ে এত আলোচনার কারণ কিন্তু তাঁর জীবনী লেখার জন্যে নয়—ওর বাংলা সাহিত্যের বাজারে—উপন্যাস অলাতচক্রের আবির্ভাব নিয়েই তো।

ধীরেন সরকারের কাগজ 'অলকান্ত' এই উপন্যাস নামধারি চিত্রটির অনেকগুলো পরিচ্ছেদ 'অলাতচক্রের' চণ্ডী অলক বন্দ্যোর মতই নানা নামে, নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং শেষের গোটা দশেক টুকরো প্রসাদ সিংহ আর শক্তি দত্ত এবং তৎপরে প্রসাদ সিংহ ও তারাশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত মাসিক

'চলন্তিকা'য় 'অলকজ' আর 'গড বলিকুদ' এই নামে বেরিয়ে—সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল বাজার মারবার। কিন্তু ফলাফল এ-ব্যাপারে কি হয়েছিল তা এক ভগবানই জানেন—এই খড়ি, পাঠকরাই বলতে পারবেন ভাল করে! এ-ব্যাপারে অবিশ্যি স্বভো ঠাকুর নিজে আমাকে কিছু নিবেদন করে নি।

—যাই হোক, স্বভো ঠাকুরের সঙ্গে আমার যতই হরিহর আত্মা দোস্তি থাকুক না কেন, নদের নৈয়ায়িকের কায়দায় ওঁর সঙ্গে হল আমার একদিন তুমুলকাণ্ড তর্কাতর্কি।

স্বভো ঠাকুর বলে:—ও যে-কোনো দিব্যি গালতে রাজী, যে 'অলাতচক্রকে' উপন্যাস বলে বুক এমপোরিঅম্-এর মালিক প্রশান্ত সিংহের কাছ থেকে চার ডবল টাকা আদায় করেছে—এ-দোষারোপ, ও কখনই সহ্য এবং স্বীকার করবে না। ও 'অলাতচক্রকে' উপন্যাসের গুণ বিশিষ্ট একটি গুণধর বলে সত্যিই বিশ্বাস করে। তারপর আমার কানের খুব কাছে মুখটি এনে বললে—উপন্যাস ও কখনো পড়েনি, তাই উপন্যাস কাকে বলে ওঁকে যদি একটু বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তো…

স্বভো ঠাকুরকে তর্কের খাতিরে উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে আন্দাজে লেকচার মারতে গিয়ে যা বলেছিলুম তা হচ্ছে, এই :—

উপন্যাসের মধ্যে একটা 'স্কিম' থাকা চাই, একটা কাঠামো—এলোমেলো খানিকটা বকবকুম্ করার ভঙ্গিতে লিখে গেলেই তা উপন্যাস হয়না। উপন্যাস অনেকটা আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের মত—বহু পরিবার-পরিজন সমেত দালানগুলা চক-মেলানো বাড়ির স্থাপত্যে তৈরি। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, বিধবা পিসী, দূর সম্পর্কের মাসি, এমনি

অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি জমজমাট। তাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিশিষ্ট এক একটি দুঃখ-বেদনা-সুখের চক্রে চক্রমান হতে পারে, কিন্তু এই স্ব-স্ব দুঃখ-সুখের প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাত নানা গন্ধের নানান রঙের ফুলের মত হলেও, যেন একটি সুতোয় গাঁথা মালা। 'অলাতচক্রে' সেই দালান সমেত চক-মেলানো বাড়ির অভাব, আর অভাব একটি সুতোর, যাতে সেখানকার নানা বিভিন্ন বাসিন্দারা সব একসঙ্গে থাকবে গাঁথা—মালার মত। সেখানে—এই উপন্যাসের সকলেই যেন আলাদা আলাদা, উড়োনচণ্ডি সবে-বাপ-মরা কাপ্তেন। নায়ক নায়িকা সকলেই নিজে নিজেই প্রধান—এ-ছাড়া আজগুবি অদ্ভুত শুধু নয়, গাঁজাখুরি। সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। খালি কথার পিঠে কথা সাজিয়ে কেল্লা তৈরি হয়েছে, তাও মাঝে মাঝে আবার কনট্রাডিকটারি কথার কলিশন বাধানো। কোথাও লেখা "রাম রাজত্ব আর 'সাম' রাজত্ব (অর্থাৎ সাম্যবাদ) হবে দরে হাড়িজন" আবার কোথাও উল্লেখ রয়েছে—"কম্যুনিজমের উদ্দেশে দেশ দু'হাত বাড়িয়ে।" একবার উ-লোক সাহেবদের প্রতীক মাইকেল ওডায়ারের আদ্যশ্রাদ্ধ করছ, আবার একবার সাহেবদের স্বর্গে তুলে ধরেছ দু'হাত দিয়ে।

সুভো ঠাকুর আমার এই কথার উত্তরে বললে "জানিনে সাহেবদের আমি কতখানি নরকে নামিয়েছি, আর কতখানি গাছে চড়িয়েছি। কম্যুনিজমকে কতখানি কুপোকাৎ করেছি আর কতখানি মাথায় তুলে নেচেছি—তবে সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে আমার লেখায়—তবে তাতে আপসোসের কি আছে? ওরই তো নাম হচ্ছে নাকি দ্বন্দ্ব—ঐ দ্বন্দ্ব প্রকৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের সর্বত্র অশরীরী অস্তিত্ব বিস্তার করে বিরাজমান—তা, ও, মানে সুভো ঠাকুর, কি একটি এমন মহাপুরুষ—যে, এই দ্বন্দ্ব ওঁকে স্পর্শ করবেনা, এর থেকে রেহাই পাবে?

এ-ছাড়া আমি যে একান্নবর্তী পরিবারে তুলনা দিয়েছিলুম উপন্যাসের গঠনভঙ্গি সম্পর্কে, তার উত্তরে ও' জানায় ঘোরতর আপত্তি, ও'র মতে :—একান্নবর্তী পরিবার একশ বছর আগেকার কথা, অ্যান্টিক কিউরিওর সামিল। ও-জিনিস আজকালকার বাজারে একেবারে অচল। বঙ্কিম চাটুজ্জের সময় চলতো। 'অলাতচক্র' উপন্যাসের বাসিন্দারা এ-যুগের লোক।—ম্যানশান হাউসের ফ্ল্যাটের মতন, এক বাড়িতে থাকলেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। বাড়ির মালিকের সঙ্গে খাজনা-দিয়ে-খালাস সম্পর্ক যেখানে—এক সুতোয় গাঁথা মালার মত হওয়া সেখানে কেমন করে সম্ভব?

শুনো ঠাকুরের এই উত্তরে সত্যিই আমার ভোঁতা মুখ বোকা হয়ে যাবার দাখিল—মুখ রাখবার জন্যে একটু মুচকে হেসে ওঁকে বলেছিলুম :—না হয় স্বীকার করছি এ-যুগে উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে তোমার যুক্তি অভিযোগ মানতে পারে, কিন্তু তোমার ঐ খিচুড়ি ভাষা হজম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব—এক-একস্থল যেমন দুই রূপে দর্শিত। বেশ চলতে চলতে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়—শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার চলতে চলতে হঠাৎ যেমন নজরে পড়ে তোমার ঐ উর্দু 'নাজুক' শব্দের আবির্ভাব—তার সঙ্গে ঘাঁষাঘেঁষি আবার কলকাতার নিছক ক'লাইন ককনি; তারপরে হাওড়া বেউটি কিংবা মিশ্‌মি ডায়ালেকটএর খানিকটা—যার আওয়াজ মন্দ নয়, কিন্তু মানে বুঝতে চেষ্টা করা নিশ্চিৎ নির্বুদ্ধিতা। তা-ছাড়া তোমার তো এটা বিরাট বিশ্বকোষ নয়—এর পাঠকরা অত প্রশ্রয় কখনোই তোমায় দেবে বলে তো বোধ হয়না। 'ওনাকে' অর্থাৎ কর্তাকে আপিসে পাঠিয়ে স্নান খাওয়া সেরে ডেপুটিগিন্নির ঘুমের দাওয়াই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস—তোমার বইয়ের পল গোগাঁর কিংবা সালভাদর দালির উল্লেখে সেই ঘুম দুঃস্বপ্ন দেখে ককিয়ে উঠবে। প্রশান্ত সিংহ তথা তোমার

পাবলিশিং কোম্পানির মালিক—যত উৎসাহের সঙ্গেই নিক না কেন তোমার বই, তোমার সৃষ্ট-চরিত্রের ঐ ট্যারা চোখের চাউনি আর তাদের পেঁচিয়ে কথা বলার কায়দা বোঝার এলেম, মফস্বলের কথা ছেড়ে দাও—কলকাতার ঝুলি ঝাড়লে মেরে কেটে এক ডজনও হবে কিনা সন্দেহ।

আমার উপরোক্ত কথায় গুভো ঠাকুরের মত,—যে প্রকারান্তরে আমি নাকি স্বীকারই করছি, যে তার রচিত চরিত্রগুলো সত্যিই ফাঁপলে ফোলা-ফাঁপে-করা ফেউকেটা বিশেষ এক একজন—এরপর ও'র নাকি আর কিছু দরকার নেই, সব তো হয়েই গেছে! ও'র কাজ হাসিল। এখন 'অভিজাত পত্রে' আমন্ত্রণের আশা—এমন কি স্টেটসম্যানের সাব-এডিটরির চাকরিরও দাবিও হতে পারে একটি সম্ভাবনা। না, তার ও'র নাকি কোন আশাই নেই। পোড়া বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা যে মাইরি ও' কিছু জানে না।

তারপর আমি ও'র ভাষা সম্পর্কে যা বলেছিলাম—সেই কথার জের টেনে এনে বলে:—যে, ও'র ভাষা হচ্ছে এখনকার জীবনের ভাষা—এ যুগের এবং এমন কি ভাবী কালেরও। যদি আজ ও'র ভাষা না গ্রহণ করে দেশ—তবে কাল সেই জন্যে দেশবাসীর অনুশোচনা করতে হবে, আপসোস করতে হবে। ও'র ভাষার দোষ ধরতে গিয়ে যা বলা হয়েছে—অর্থাৎ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশে কলকাতার ককনি আবার হঠাৎ তার পাশে হয়তো বসানো একটা উর্দু শব্দ, তারপর আমাদের আদিম অধিবাসী মিরি কি মিশমি ডায়ালেক্ট-এর একটা কথা—সেগুলোই ও'র মতে ও'র ভাষার গুণাবলী। লোকে যাকে খিচুড়ি বলছে—গুভো ঠাকুর বলে—তা হচ্ছে এ-যুগ! অতএব ও'র ভাষা এ-যুগের প্রথম এবং প্রধান ভাষা হওয়ার দাবি রাখে। ও' বলে—লোকে যখন মোগলাই পাঞ্জাবি হিন্দু ধুতির ওপর পরে তার ওপর দিব্বি বিলিতি কোট চাপিয়ে

চাল, তখন তো খিচুড়ি ড্রেস বলে কই গাল পাড়ে না তো কেউ নিজের পোশাককে ?—একটা চৌরঙ্গি পাড়ার রুচিসম্মত লোকের ফ্ল্যাটে যাও—সেখানেও এই খিচুড়ি দেখবে গৃহসজ্জায়। ফ্রিজিডিয়ার, রেডিও, বুককেসে টি, এস, এলিয়ট থেকে আরম্ভ করে নাম-না-শোনা সব বিলিতি লেখকদের অগুন্তি বই এলানো ; ঠিক তারই পাশে দেয়ালে ঝোলানো যামিনী রায়ের ডবল ফ্রেমিংএ একখানা 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড' পট। তার পাশে টুয়েলভ্থ্ সেঞ্চুরি এ-ডি-র বুদ্ধের একটা মুণ্ড! কোথায়, সে ঘরে অভ্যাগতরা বসতে গিয়ে আপত্তি করা তো দূরের কথা, গৃহস্বামীর রুচিজ্ঞানের তারিফে হাঁ হয়ে থাকে কেন? স্বভো ঠাকুর বলে—"ভুলে যেওনা এ-যুগ সংমিশ্রনের যুগ—যাকে স্ল্যাং ভাষায় খিচুড়ি-যুগ বলা যেতে পারে।"

আমি ওঁর এই যুক্তি সঠিক ভাবে খণ্ডন করতে না পেরে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বললাম—"স্বভো ঠাকুর! তুমি যত তর্কই করো, তোমার বইয়ের শেষে ঐ উড়িয়া গান—ও'গুলো কেন আবার দিতে গেলে?" তার উত্তরে স্বভো ঠাকুর বলে—"কলকাতার মত শহরে ডক্টর স্টেলা ক্রেমরিশের মত লোক সপ্ত সমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পেরিয়ে এসে ফোক-আর্টের নামে যদি বাংলার কাঁথা আর উড়িষ্যার পটের রস গ্রহণ করে তা সংগ্রহ করার বাতিকে বাতুল বনতে পারে, তবে আমি আমার বইয়ে কটা উড়িষ্যার ফোক-সং ঢুকিয়ে কি এমন অন্যায় দুষ্কর্ম করেছি, বুঝতে পারলুম না—"

আমি বলেছিলাম তার উত্তরে স্বভো ঠাকুরকে, যে, "ফোক-সং গুলোর কিছু কসুর নেই, উড়িয়া ভাষায় বলা ঐ গানগুলোর মানে বোঝাতো দূরের কথা, উচ্চারণ করতে গিয়েই বাঙালী পাঠকদের বিরহ বা প্রেমের অনুভূতির পরিবর্তে হাস্যরসের আমদানি করবে—আশা করি তুমি হাস্যরস আমদানি করতে ঐখানে ওগুলো উদ্ধৃত করনি?

সুভো ঠাকুর বললে—"তা যারা দরদী নয় তারা হাসুক, তাদের হাসির দ্বারা আমি দমবার পাত্র মোটেই নই—যে ইংরেজরা চণ্ডিদাসের 'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি' শুনে মানে বোঝবার না-চেষ্টা করে যদি উচ্চারণ করতে গিয়ে হাসে, তাতে চণ্ডিদাসের কাব্যরসের এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি-সাধন হবে না বলেই আমার বিবেচনা, তবে উড়িষ্যার এই লোক-গীতিগুলো যদি বাঙালীরা রস-গ্রহণে দ্বিধা করে—তো বুঝতে বাধ্য হব যে, বেচারা হাল-আমলের বাঙালীরা বুদ্ধির দিক থেকে বেঁটে বনতে শুরু করেছে—যেটা আমি অন্ততঃ কিছুতেই মানতে রাজী নই। দুনিয়ায় সব জিনিসকে দু'হাত দিয়ে নেওয়ার ঔদার্যে আর দেওয়ার দিল্-দরিয়া দিল-এ এই ম্যালেরিয়া-ভর্তি জলাভূমি ভারতবর্ষকে একদা সড়ক বাতলে ছিল! আজ বুঝবো, সে নিজেই পথের খেই হারিয়েছে। যাই হোক 'অলাতচক্র' যখন উপন্যাস নয় বলে তোমার ধারণা, তখন তোমার সঙ্গে মিছে মারামারির মধ্যে না গিয়ে আমি এর নাম উপ-বিন্যাস বহাল রাখলুম। এবার তো খুশি হয়েছ ?"

এর পর আমি সুভো ঠাকুরকে বললুম—"তোমার অলাতচক্রের নতুনতম আখ্যা উপ-বিন্যাস দেওয়ায় সত্যিই খুশি হলেম—কিন্তু তোমার বইটা যেখানে শেষ হয়েছে—সেখানটা পড়ে যেন শেষ হয়নি মনে হয়।"

সুভো ঠাকুর বললে—"স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার এই উক্তি—কারণ সত্যিই বইটা শেষ হয়নি ওখানে, মাত্র প্রথম খণ্ড এর শেষ হয়েছে।" সুভো ঠাকুরের এই কথায় আমি এবার সত্যি সত্যিই হতাশ হয়ে হেলে পড়লাম ইজি চেয়ারটায়, তারপর ও'র উদ্দেশ্যে বললুম—"যাই বল সুভো ঠাকুর! পঁয়ত্রিশ-উত্তর বয়েস হতে চললেও জীবনে তোমার সিরিয়স্‌নেস্ এল না—চ্যাংড়ামি তোমার স্বভাব থেকে ইহজন্মে আর ঘুচল না।—ভদ্দরলোক হতেও পারবেনা এজন্মে।"

এর উত্তরে সুভো ঠাকুর যা বললে, তা সত্যিই শোনবার মত, বললে :—"জীবনের মূল্য যেখানে আজ অবধি সঠিক ধার্য হল না, মনুষ্য-জন্মের অহেতুক আনাগোনার হেতু যখন হদিস করা সম্ভব নয়, সেখানে আবার সিরিয়সনেস্—ছোঃ। আমার কাছে—বিশ্বাস কর—পৃথিবীটাকে মনে হয় একটা সাবানের ফেনা—বিধাতা-পুরুষের ফুঁ দিয়ে ফাঁপানো একটা ফক্কুড়ি! আর ভদ্দরলোক? অবনীদার ভাষায় তার নামতো 'ডাল্ রেস্পেকটেব্ল্' আর যার বাংলা ভাষায় আমার স্টাইলে অনুবাদ করলে দাড়ায়—'ভোঁদা-মার্কা ভদ্দরলোক', তার হাত থেকে ভগবান যেন যে কোন উপায়ে রক্ষা করেন। বালিগঞ্জে পাঁচিশ টাকা মাস-কাবারী ফ্ল্যাটে 'ভবভূতি ভবন' ট্যাবলেট মেরে ভোঁদড়ের মত ভদ্দরলোক সাহিত্যিক যেন না-হতে হয়—ভাগ্যিস যুদ্ধের সময় এ, আর, পি-র একটা চাকরি কপালের জোরে জোটাতে পারিনি! তা নৈলে ছা-পোষা গেরস্ত আর ভদ্দরলোক হয়ে যেতে হত নাকি আর একটু হলেই···"

আমি সুভো ঠাকুরকে বললুম—"এলোমেলো কি যে বকবক করলে—এখনো অবধি মানে বুঝতে পারলুম না।"

এর উত্তরে সুভো ঠাকুর বললে :—"মানে হচ্ছে এই, যে, আমি তোমাদের বাসনা অনুযায়ী মহামহোপাধ্যায় সাহিত্যিক নই—একজন মুখ্যু আর্টিস্ট—এই পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া বিংশ শতাব্দীতে যে মেজাজের মাথায় চলার চালিয়াতি দেখাতে পারে আজও সকলকার নাকের ডগা দিয়ে! যার কাছে—ইন্স্পিরেশন বস্তুটা গ্রামোফোনের কল নয়—যে দম দিলেই গেয়ে উঠবে···নাঃ, আদতে সবার ওপর এই কথার-ঠিক-ওলা ভদ্দরলোকদের সত্যিই আমি ভয় করি।"

ইংরেজী না-জানলেও হঠাৎ সুভো ঠাকুর এবার কপচে উঠল ইংরেজীতে—"এ টেল্ টোল্ড বাই অ্যান্ ইডিয়ট, ফুল অফ্ সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি—সিগ্নিফাইং নাথিং"! ও' যদিও এলিয়ট পড়েনি, তবু

আন্দাজে ও'র খুশি মাফিক এটা 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু ও-পাড়ার সুশিলবাবু বলে দিয়েছেন এটা সেক্সপিঅর।

এরপরও 'অলাতচক্র'কে যদি কেউ বলে—বুঝতে পারা মুস্কিল—তবে বলতে হয় উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' যেমন তিনবার না দেখলে বোঝা যায়না, তেমনি এ-বইটাও একবার, দুবার, তিনবার পড়লে তারপর বুঝতে শুরু করবে—কিন্তু প্রত্যেকবারই আনকোরা করে একখানা 'অলাতচক্র' কিনে পড়া চাই—তা নৈলে মানে বোঝা মুস্কিল!

এখন এই যুগান্তকারী উপন্যাস লেখার সময় যাঁরা সত্যিই কাজ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম এবং প্রধান—আগের যুগের বুক এমপোরিঅমের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বীরেন ঘোষ আমার কাছ থেকে 'বই' পাওয়ার আশা ত্যাগ করে তিনশ টাকা অগ্রিম দেওয়াতেই এ-বইয়ের শুরু। তারপর চলন্তিকার সম্পাদক প্রসাদ সিংহ—যে অনবরত খুচরো টাকায় আমার পকেট-পূরণ করে সব সময় আশায় চলতি রেখেছিল, আর সাতকড়ি ঘোষ—যে প্রুফ সংশোধন থেকে শুরু করে ছাপাখানার ভূতের আপদ বিলকুল বহন করে এ-বইটির ভবিষ্যৎ বর্তমানের কূলে এনে ভিড়িয়েছে—এখন এদের সকলকেই ধন্যটা বাদ দিয়ে দিয়ে, আমি নিজে ধন্য হলেম।

স্কেয়ার অফ ফুটপাথ, কলকাতা।
অল ফুল্‌স্‌ ডে, 'আটচল্লিশ।

ইতি—
স্বভো ঠাকুর

প্রথম পালা
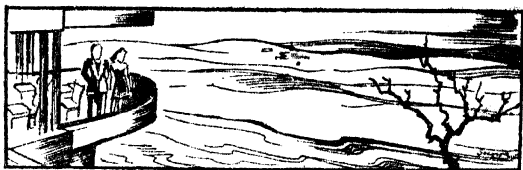
অনন্ত গান্ধী সাল্‌স্‌বুর্গে নেমেই—প্রথমেই পড়ল পুলিসের প্যাঁচে।

অস্ট্রীয়ান পুলিসের কোনই কসুর নেই। ফাউণ্টেন্‌পেন্‌ যে অত লম্বা আর মোটা হতে পারে কখনও, মোটা বুদ্ধি না হলেও, এটা ঠিক হদিশ করে ওঠা অনেকের পক্ষেই হত অসম্ভব। পুলিস কেন? আমিও, ঐ দু' আঙুল মোটা ফাউণ্টেন্‌পেনের বুকপকেটের মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা অগ্রভাগ দৃষ্টিগোচর করলে, নিশ্চয় রিভল্‌বারের ডগা মনে করে সন্দেহ প্রকাশ করতাম।

যাই হোক, মেয়েদের মানভঞ্জনে ওস্তাদ হলেও অনন্ত গান্ধীকে এবার পুলিসের সন্দেহ-ভঞ্জন-পালার জন্যে হতে হল প্রস্তুত। অর্থাৎ ও' ট্রাউজারের গর্তে একটা হাত গুঁজে আরেকটা হাতে পাইপ্‌টা মুখের উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরুতে চালান দিয়ে পকেট থেকে কলমটি বের করে পুলিসের চোখের ডগায় যখন তুলে ধরল, তখন সেখানে ছোটখাটো একটা ভীড় ভেঙে পড়বার করল উপক্রম।

এত মোটা আর এত বড় ফাউণ্টেনপেন্‌ কেনার কি সার্থকতা? যার জন্যে খামকা পুলিসের খপ্পরে পড়ার প্রয়োজন হয়!

—কিন্তু উপায় ছিল কি কিছু?

অনন্ত গান্ধী দুনিয়ার সব স্বাভাবিক বস্তুর বুকের উপর বাস্তবিকই বিধাতার যেন একটা জ্যান্ত বুড়ো আঙুল! যা কিছু সাধারণ, তাকে দুয়ো

দেবার জন্যই ও' যেন দুনিয়ার বুকে অবতীর্ণ হয়েছে, অস্বাভাবিকত্বের একটা অবতাররূপে !

কিন্তু বিপদের মাত্রা আরও বহুগুণ বাড়ল ও'র স্টেসন থেকে বেরবার সময়। ও'র পাশপোর্টে, নামের প্রান্তে ঐ গান্ধী শব্দটা নিয়েই বাধল এবার গোল ! ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধীর ও' কি রকম আত্মীয়, মহাত্মা গান্ধী মাসের মধ্যে কদিন উপোস করেন, কদিন কথা না বলে মৌন থাকেন, এমনি ধারা সহস্র প্রশ্নবাণে শরশয্যা রচনার রীতিমত লেগে গেল রেষারেষি। অনন্ত গান্ধী যত বোঝায় যে, অকস্মাৎ ঈশ্বরের একটা অহেতুক ইয়ার্কি পরিপূর্ণ করতেই ও'র নামের অন্তে ঐ 'গান্ধী' শব্দের আমদানি—তা ছাড়া ও'র মত দুরাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কোন আত্মীয়তাই নেই—লোকের কৌতূহলে লাগল ততই যেন কাতুকুতু।

অনন্তর তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা, ও' বোঝাতে চেষ্টা করে যে, গান্ধী পদবীর উপর মহাত্মা বংশের কোন মনোপলি আছে বলে আজও অবধি ও'র জানা নেই, বরঞ্চ ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধী পদবীর প্রবল প্রচার আছে, যাদের সঙ্গে একদেশের লোক ভিন্ন মহাত্মা গান্ধীর দূর অথবা নিকট, কোন আত্মীয়তাই নেই।

—কিন্তু কে শোনে সে কথা ?

তাই অনন্ত গান্ধী এবার একান্ত বেগতিক বুঝে কাগজের রিপোর্টার প্রেস ফোটোগ্রাফার, আর কৌতূহলী জনতার জটপাকান বেড়াজাল টপ্‌কে, কোনক্রমে ক্লসব্রাও হোটেলের কপালে ছিটকে এসে, ও' যখন পায়ের ধুলোর পরিবর্তে জুতোর ধুলো ঝাড়ল, তখন একটা সত্যিকারের স্বস্তির নিঃশ্বাস নেমে এল ও'র নাসারন্ধ্র থেকে—আঃ বাঁচা গেল !

…একেবারে নদীর নাকের উপর নথের মত এই ছোট্ট হোটেলের দোতলার অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঢাকা দেওয়া তক্‌তকে বারান্দাটি, তোফা লাগল অনন্তর। এইখানেই ছোট ছোট টেবিলে নানা খাবারের নানা রকম পাত পড়ে, অর্থাৎ প্লেট সাজান হয়ে থাকে। নিচের তলায়, তালরস-রসিকদের ন্যায় বিয়াররস বশংবদদের একটা বিরাট জলসার জমায়েত ঘটে নিত্য, যার দৌলতেই ত হোটেলটির উপরোক্ত জমকাল নামকরণ।

নিচের তলার সেই প্রকাণ্ড ঘরগুলো দিনের বেলাতেও আলো অন্ধকারে আবছা—যার সর্বাঙ্গে ফেটে যাওয়া ফোঁড়ার মত উঁচু টেবিলগুলো ছত্রাকার ছিটিয়ে আছে চারধারে। আকাশের আগায় সন্ধ্যার সামান্য একটু আভা মারার আগে আগেই বিয়ারের বিপুলকার ঘটি হাতে ঘরময় লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে, সেই খালি টেবিলগুলো ঘিরে—এক কথায় যাকে বলে 'নরক গুলজার,' তাই।

অনন্ত গান্ধীর হলস্‌ব্রাও হোটেলের ওপর এমনিতর দরদ দেখানর প্রথম এবং প্রধান কারণ : হোটেলের ওই নামটার উপর ও'র আন্তরিক দুর্বলতা। হলস্‌ব্রাও শব্দের ইংরেজি অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়—তাতে ভারতীয়-মদ্যপান-পরিহারী সুনীতিসঙ্ঘের অনধারী অনেক সভ্য হয়ত চোখ ছিটকোবেন, আর তা' থেকে বাংলায় নামলে—ত' কথাই নেই।

অর্থাৎ হলস্‌ব্রাওএর ইংরেজি নাকি হেল্‌স্ ব্রুয়ারি, যা' নির্জলা বাংলায় দাঁড়ায়—নরকের ভাটিখানা।

কিন্তু অনন্তর বেজায় পছন্দ ওই নামটাই। নিজের আট আঙুল চওড়া কপালে, নামের সঙ্গে নিছক মিল খাইয়ে, নিজেই অনন্ত নরক নক্সা দিয়ে খুদে রেখেছে—নরকের উপর এমনি ছিল ও'র নাড়ীর টান। তাই 'নরকের ভাটিখানা' এই নামকরণ ও'র তোফা লেগেছে, যার জন্যে তারিফ্ করতে তর-সওয়া ও'র পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ডিনার খাওয়া খতম করে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে, এখানকার ভিল্ কাট্‌লেট্‌টা অনন্তর ভালই লাগল, এমন কি স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে রসনায় বেড়ে একটা রোস্‌নাই মেরে গেল আর এক দফা। কিন্তু পেটটা স্থির হওয়া সত্ত্বেও, তবু যেন মেজাজটা অস্থির হয়ে মোচড় মারতে লাগল সারাক্ষণ···

লণ্ডন থেকে প্যারিস হয়ে যার জন্য দেশে ফেরার মুখে অজস্র অসুবিধে সত্ত্বেও এখানে অর্থাৎ সাল্‌স্‌বুর্গে নামা, সেই জেনের সঙ্গে এখন অবধি শুভদৃষ্টির সামান্য সুযোগও সন্ধান করে উঠতে পারল না।

মাঝপথে প্যারিসের হুল্লোড়ের পর সটান্ এখানে আসায় শরীরটা হৃদয়ের উপরে উঠে হুম্‌কি মারছে ভিতর থেকে। তা নইলে এখুনি অনন্ত বেরোত জেনের খানাতল্লাশীতে।

আফ্‌শোষ বলে আফ্‌শোষ ?···

অনন্ত শরীরটা বিছানায় সর্বতোভাবে সমর্পণ করে, একান্তভাবে বিছিয়ে দিয়ে এবার পাইপ্‌টা ধরাল। তারপর ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির চোঁয়া-ঢেঁকুর ওঠাতে লাগল—যেটা ও'র মত লায়েক লোকের পক্ষে একটা নিছক অঘটন ঘটন ছাড়া আর কি ? এতেই বোঝা যায় ও'র শরীরটা ঠিক সুরে ছিল না। ও' চোখ বুজে দেখতে লাগল লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটনের সেই বোর্ডিং-হাউস—যেখানে জেনের সঙ্গে ও'র প্রথম পরিচয় !

নাঃ, বাংলা ভাষার মারফৎ বোর্ডিং-হাউসের ব্যাখ্যা নিবেদন নিতান্তই নিস্ফল। বঙ্গের কথা বলতে পারিনে, বোর্ডিং-হাউস বস্তুটি বাংলাদেশে, এমন কি কল্‌কাতার কালোয়াতী সমাজেও রীতিমত কল্‌কে পেয়েছে বলে বোধ হয় না।

যাই হোক কল্‌কাতার কালোয়াতী সমাজে বোর্ডিং-হাউস কল্‌কে

পাক আর না পাক, লণ্ডন শহরের সাউথ্‌ কেনসিংটন পাড়ার এক কোণের এক বোর্ডিং-হাউসে তখন অনন্ত গান্ধী একটি কোল সংগ্রহ করার সুবিধে পেয়েছিল।

…সেদিন ছিল কুয়াসায় কালো চারিধার। অন্ধকারের ভারি ওভার-কোটে ভারাক্রান্ত লণ্ডনের আবহাওয়া। বরফ পড়তে শুরু করেছে অল্প অল্প। মোটকথা যাচ্ছেতাই মন-ম্যাজ্‌-ম্যাজ্‌ করা বাসি মুড়ীর মত বিচ্ছিরি একটা দিন—যে দিনে রবি ঠাকুরের কবিতা কপ্‌চান চলতো দেশে থাকলে। …দেশের বর্ষাদিনের স্মৃতির বিবশতা ছায়ার আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছে তখন অনন্তর মন। স্মৃতির সেই সুড়্‌সুড়ি, পিঁপড়ের পদক্ষেপের প্রায় এনেছে যখন ও'র মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি—কি করবে কাজ না পেয়ে, বোর্ডিং হাউসের বারোয়ারি সরু পথটায় রাখা রেডিওটা নিয়ে শুরু করেছে সবে নাড়াচাড়া, হঠাৎ দরজায় শোনা গেল কড়া নাড়ার শব্দ! বিরক্তির সঙ্গে অনন্ত উঠে এগিয়ে গেল, তারপর দরওয়াজা খুলে দিতেই ভারি সুটকেশ সুমেত একটি কিশোরী কন্যা বিনা বাক্যব্যয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। একঝাঁক ছুঁচের মত বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া অনন্তর মুখে পড়ল ছড়িয়ে—ওঃ, সত্যিই বাইরেটা বেজায় ঠাণ্ডা ছিল সেদিন। বেশ মনে আছে কলসির মত ভারি সুটকেশটি কাঁখে নিয়ে মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। ভঙ্গুর লিকওর গ্লাসের ডাঁটি যেন তার দেহের গড়ন খানি—ভারি ভাল লেগেছিল অনন্তর।

বিলেতে মেয়ে দেখে মন মচকাবার কোনই কারণ নেই। একটি অতি সাধারণের চেয়ে আরও সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অনন্তর হঠাৎ ফস্‌কে গিয়ে, মচ্‌কে গেল যেন মনটা। ও' তৎক্ষণাৎ মেয়েটির সুটকেসটা ধরে নামিয়ে নেবার পর ঠাণ্ডা হাওয়ার বিরুদ্ধে সামনের দরজাটা দিয়েছিল বন্ধ করে, তারপর মেয়েটির ওভারকোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখল পার্শ্ববর্তী হ্যাট্ রাখার হ্যাঙারটায়।

সহস্র তালি-মারা মেয়েটির জামা। এলোমেলো ঝাঁক্ড়া চুল—আঙুরের থোকার মত মুখের চারপাশ ঘিরে ঝুলে আছে। একটা পাগ্‌লী পাগ্‌লী ভাব ছড়ান ছিল যেন প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গে। অনন্তের অন্তরে মুহূর্তের জন্য লাগল যেন এ্যাব্‌সাঁতের উত্তেজনা। অনন্ত জিগেস করেছিল : ও' কি করতে পারে ও'র জন্যে। তার উত্তরে মেয়েটি জানাল—ও' এখানে ক-একদিন থাকবে বলে এসেছে, এবং পূর্বেই তা পত্র মারফৎ এইখানকার গৃহকর্ত্রীর কাছে বার্তা প্রেরণ করেছে।

এরপর অনন্ত মিস্ মেরিডিথ্‌কে ডেকে দিয়ে ডিনার খেতে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির আর কি সন্ধান নেওয়ার কারণ ঘটতে পারে? অনন্তর হয়ত কৌতূহল থাকলেও এমন কিছু খোঁজ নেওয়ার ছিল না আগ্রহ।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল পরে। আর সেইটেই কেমন যেন বাস্তব আর অবাস্তবতার মাঝামাঝি হয়ে রইল একটা। অবিশ্যি এটা তার কয়েকদিন পরেরই ঘটনা। —মধ্য রাত্রে হঠাৎ অনন্ত শুনতে পেল ও'র বেস্‌মেণ্টের সেই ঘরের দরজায় কার যেন মৃদু করাঘাতের শব্দ। আধো ঘুমের মধ্যে সে শব্দ ও'র কানের পরদায় যখন পৌছল, তখন ঘুমের ঘোরে প্রথমে অনন্ত ভেবেছিল আওয়াজটা সত্যি না স্বপ্নলৌকিক! তাই চোখ রগড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। না স্বপ্ন নয়, কে যেন সত্যিই মৃদু ঘা মারছে ও'র দরজায়। ও' উলঙ্গ শরীরটা লেপের মধ্যে থেকে বার করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাওয়া ড্রেসিং-গাউনটা পাশ থেকে উঠিয়ে গায়ের ওপর জড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে কাঁপতে কাঁপতে দরজাটা খুলতেই কি যেন একটা জিনিষ ও'র শরীরের উপর আছড়ে পড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে আষ্টেপিষ্টে অক্টোপাসের মত ওকে আঁকড়ে ধরল। অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করল সাপের মত পিচ্ছিল লিকলিকে সে বস্তু ও'র কণ্ঠে, ও'র

কোমরে, ও'র সর্বাঙ্গ ঘিরে ও'কে যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নাগপাশের মত বেঁধে পিশে ফেলতে চায়। অনন্তর দম পদাঘাতের ছন্দে বুকের ছাতিতে তাণ্ডবনৃত্যের পাঁয়তারা কসছে তখন। নিশ্বাস যেন নিঃশেষ হয় হয়, এমন সময় কানের কাছে কে যেন ককিয়ে উঠল—আমি—আমি—আমি!

—তুমি কে?

জেন তারপর বর্ষাভেজা ঝোড়ো হাওয়ায় দুমড়ে যাওয়া-দোলনচাঁপার মত মুচড়ে পড়ল কান্নার কল্লোলে—অনন্তর পাঁজরায়।

বাইরে থেকে লোকেরা অনন্তকে যতখানি নিষ্ঠুর মনে করে সত্যিই কি অনন্ত তাই?

মোটেই নয়। মুনিয়ার নরম পালক বেছান তুলতুলে বুকের মতই মোলায়েম ও'র মন। কিন্তু সে নরম মনটি ও' সকলের কাছ থেকে যথাসম্ভব সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে চলে। তাই তো বাইরে থেকে ও'কে বীরভূমী বেয়াড়া সরজমিনের সমান মনে করে সবাই।

—কিন্তু সেটা সর্বৈব ভুল।

সাল্‌স্‌বুর্গের হল্‌স্‌ব্রাও হোটেলের কামরায় সেই লণ্ডনে জেনের প্রথম সাক্ষাতের কথা, এমনিধারা ভাবতে ভাবতে ঘুমের ভারে ও'র চোখের পাতা দুটো তখন ভারি হয়ে বুজে এসেছে।

সবাই বলে, নতুন জায়গায় না কি ঘুম আসতে দেরি হয়—তাই কি?

যাই হোক পরের দিন প্রভাতে অস্ট্রিয়ার উপোস-ভাঙার উপাদেয় উপচারে অনন্তর মেজাজকে মোগল আমলের অপূর্ব আমিরীতে ফিরিয়ে নেবার ফিকির খুঁজতে লাগল।
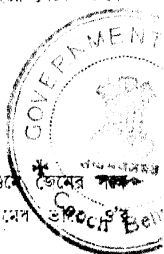
না সত্যিই, লণ্ডনের ডিম ভাজা, পালিত-বরাহের বর্ধিষ্ণু অবয়ব হতে চর্বির চাক্‌লা, আর মার্মালেডের নিত্য নৈমিত্তিক একঘেয়ে নৈবিদ্যির পরিবর্তে, মধু, টোস্ট, ক্রীম সমেত কফির এই অপূর্ব প্রাতঃরাশ ও'র দিল্‌কে করে তুলল দিল্‌দরিয়া। এবার সত্যিই অনন্ত জেনের সন্ধান নিতে উদ্‌গ্রান্ত হয়ে উঠল—টেলিফোনে জেনের ঠিকানায় একবার ঠুকরে দেখা যাক, ও' আছে না বেরিয়ে গেছে ?······

সাল্‌স্‌বুর্গ, সুরস্রষ্টা মোৎসার্টের জন্মস্থান—তাই তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এখানে এই উৎসবের আয়োজন। বিরাট উৎসব আসর। নানা শিল্পীর নানা ইঙ্গিতে অপূর্ব শ্রীতে শোভিত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এখানকার লোকে সবাই এখন উৎসব-উন্মাদ। বছরের এই কটা দিন, দুর-দূরান্তর থেকে ছোট বড় শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, কাউন্ট কাউন্টেস্‌এস্‌, আর বড় বড় সিনেমা-স্টার, অভিনেতা অভিনেত্রীর অদ্ভুত কক্‌টেল হয়েছে যেন সাল্‌স্‌বুর্গ শহর। মার্‌লেন ডিয়াট্রিকের ষোল সিলিণ্ডার কর্ডের দৌরাত্ম্য আর ডিউক এবং ডাচেস্‌ অফ উইণ্ডসরের অনবরত আনাগোনায় শিহরণ লেগেছে এখানকার এই ছোট্ট শহুরের শিরায়।

···এ সময় জেনের বাড়ি না থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়াই খুব স্বাভাবিক। তাই অনন্ত টেলিফোন ঘরের দিকে এগোবে জেনকে টেলিফোন করে বাড়িতে আছে কি নেই খবর নেবে বলে, এমন সময় অকস্মাৎ খবর দিল—"মিঃ গান্ধী, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে।"

—মেয়ে? সাল্‌স্‌বুর্গে? অনন্ত কাঁধটা চম্‌কিয়ে আঁতকিয়ে উঠল। ভয় পেলে কিংবা আশ্চর্য হলে কাঁধটা ও'র অমনিতরই চম্‌কে ওঠে। যাকে বলে কন্টিনেণ্টাল শ্রাগিং তাই, অনেক মূল্য দিয়ে এই মূল্যবান মুদ্রাদোষটি ও' পকেটস্থ করেছিল ও'র স্বভাবে। কিন্তু এখানকার প্রমীলা রাজত্বে ও'র আগমন বার্তা কেমন করে প্রচার পেল?—চিন্তা করতে করতে ও' এগোচ্ছিল এমন সময় মাঝপথে স্বয়ং জেনকেই পেয়ে ও' বিমূঢ় বনে গেল।

—তুমি, তুমি? অবাক করে দিলে। আমি এখানে এসেছি কি করে খবর পেলে? হালফিল্ টেলিভিশনের মালিক বনেছ বলে ত মালুম ছিল না।

—কেন আজকের সকালকার কাগজে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে, দেখনি?

—আমার ছবি? কাগজে? এখানে এসে কফির বদলে সকাল থেকেই কি···?

—আঃ গান্ধী, কি পাগলের মত বকছ!

—আমি না তুমি?

—বিশ্বাস করছ না, সত্যিই তোমার ছবি বেরিয়েছে।

—কেন নোবেল প্রাইজ পাবার মত অপকর্ম আমার ঘাড়ে কোন অপদেবতাও দিতে পারবে বলে তো বোধ হয় না—যে ছবি বেরোবে?

—দেখ গান্ধী, সব তাতেই তোমার ফক্কুড়ি, আমার সব সময় পছন্দ হয় না।

—আচ্ছা থুড়ি, ফক্কুড়ি করছি না। এই সিরিয়স হলুম—ঐ দূরে ভদ্দরলোক যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার দাড়িখানা যদি ধার পাওয়া যেত, তাহলে আরো একটু সিরিয়স হবার সুযোগ পেতুম। যাই হোক, আমি ভারতবর্ষের একটা ফচ্‌কে ছোকরা, অকারণ আমার ছবি সাল্‌স্‌বুর্গের

কাগজে বেরোনর তাৎপর্যটা যে কি, তাতো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—ছবি বেরিয়েছে, মহাত্মা গান্ধীর তুমি নিকট আত্মীয় বলে। এখানে মোৎসার্ট ফেস্টিবেল দেখতে এসেছ, উপরন্তু তোমার পকেটে একটা ইয়া প্রকাণ্ড ফাউনটেনপেন ছিল, যেটা নাকি এখানকার পুলিসে রিভলবার বলে ভুল করে ধরে—হোঃ, হোঃ, হোঃ, কি পুলিসের ছিরি, কলমকে রিভলবার বলে ভুল করে···বাহাদুর বটে!

—বাহাদুর না জংবাহাদুর! হ্যাঁ, তবে কলমটা আমার লণ্ডনেই কেনা, বিশেষ করে ও'র বিরাট বপু আর বহরখানা দেখেই! সত্যিকথা বলতে কি, রিভলবারের চোঙের সঙ্গে ওটার একটা সাদৃশ্য আছে বলেই না ওটার মালিক হবার মতলব। একসময় লোকে বলত, 'পেন্ ইজ্ মাইটিয়ার দ্যান্ সোর্ড'। আমি আধুনিক যুগের আমদানি, তাই প্রমাণ করতে চাইলুম 'পেন্ ইজ্ মাইটিয়ার দ্যান্ পিস্টল্'।

জেনের সঙ্গে গান্ধী যখন বেশ একটু জমায়েত হব হব হয়েছে—এমনিতর ঠাট্টা তামাসার ফাঁকে ফাঁকে ও'দের মনের চলেছে যখন উঁকি মারামারির মহরৎ, এমন কি জেন এর পর যখন গান্ধীকে ও'র বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আর গান্ধীও যখন নাছোড়বান্দা, যে মধ্যাহ্ন ভোজন ও'র এখানেই সেরে যেতে হবে, উপরন্তু উপরির লোভ দেখাতেও কসুর করেনি, বলেছে—মেজাজ হলে সন্ধ্যার পর 'মেরিওনেট থিয়েটারে' গ্যেটের ফাউস্ট নজর মারতে যাবে ও'রা দুজনে।

এমন সময় ও'দের এই কথাবার্তার মাঝখানে অকস্মাৎ একটি মেয়ে 'কমার' মতো কোমর বেঁকিয়ে এসে দাঁড়াল ঃ

—মিঃ গান্ধী, আমি এলুম আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভে...

—আমি, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ, মানে?

—কি বলছেন, আপনি এতবড় একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞান মণীষীর আত্মীয়—সাল্‌স্‌বুর্গের পত্রিকায় আপনার প্রতিকৃতি এখানকার মাটিতে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশ ধন্য হয়েছে আপনার পদধূলিতে।

—কি বলছেন আপনি? ওসব বড় বড় কথা কর্ণগোচর করলে আমি সত্যিই কি রকম নার্ভাস হয়ে উঠি।

—বুঝেছি যে বংশে আপনার জন্ম, তাতে যে সরল সহজ ও নিরহঙ্কার হওয়াই স্বাভাবিক!

ও'দের কথার মধ্যে আবার পড়ল সেমিকোলন এর ছেদ। হাজির হল, ঠিক যেন 'কমার' মাথার ফুটকি মারা স্বয়ং হলস্‌ব্রাউ হোটেলের মালিকের মেয়ে। তারপর এগিয়ে দিল অটোগ্রাফের খাতা। শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর জীবনীও একটা কোথেকে যোগাড় করেছিল এবং সেটাকে অনন্তর স্বাক্ষর-ভূষিত করার বাসনা।

অনন্ত যত বোঝায় যে ও'র সই ডিস্‌অনার্ড ব্যাঙ্ক-চেক ছাড়া আজ অবধি আর কোথাও অলঙ্কৃত হয়নি। তবু সবাই ওরা, অবিশ্বাসের হাসিতে উপহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায় তা।

এবার অনন্ত নিরুপায় হতাশ হয়ে বঁড়শিতে বেঁধা মাছের মত সামনে রেলিংয়ের বুকে বেঁকে পড়ল নিজে।

মেয়েটি বল্লে, রাখুন আপনার বার্ণড শর দাড়ি হেন বেয়াড়া রসিকতা।

অনন্ত একথায় দস্তুরমত তার আপত্তি প্রকাশ করে সোজাসুজি বললে, যে ভারতবর্ষের ও' একটা কেউ কেটা কেষ্ট-বিষ্টু বিশেষ কোন কিছুই নয়। আর ও' মহাত্মা গান্ধীর বই-এ অটোগ্রাফ করতে যাবে কেন? ও' কি মহাত্মা গান্ধী?

—আপনি ত তাঁর নিকট আত্মীয়, সেইটেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

—আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল, আমি তাঁর কেউই নইত আর কতবার বলব ?

—তাহলেও আপনাকে সই করে দিতে হবে।

এরপর হাঙ্গেরীর সরকারি মুখপত্র, এক দৈনিক থেকে ফোটোগ্রাফার সমেত একটি মেয়ে রিপোর্টার হাজির। তাঁর আবার আব্দার মেশান হুকুম হল—অনন্ত যদি হাঁটুর উপর খদ্দরের ধুতি পরে গান্ধীজীর মত ভঙ্গিমা ভরে দাঁড়ায় তো ও'র পক্ষে নাকি বড়ই ভাল হয়।

আব্দার শুনে মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে উঠল অনন্তর। তা হলেও চুপ করে গেল। মনে মনে স্থির করল যে এবার কথাবার্তায় দাঁড়িটা ও'কেই টানতে হবে।

সত্যি ও'রা অনন্তকে পাগল করে দিতে চায় না কি ?

অনন্ত এরপর গম্ভীর গলায় সিরিয়স হয়ে বলে—যে মহাত্মা গান্ধীর মত হাঁটুর উপর ধুতি পরে ভঙ্গিমা করে দাঁড়াতে ও'র কোনই আপত্তি নেই, যদি মহাত্মাজীর বিলিতি শিষ্যার ন্যায় মেয়েটি তার ফেনিল ফাঁপান সমুদ্র তরঙ্গের মত কোঁকড়া চুলগুলো বিসর্জন দিয়ে মুণ্ডিত মস্তকে দাঁড়াতে রাজি হয় তার পাশে।

এ-কথায় মেয়েটি ভয়ে শিউরে উঠে স্ক্রিম্ অর্থাৎ চিৎকার করে উঠলো। চমৎকার তার চুলের এমনিতর সর্বনাশ সাধনের আরাধনা শুনে পশ্চাদ্পদ না হয়ে আর উপায় কি ?

অনন্তও সঙ্গে সঙ্গে জেনকে নিয়ে এগলো সামনের রেস্টুরেণ্টের দিকে —খিদের পেটে চড়া পড়ার দাখিল।

—তারপর ?

—তারপর অটোগ্রাফের অজস্র কেতাবে অনন্তর ঘর তৈরী হল যেন কুতবমিনার! কত অখ্যাত লেখকের বই···কোনটায় বা দিতে হবে

তার মতামত, কোনটায় বা প্রশংসা পত্র। অনন্ত যত জানায় যে ও' সাহিত্যিক নয়, উপরন্তু জার্মান ভাষায় একেবারে ও' অনভিজ্ঞ। তবু কে শোনে কথা ?

যাই হোক, এই সব বিরক্তিকর অকারণ হাঁটু অবধি হাঙ্গামা পুইয়েও সকালে জেন আর ও' জুটত ব্রেকফাস্টের পর হলস্‌ব্রাউ হোটেলে। আর বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে হাজির হত জেনের আস্তানায়।

সকাল হলে জেন ব্রেকফাস্ট সেরে পথে বেরিয়ে কিনত নানা রকমের ফুল। তারপর হোটেলে অনন্তর ঘরে পৌঁছে অনন্তর ছোট ঘরটা ফুলে ফুলে সাজিয়ে তুলত নানা রকমে রকমারি করে। দিনের বেলায় তৈরী হত সেটা যেন বাংলাদেশের রাতের বাসর ঘর। বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রাখা কটা চন্দনের ধূপকাটি অনন্ত জ্বালিয়ে উপসংহার আনতো সে সাজানোয়। তারপর শুরু হত ও'দের আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ হতে আরম্ভ, তারপর গড়িয়ে যেত খলিল গিব্রানে অথবা জিব্রানে (উচ্চারণটা অনন্তর জানা ছিলনা ঠিক)। তারপর ওয়াল্‌টার হুইট্‌ম্যান্‌, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, ইয়েট্‌স্‌, এমনি আরও কত কি। এছাড়া ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র, সমাজ, কম্যুনিজ্‌ম্‌, ফ্যাসিস্‌জ্‌ম্‌, উপরি হিসেবে এগুলো তো ছিলই। আলাপ শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে এলে অনন্ত বেরুত জেনকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার ছুতোয়। পথে জেনের মতই কিনত রাশি রাশি ফুল। অনন্ত ফুল আন্তরিক ভালবাসে, উপরন্তু ফুলের মধ্যে জেনকে ও' অনুভব করতে চাইত সুবাসের মত।

…অনন্ত ভুলে গেছে ও'র পকেটের পরিধি। ও'র মন তখন বাস্তবের কঠিন কোটর থেকে প্রেমের অনন্ত আকাশে মেলে দিয়েছে ডানা— নিরুদ্দেশের উদ্দেশে।

অসীমের আকাশচারী পাখীকেও বাস্তবের সীমার মাটিতে একদা নিরুপায়ে নামতেই হয়।

—অনন্তরও এবার হল ঠিক তাই।

একটা মাস অফুরন্ত খরচের মধ্যে ফুড়ুৎ করে ছোট্ট চড়াই পাখীর মত কোন ঘুলঘুলি দিয়ে কখন যে উড়ো পালাল, বে-হিসেবী অনন্ত তা মোটেই বুঝল না।

আমেরিকান দুহিতা জেনের যেমন তালি-মারা ফকিরি বসনভূষণ, অনন্তর ঠিক তেমনটি না হলেও অর্থাৎ অনেক বেশি ধোপদুরস্ত হলেও, হঠাৎ সকাল বেলায় সেদিন হিসেব করতে গিয়ে ও' হদিস পেল যে এবার এখান থেকে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এর পরও যদি থাকতে চায় তবে বিলের টাকা বাকি বকেয়ায় করতে হবে জমা, সে বাকি আর উদ্ধার হবার আশা রাখবে কি কেউ?

ও নিজের জন্যে যত না হোক বেচারা মহাত্মা গান্ধীর জন্য ও'র মায়া হল বেশি।

যাক্ তার পরের দিন ভোরে উঠেই বাসী মুখে বেরিয়ে পড়ল স্টেসনের উদ্দেশে। একটা বন্ধ খাম সুধু হোটেলের ম্যানেজারের মারফতে রেখে গেল জেনের জন্যে।

ভারি ব্যাগ দুটো নিজেই বয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত। পোর্টারের প্রয়োজন হলেও পকেটে একটি আধলাও আর অবশিষ্ট নেই!

বরাতের অফুরন্ত ব্যাঙ্কে সব সময় ও' ওভার-ড্রাফ্‌ট্ কেটে এসেছে। এ তার নিতান্ত ছোট্ট একটা নমুনা মাত্র। অনন্তর কাছে এ কিছুই নয়। যা খেয়েছে ও' এক মাস এখানে, তাতে দেশে হলে নিশ্চিত নির্বিবাদে

এক হপ্তা জাবর কেটে চালিয়ে দিতে পারত, অর্থাৎ, উপোসের উপর। ভাগ্যিস রেলের টিকিটটা কেনা আছে আগে থেকেই। ও' এগিয়ে চলেছে স্টেসনের দিকে, ভারি মোট সমেত। একটু বাদেই ট্রেন ও'কে নিয়ে যাবে ভেনিসের পথে।

ব্রেকফাস্টের সময় এড়িয়ে রোজকার মত আজও জেন এসেছে অনন্তর হোটেলে, ফুলের স্তবকগুলো হাতে, টাটকা ফুলগুলো ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। ও'র মুখের সঙ্গে ফুলগুলোর কি অপূর্ব মিল। অনন্তর ঘরের দিকে এগোতে যাবে, এমন সময় হোটেলের সেই মালিকের মেয়েটি প্রাতঃকালীন সম্ভাষণের পর গান্ধীর বিদায়গমনের বার্তার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিঠিখানা দিল এনে জেনের হাতে।

পশ্চিমের অস্তোন্মুখ আকাশের মত নির্বাক জেন না খুলেই খামটা ছিঁড়ে কুটি কুটি কোরে হিল্‌সমেত জুতোটা দিয়ে বারবার সেটা নিষ্পেষিত করল।

টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অনন্তর ফোটোখানা খামের ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন চারিধারে। জেন মনে মনে কুড়িয়ে নিয়ে আবার সেগুলো জোড়া দিতে চাইল, কিন্তু পারল কি ?

বাড়ি ফিরে এসে ও'র টেবিলের উপর চেপে রাখা বিগত রাত্তিরের সেই অনন্তর দেওয়া কবিতাটা চিৎকার করে পড়তে শুরু করল। পড়া শেষ হয়ে যেতে ও' বুকের উপর চেপে ধরল সেটা। তারপর চোখের জল দিয়ে লেখাগুলো মুছে ফেলতে চাইল, কিন্তু পারল না। শেষকালে ঠোঁটের উপর সেটা চেপে চিপ্‌টে ফেলতে চাইল।...

ভোরের আলোয় ঘরের জেলে-রাখা বাতিটা শ্রান্ত মাতালের পরিশ্রান্ত চোখের মত লাগছে।

অনন্তর কবিতা লেখা চেপ্টে যাওয়া কাগজটার বুকে জেনের টকটকে লিপ্‌স্টিকের লাল ছাপ কামদেবের পরিত্যক্ত ধনুকের মত মনে হচ্ছিল, যার তীর হাত ফস্কে ছুটে গেছে বুঝি আবার কোন্ অজানা হরিণীর হৃদয় হরণ করবার জন্যে।...

বারান্দাওয়ালা কন্টিনেণ্টাল ট্রেনগুলো অনেকটা আমাদের আসাম মেলের মতই, কিন্তু তার চেয়ে আরো আরামের, আরো লম্বা-চওড়া চারিধারে।

আমাদের আসাম মেলের সঙ্গে অমনি তুলনা দেওয়ার কারণ যে আসাম মেলের মতই কামরাগুলোর কোমর জড়িয়ে চলে গেছে একটা সরু রাস্তা, সোজা—শুরুর এক প্রান্ত থেকে শেষের আর এক প্রান্ত অবধি।

সেই সরু অলিন্দের মত ঢাকা দেওয়া রাস্তা দিয়ে বিনা আপত্তিতে এক কামরা থেকে আর এক কামরা করে বেড়ানো চলে দিব্বি আরামসে।

এ-দেশের ট্রেনের কামরাগুলোর তুলনায় ও-দেশের ট্রেনের কামরাগুলো এক পক্ষে অনেক বেশি আরামের, আর অনেক কিছুরই বালাই বর্জিত। উপরন্তু থার্ড ক্লাসই হোক, আর ফার্স্ট ক্লাসই হোক, হাত-পা-ছড়িয়ে যে চিৎ-পটাং হয়ে নাক ডাকাবে, তার উপায়টি নেই। ঘুমোতে হলে 'স্লিপিং-কারে' স্থান সংগ্রহ করতে হয়।

দিবানিদ্রার প্রচলন ও-দেশে কী আছে?

নিশ্চয়ই নেই, থাকলেও 'নিদ-কামরায়' সন্ধ্যা সাতটার আগে সিঁদ কাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। দিবানিদ্রার প্রচলন থাকলে কখনই এই নিষ্ঠুর নিয়মে এমনিতর কড়া নজর রাখা সম্ভব হতো কী?

বেচারা অনন্ত গান্ধী, ও'র অমনি বে-হিসেবিপনা বাহাদুরিতে রাগ হলেও মায়াও করে আবার। 'উপোস-ভাঙার' আগেই হোটেল থেকে ও'কে দু দুটো ইয়া ভারি ব্যাগ্ বগলে হণ্টন মারতে হয়েছে স্টেসনের উদ্দেশ্যে ট্রেন পাকড়াতে, আহা!

তবু, অনন্তর ভাগ্যটা একপক্ষে ভালই বলতে হবে, অন্ততঃ লোকের কাছে নির্বিবাদে মুখ রাখতে পারবেতো।—ও' স্বচ্ছন্দে বলতে পারার একটা পরম সুযোগ পেয়েছিল যে, ট্রেন ধরার তাড়ায় ব্রেক্‌ফাস্টও সেরে আসা সম্ভব হয়নি ও'র পক্ষে।

কিন্তু তারপর? টিকিটগুলো ছাড়া একটি পাই-পয়সারও যে টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না ওর সারা পকেটখানার খানাতল্লাসীতে!

অস্ট্রীয়ায় অনন্ত পৌঁছে অবধি যকৃতে বেশ একটু তাগদ সঞ্চয় করেছিল নিশ্চয়ই, তা নইলে লণ্ডনে থাকতে তো ব্রেক্‌ফাস্টের জন্যে এত তাগিদ ছিল না ও'র কস্মিন কালে!

স্লিপিং-কারের আলোচনা শিকেয় তোলা থাক আপাততঃ! কোথায় স্লিপিং-কার? অনন্তর, স্লিপিং-কারের কথা স্বপ্নেও স্মরণ করার মত অবস্থা ছিলনা তখন।

উদর দেবতার প্রাতঃকালীন ভোগের এমনি ধারা ব্যতিক্রমে বেজায় উগ্রমূর্তি ধারণ করেছেন তিনি—অনন্তর উদরলোকে!

এক একটা স্টেসন আসে আর অনন্তের নাকের ডগা ছুঁইয়ে সসেজ্, হ্যাম্, ওনিয়ন্ ইত্যাদির চুব্‌ড়িগুলো চোখের উপর চক্রমন করে বেড়ায় —ফিরিওয়ালাগুলো ও'র বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্রই না করেছে? এক

আঘ্রাণেই আসঙ্গ লিপ্সার মত সারা শরীরটা ওঁর শিরশির করে ওঠে উদগ্র উত্তেজনায়। ও' ট্রাউজারের পকেটটা হাতড়ায়, পার্সটা বের করে একবার উল্টে-পাল্টে দেখে—দেখে: জেনের ফটোটা ছাড়া একটি ফুটো পয়সাও নেই তাতে!

যে জেন, এতদিন ওঁর মনটা কানায় কানায় ভরপুর করে তুলতে পেরেছিল, সে আজ এতই কি নিরর্থক!—কৈ, অনন্তর উদরলোকের কি এতটুকুও ভরিয়ে তুলতে পারে না! ও' নিষ্ফল আক্রোশে এবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল। যেন আস্ফালন!

তারপর শরীরটাকে করিডরের জানালা থেকে হ্যাচ্‌কা টানে ঘরের আনলায় অর্থাৎ কামরার একটা কোণে সিটের উপর সবিস্তারে বিস্তারিত করল।

ঘাড় গুঁজে আর মুখ বুজে অনন্ত পড়ে আছে। খিদের জলন্ত সূর্যের ক্রমিক প্রচণ্ড উত্তাপে পেটের আটঘাটগুলো কলকাতার গরম কালের গলে যাওয়া পিচের পথের মত গলতে শুরু করেছে তখন।

অনন্ত অটোসাজেশনে নিজেকে বুদ্ধদেবের আসনে বসাবার মৎলব আঁটছে মাথায়। বুদ্ধদেবের উপোসের তত্ত্ব ও' আওড়াচ্ছে তখন মনে মনে। এমনকি মহাত্মা গান্ধীর কথাও।

সত্যি, অনন্ত গান্ধী একটা দিন করলই বা নির্জলা একাদশী না হয়—বাংলাদেশের অবলা বিধবাদের চেয়েও কি ও' অক্ষম, এতটুকুও কি ক্ষমতা নেই ওঁর, আধবেলা উপোসেই এই অবস্থা—ছিঃ!

কিন্তু অনন্ত যে কোন বাজি ধরতে পারে—বুদ্ধদেব যদি বারাণসীর একান্ত নির্জনে উপোসটা আরম্ভ না করে শুরু করতেন ট্রেনের কামরায় ভেনিসের পথে—দেখা যেত তাঁর অমর কীর্তির অপূর্ব

অপঘাত মৃত্যু। নাকের ডগায় বারবার উপাদেয় সসেজাদির আঘ্রাণ গ্রহণ করতে বাধ্য হলে 'মার' যা করতে পারেনি অতি অল্পে তার হত আশ্চর্য সমাধান।

ট্রেন ধীরে ধীরে এবার একটা স্টেসনে এসে পৌছল। মাল নামা ওঠার উদ্‌ব্যস্ততা। কলরব নানা মানুষের—কত লোক নামল, আবার কত লোক উঠছে।

এবারকার স্টেসন থেকে একটি হাঙ্গেরীয় দম্পতি উঠে এল ও'র কামরার সামনে; তারপর দখল করল ও'র ঠিক উল্টোদিকের এতক্ষণের খালি পড়ে থাকা আসনখানা।

নানা জিনিসপত্তর। টুকিটাকি কত কিছু, সেই কত কিছুর সংঘাতে ছোট কামরাটি ধ্বনিত হতে লাগল প্রতিধ্বনিতে।

যাই হোক ফাঁকা পড়ে থাকা ঘরটা কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠল বেশ জম্‌কাল হয়ে।

এরপর ও'রাই যেচে আলাপ আরম্ভ করলে অনন্তর সঙ্গে আগে। বাঁচা গেল। মূক খিদের ছুঁচের মত অদৃশ্য মুখের খোঁচা খেয়ে যন্ত্রণায় মুখরিত হওয়ার চেয়ে কথায় মুখরিত হলে যদি কমতি হয় কিছু কষ্ট! অপরাহ্নের আর ধারে তখন দিবালোক বাড়িয়েছে তার শ্রীচরণ। ভাগ্যটা ভালই ছিল অনন্তর বলতে হবে। মোটমাট ইংরেজি বলতে পারে ও'রা মন্দ নয়।

—মশাই কি ভারতবর্ষের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চলেছেন কোথায় জানতে পারি কি?

—গরমের ছুটিতে দেশ থেকে একটু চক্কোর মেরে আসতে যাচ্ছি।

—অসভ্যতা মাফ করেন যদি, এতদিন কোথায় ছিলেন?

—লণ্ডনে। তারপর দেশে ফেরার পথে কন্টিনেণ্ট্ একটু চেকে দেখবার বাসনায় প্যারিসে ক' রাত, আর সাল্‌স্‌ব্যুর্গে ক' দিন চোখ বুলিয়ে চলেছি ভেনিসে জাহাজ ধরবার মতলবে।

—আপনি বুঝি ইটালিয়ান বোটেই স্থান সংগ্রহ করেছেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

এবার মহিলাটি মাঝ পথে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "ক্ষমা করবেন আমার কৌতূহল, আপনি কি বিবাহিত?"

—আজ্ঞে না।

—মাফ করবেন আমার ধৃষ্টতা, আপনাদের মত অল্পবয়স্ক যুবকের বিয়ে না করে অর্থাৎ সঙ্গিনী-বিনা এত দূর বিদেশে এতদিন ধরে ঘুরে বেড়ানো···সেটা কি যুক্তিসঙ্গত?

—হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন বলুন তো? এতদূর বিদেশে বেশী দিনের জন্যে এলেই যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াতে হবে একথা কোনো শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে বলে তো বোধ হয় না—

—তা নয়, তবে কিনা···

মহিলাটির কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর স্বামীটি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ সোম বলে কোন ভারতীয়কে কি অনন্ত চেনে?"

অনন্ত উত্তরে বললে—"কোন্ মিঃ সোম, কোথায় থাকেন, তাঁর পুরোনামই বা কি?"

—মিঃ সোমই তো তার নাম, শুনেছি কলকাতায় তিনি থাকেন।

—'সোম' বাংলা দেশের তথা কলকাতার একটি অতি সাধারণ পদবী, লাখো গণ্ডা লোক সেই পদবী-ধারী থাকতে পারেন, কিন্তু কেন, হঠাৎ তার নাম?

—তার কারণ আমার স্ত্রীর ছোট বোনের সঙ্গে তিনি বাক্‌দত্ত

অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মায়ের অসুস্থতার সংবাদে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, কিন্তু তারপর থেকে তাঁর পৌঁছুন সংবাদ কিংবা কোন কিছুই খবরাখবর পাওয়া গেলনা, সে আজ প্রায় বছর পাঁচ আগেকার কথা।

—আপনার শ্যালিকা কী আজো তেমনি বাগদত্তার দায়িত্ব স্কন্ধে তাঁর অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে আছেন?

—না, তা ঠিক নয়, তবে তা হলেও তিনি এরকম করে কথা না দিয়ে গেলেই বোধহয় ভালো হত।

—মাপ করবেন, এই পৃথিবীতে কোন কিছুই কী চিরস্থায়ী? সবই তো সাময়িক। মানুষের জীবনেরই যেখানে কিছু স্থিরতা নেই, সেখানে আমরা নির্বোধের মত কথার স্থিরতা রাখবার জন্য কি আস্ফালনই না করে থাকি। যাই হোক সেই 'সোম' নামধারী ভদ্রলোক যখন আপনার শ্যালিকাকে বাক্যদান করেছিলেন নিশ্চয়ই তখনকার মত তাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যে সকল আন্তরিকতাই আবিষ্কার করা যায়।

ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টির এমনি একটা নিদর্শনে হাঙ্গেরীয় অর্ধাঙ্গিনীটি একেবারে হাঁ হয়ে গেছেন তখন অ্যাড্‌মিরেশনে।

সত্যিইতো, জীবনেরই যেখানে কোন কিছুর স্থিরতা নেই, সেখানে কথার দাম কত? আর সে কথা নিয়ে বসেই বা থাকছে কে? লেখাপড়ায় দলিলের দালালি থাকলে না হয় আদালতে আস্ফালনের একটা উৎসব আয়োজন করা যায় কিন্তু তারই বা স্থিরতা কি—ভাগ্যের পেণ্ডুলাম কখন কোন দিকে দুলবে তার ভবিষ্যৎবাণী গণৎকারেও কী গুনে নিশ্চিত বলতে পারে?

ট্রেনের দুধারে তখন আঙ্গুরের শ্রেণী। হেজ্‌লীন স্নোএর মত হিমেল হাওয়া ও'র সর্বাঙ্গে তখন শীতের প্রলেপ পরিয়েছে। অনন্ত

বলল—“আপনার শ্যালিকা বসে না থেকে বুদ্ধিমানের মত বিবাহ ব্যাপার সমাধা করেছেন যখন, তখন আর আপসোসের কী আছে ?”

এরপর মহিলাটির দিকে ফিরে বললে—“আচ্ছা আপনাদের এই পাহাড়ে বাঘ আছে, হাতী ?”

ভাগিস্ সেখানে কোন ভারতীয় ছিলনা, থাকলে ও'র এই বালকসুলভ অজ্ঞতায় হাসতো কি কাঁদতো বলতে পারিনে, তবে হতবাক যে হত, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কী ? এমনকি মস্তিষ্কের স্থিরতায় হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করত।

আসলে অনন্ত কিন্তু ও'র মনটাকে জঠরানলের হাত থেকে অন্যমনস্ক করবার জন্যেই একটা পন্থা সন্ধানের প্রয়াস করছিল। তা নইলে কখনো ও'র জিজ্ঞাসার উত্তরের ওপর অমনি ভ্রূক্ষেপহীন ঔদাসিন্য নিক্ষেপ করে চেয়ে রইল কিনা পাহাড়গুলোর দিকে! শরীরটা সত্যিই যে তখন ও'র টাটানগরের ব্লাস্ট-ফার্নেসের মতন হয়ে রয়েছে। ও' মনে মনে তখন ভাবছিল কৈ কত দিন কাটিয়েছে না খেয়ে কিন্তু এমন অপ্রস্তুত অবস্থাতো হয়নি দেশে থাকতে ; এমনকি লণ্ডন শহরেও কুঁড়েমি করে কতদিন খেতে বেরয়নি—অথচ দস্তুরমত পকেটে রয়েছে পয়সা। আজ পকেটে পয়সা নেই বলেই কি খিদেরও লেগেছে বাড়াবাড়ি ? নাঃ, ভুখ্-ভিক্ষুক হওয়াকে কখনই এমন প্রশ্রয় দিতে ও' প্রস্তুত নয়।

এবার একটা বেশ বড় স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ি। আবার সেই অনন্তর নাকের ডগা

দিয়ে খাবারগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চলেছে চালাকি। মানুষ না হয়ে আজ যদি জানোয়ার হত—ওঃ, কি আরাম। অন্ততঃ লাফ মেরে কামড়াবারও একটা প্রচেষ্টা করতে পারতো, পাক আর না পাক। এমন কি চিল্ হলেও একটা ছোঁ মারবারও হয়তো হত সুযোগ! হায় রে ভদ্র মানুষ! কত ভণ্ডামিই না তোমায় বাধ্য হয়ে অভ্যাস করতে হয়। নাঃ, ও' আর পারছেনা, ওর মাথাটা খিদেয় ঝিমঝিম্ করছে, হাত-পাগুলো আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছে।

হাঙ্গেরীয় ভদ্রলোকটি ততক্ষণে বৈকালিক আহারের আয়োজন করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। মহিলাটি এবার টিফিন-বাস্কেট খুলতে খুলতে অনন্তকে 'কিছু খাবেন কিনা' এই প্রশ্নে আপ্যায়িত করলেন। অনন্তর সমস্ত সত্তায় একটা অনতিপূর্ব উৎসাহের পড়ল ইশারা। নাঃ। না পারল না। খিদেতে মরে যাচ্ছে তবু কৈ পারল না বলতে 'হ্যাঁ খাব'। ভারতীয় বনেদিয়ানার বনেদ এত সহজেই কি বানচাল করা চলে?

অনন্ত বললে. "অনেক ধন্যবাদ, ও'র খিদের উদ্রেক হয়নি এখনো"। হাঙ্গেরীয় ভদ্রলোকটি ততক্ষণ করিডরে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে ফল কিনতে ব্যস্ত। তাঁর কিছু আপেলের সওদা সমাপ্ত হলে পয়সার প্রত্যাশী হলেন গিন্নির কাছে। ধনদৌলত আগ্লাতে মা-লক্ষ্মীরা তাহলে সব দেশেই সমান দেখা যাচ্ছে।

পয়সার প্রয়োজন হওয়ায় গিন্নির তখন হুঁস হল হাত-ব্যাগের! খোঁজাখুঁজি লেগে গেল, কিন্তু হাতব্যাগ কোথায়? মহা মুস্কিল টাকাকড়ি টিকিট থেকে চাবির গোছা মায় পাউডারের পাফ অবধি যে তাতে মজুত। সর্বনাশ. কি হবে!

ভদ্রলোকটির মুখ তখন ভয়ে-শুক্নো শাঁখ-আলুর মত সফেদ বর্ণের হয়ে এসেছে! তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে তুমি যে দোকানে ঢুকেছিলে, সেই খানেই ছেড়ে এসেছ।"

—কি হবে? কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আমি ব্যাগ এক দণ্ডও কোথাও হাতছাড়া করিনি।

ওদের আর একবার চলল খোঁজাখুঁজির পালা কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেলনা।

মেয়েটির যত রাগ পড়ল এসে নিরীহ অনন্তর উপর। মহিলাটি তখন নিজের ভাষায় বললে, "এই অপয়া হিন্দুটাই যত নষ্টের গোড়া। জীবনে আমার এমন ঘটনা কখন ঘটেনি। ও'র কামরায় উঠেই তো এই দুরবস্থা।" স্বামীটি তখন রেগে গেছে, বললে, "তুমি ছেড়ে এলে ব্যাগ দোকানে, আর এই ভদ্রলোকের হল দোষ—তোমার জন্যে কি অপয়া সুপয়া বেছে রেল-কোম্পানি টিকিট বিক্রি করবে?"

বেচারা অনন্ত তখন কিছুই জানে না। খিদের চোটে ও'র তন্দ্রা এসে গেছল। তার মধ্যেও ভেসে আসা দূরাগত ধ্বনির মত ও'দের ভিন্ন ভাষায় সজোর কথাবার্তাগুলো অল্প অল্প পৌঁছোল ও'র কানে। তাই চোখ খুলে যখন ও'দের অমন উত্তেজিত অবস্থায় দেখল তখন সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল। "কি হয়েছে" জিজ্ঞেস করতে—ও'রা বললে, "ওদের সর্বনাশ হয়েছে! ব্যাগটা, যাতে টাকাকড়ি টিকিট আদি সব কিছু ছিল সেইটে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অনন্তর মাথায় এবং শরীরে উত্তেজনা আর সইছিলনা, ও'র চোখটা আপনা হতেই আবার যেন বুজে আসতে চাইল। মহিলাটির মেজাজ অনন্তর এই ঠাণ্ডা উদাসীনতায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে তখন, ও'র মনে, 'হয়তো এই লোকটাই ব্যাগ্‌টা সরিয়েছে', এমনি একটা ইঙ্গিত তখন ক্রমাগত উঁকি মারতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে ও'র মনটাকে ক্রমাগত ঘোলা করে তুলতে লাগল—একটা অসহ্য অসোয়াস্তিতে।

এমন সময় অনন্ত আবার চোখ চাইতে দেখল: মহিলাটি তাঁর

বসবার স্থান ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল ও'র—উল্টোদিকের এক কোণে সেই বেঞ্চি অর্থাৎ বাঙ্কের বসবার বালিশ কিনা কুশোনগুলোর কোণে, ঠিক যেখানটিতে মহিলাটি চেপে বসেছিলেন, তার মাঝখানের ফাঁকটা থেকে ভ্যানিটি-ব্যাগটির কারুকার্যওয়ালা একটা কোণ একটু উঁকি মেরে আছে!

অনন্ত এবার তেমনি ঠাণ্ডা নিরুত্তেজক উদাসীনতার সঙ্গে ও'দের দেখান—"ঐ তোমাদের ব্যাগ, ঐখানে।" এর পর ব্যাগ্ থেকে পয়সা বের করে আপেলের দাম চুকিয়ে রেহাই পেয়ে বাঁচল ও'রা।

তারপর অনন্তকে ধন্যবাদে ধামা চাপা দেবার জোগাড় করে বসল ও'রা দু'জনেই, ও'রা ভেবে পেলনা অনন্তকে নিয়ে ও'রা কি করবে।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে স্টেশন থেকে···

মহিলাটি তখন হাঙ্গেরীয় ভাষায় ও'র স্বামীকে খুব মুরুব্বিআনার সঙ্গে বলে চলেছে—"ব্যাগ্টা ওখানে কিছুতেই ছিলনা—ও-জায়গাটায় আমি অনেকবার খুঁজে দেখেছিলুম। আদৎ-এ হিন্দুটি মহাপুরুষ যোগী! অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। আমি একটা বইয়ে পড়েছি ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যে অনেকেরই এ-ক্ষমতা থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় দোকানেই আমি ব্যাগ্টা ছেড়ে এসেছিলুম। তুমি বক্‌বে বলে ভয়ে বলিনি। উনি খেতে চান আর না চান, ও'কে যে কোন উপায়ে আমাদের সঙ্গে চা আর ডিনার খাওয়াতেই হবে, উনি ইচ্ছে করলেই আমার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ নিশ্চয়ই যোগবলে উপশম করে দিতে পারেন—অপারেশনের আর আবশ্যক হয় না তা হলে।"

ট্রেনের পাদানি থেকে যখন ও' ভেনিসের প্ল্যাটফর্মে পদতল পাত্‌ল, তখন ও'র ব্যাগের বোঝা বাদেও আর একটা বোঝারও ভার বেশ খানিকটা ভারি হয়ে উঠেছে বলে মনে হল—সেটা আর কিছুর নয়—ও'র একান্ত নিজের চুপ্‌সে-যাওয়া ভুঁড়িটির স্ফীতি!

সেই হাঙ্গেরীয় দম্পতীটি একেবারে নাছোড়বান্দা—বিকেলের বিপুল চা-পানান্তে অনন্তকে রাত্রের আহার অর্থাৎ ডিনার না খাইয়ে নেহাৎ-ই নিস্তার দিল না।

•

অনন্তর অপূর্ব যৌগিক ক্ষমতা আর মন্ত্রপূত কাগজের মোড়ক, মাদুলি হিসাবে সেই হাঙ্গেরীয় মহিলাটির অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের আবশ্যকতা কতখানি কম্‌তি করেছিল, তা এক অন্তর্যামী ভগবানই ভাল বলতে পারেন। তবে সেই কাগজের মোড়করূপ মাদুলিটি কোন বাঙালীর হাতে পড়লে দেখতে পেত তাতে উপনিষৎ-এর আঙ্গিকে চণ্ডীদাসী বাংলায় চরম কথা লেখা আছে :

'—সবার উপরে বরাত সত্য তাহার উপরে নাই!'

এই 'বরাত' বস্তুটি অনন্তর মত একটা একান্ত অধম আদ্মীকেও কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ব্লাক্‌আউট্‌ময় অলিগলির মধ্যে দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে, সত্যিই তো, কোন্ অস্পষ্টতর অজানা রহস্যময়ী রজনীর প্রচ্ছন্নতম প্রান্তরে—কোথায়? আজ অবধি তার কোনো সঠিক

পারাই কি ও' ছাই ঠিক করে উঠতে পারল? কেনই বা জন্মেছে, কোন পথে চলেছে, কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে, কিছুই আজ অবধি ও' বুঝে উঠতে পারল না।

তবু চুপ করে থাকবার উপায় আছে কী? অহোরাত্র এই সংগ্রাম, বাঁচবার জন্যে এই সাধনা, অগ্রগতির জন্যে নিত্য এই আক্রমণ, পায়ের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে কত কাঁকর, চেপ্টে পিষে যাচ্ছে কত তৃণদল, লাগছে কত কাঁটার আঘাত—তবু চলতে হবে, কেন কোথায়?

এর উত্তর আজ অবধি ও' সমাধান করতে পারল না। ও' হার মেনেছে। এক একবার ইচ্ছে করে ও'র—সৃষ্টির এই স্পর্ধিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা জগৎময় জাগিয়ে তোলে এক বিপুল বিক্ষোভ, চরম অসহযোগ আন্দোলনে।

মহাত্মা গান্ধীর কী নগণ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুচ্ছ বিরুদ্ধতা? তার চেয়ে অনন্ত গান্ধী আরো এগিয়ে যেতে চায়, আরও প্রোগেসিভ্ প্রমাণ করতে চায় নিজেকে। ও' ভাবে সমগ্র বিশ্বের মানুষরা সারা সৃষ্টির এইরূপ যথেচ্ছাচার পরিচালন-প্রথার বিরুদ্ধে তুলে নিত যদি অহিংস-নীতির অপূর্ব অস্ত্র—অনশন ব্রত! ধ্বংস হতো মানুষ—অজানা-স্বর্গের সর্বময় হিরোহিটোর নড়ত হয়তো টনক!

আর ভেবে কি হবে, ভাবনার সময় কোথায়? নাঃ, জানোয়ারেরা মানুষের চেয়ে ঢের বেশি নিশ্চিন্ত, ভাবনা ভাবার হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পেয়েছে, মিথ্যে কথার আবিষ্কারে মগজ ঘামাতে হয় না। পশুদের এই পরম আরামের অবস্থা অনন্তর মনে একটা প্রচণ্ড হিংসে জাগায় ও'দের ওপর। ওঃ, মানুষের চেয়ে কি মজাসেই না আছে

ও'রা—মরবার সময় বিধান রায়কে না আনতে পারার আপসোস অন্ততঃ হয় না ও'দের। মেয়ের বিয়ে আর ছেলের বিয়ের ব্যবস্থার জন্যে হতে হয়না হায়রানি। এমন কি স্ত্রীর ভাবী বৈধব্যকালীন ভবিষ্যত সমস্যার ভাবনা ভেবে খাবি খেতে হয়না মৃত্যুকালে!

অনন্তর কাছে পশুজন্মই শেষ অবধি সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপন্থা হিসাবে প্রমাণিত হয়—যখন মানুষ একান্ত অসহায়, সৃষ্টির নিকৃষ্টতম নিদর্শন বলে বারংবার ও'র কাছে মালুম দিতে থাকে।

ও' এবার দুরন্ত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার মেরুদণ্ডে ও'র এই নতুন দার্শনিক মতবাদ যেমন করে হোক দাঁড় করাতে ও' দারুণভাবে উঠে পড়ে লাগতে চায়। ও' এবার অস্থির হয়ে উঠেছে সত্যিসত্যিই।

তবু স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় অনন্ত সব কিছু, কারণ ভেনিসে এসে আবার নতুন সমস্যার সামনাসামনি হাজির হতে হয়েছে ও'কে। 'কোথায় উঠবে', এই চিন্তায় আপাততঃ হতে হলো ও'কে চঞ্চল। যাই হোক ভারি মোটসমেত বেরিয়ে এসেছে ও' তখন স্টেশনের বাইরে। নানা আস্তানায় ঠোক্কর খেতে খেতে একটা 'হট্ট-মন্দির' তথা হোটেলের হল সম্মুখীন। তারপর সেখানকার একটি বালিন-বালা পরিচারিকার পরিচর্যায় 'একটা পরিত্যক্ত বাথরুমের শুক্‌নো বাথ্‌টবে রাত কাটাবার কোনক্রমে করতে পারল একটা ব্যবস্থা। অ্যামেরিকান আমন্ত্রকদের আমদানিতে ভেনিসের গ্রীষ্মাবকাশে তখন তিল ধারণের ছিলনা ঠাঁই।

বাথরুমে—খাটের সমান লম্বা, আর ইজিচেয়ারের মত এলান বাথ্‌টবটায় অনন্ত মোটা কম্বল বিছিয়ে একরকম অনায়াসেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করল।

একেই বলে, 'রাখে হরি তো মারে কে?

তখন সকাল হয়েছে। সেই অনন্তর অধিকৃত পরিত্যক্ত বাথরুমের পাশেই বড় ঘরটায় অ্যামেরিকান কাঁচাবয়সী খুকীদের অস্পষ্ট কম্বল-ঢাকা চাপা কথা-বলাবলির কল-কাকলি—সকালবেলার চামচিকিদের কিচির-মিচিরের মত অনন্তর ঘুমকে চুম্‌কুড়ি মেরেছে। ও' চোখ রগড়ে চাইল। কিন্তু আচ্ছা আপদ—এখন বেরোয় কি করে? ও'রা যে সব শুয়ে! অথচ বদ্ধঘরের অন্ধকারে বসে বসে কাঁহাতক "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়" মনে মনে আওড়ানো যায়—ও' ঘরে শুয়ে শুয়ে হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ঠিক এমনি সময় একটি ইয়াংকি-দুহিতা বাথরুম মনে করে বিস্রস্ত বসনে অনন্তর ঘরে ঢুকে অনন্তকে ওই অবস্থায় বাথ্‌টবে অবলোকন করে চমকে চিৎকার করে উঠলো আতঙ্কে, যেন কোন সত্যিকারের প্রেতযোনির মুখোমুখী পেয়েছে প্রমাণ।

যাক একটা পথ খুলেছে—অনন্ত এবার আলিস্যি ঝেড়ে ও'দের সামনে হল হাজির, ও'যে ভূত নয়, ওদেরই মত বর্তমান, একটি মানব-সন্তান এই প্রমাণের প্রচেষ্টায়। তারপর সকরুণ ভাষায় ও' ও'দের ভয়ের কারণ হওয়ায় মার্জনা ভিক্ষান্তে নিবেদন করল বিগত রজনীর এই অভাবনীয় সুখ-শয়নের অনতিপূর্ব অভিজ্ঞতার ইতিহাস—গুরু-গম্ভীর নাটকীয় ভঙ্গিমার সমাবেশ। এতে হাসির হয়ে গেল একচোট হোলিখেলা।

অ্যামেরিকান এই ছুটি উপভোগকারিনী ছাত্রীদল, তখন ও'কে নিয়ে পড়ল সব্বাই হুম্‌ড়ি খেয়ে। বাতাসে ও'দের সোনালী চুল উড়ছে, হাঁটুর ওপর ঘঘ্‌রাগুলো দুল্‌ছে—ও'দের এক-কোমর কৌমার্যের কল-কল্লোলে গৃহের প্রতিটি কোণ সেতারের গমকের মত গম্‌গম্ করতে লেগেছে পরিহাসের প্রাচুর্যে।

ও'রা অনন্তকে কিছুতেই ছাড়ল না—ও'দের ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণে

অনন্তর বাধ্য হয়ে হতে হল বন্দী। তারপর পানকৌড়ির পিঠের মত গণ্ডোলার গায়ে চড়ে ভেনিসের পানি-পথে হতে হল ও'দের সঙ্গে শহর দেখার পথচারী। মন্দ কী? ভাল রেস্তরাঁয় অপরাহ্নের আহার ভালভাবেই ইতি হল। তারপর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চায়ের পালাও সাঙ্গ হল সগৌরবে।

ও'রা যখন হোটেলে ফিরল তখন রাত্রের আহারের আয়োজনের চলেছে উপক্রমণিকা। অনন্ত দেখল দরজার কাছে বিরহিণী রাধিকার মত কার যেন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে সেই জার্মান পরিচারিকাটি, একটা হাতে দরজার চৌকাঠটি ধরা আলতো করে, যেন বাংলাদেশের মাসিকপত্রে বেরোনো পূর্ণ চক্রবর্তীর একটা ওরিয়েণ্টাল আর্ট—খালি শাড়িখানা পরিয়ে দিলেই ব্যাস্! সত্যিই যেন বিরহিণী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্যে করুণ নয়নে অপেক্ষা করে আছেন।

হাসি তামাসায় আমেরিকান তনয়াগুলি তখন একান্তরূপে হয়ে উঠেছে তরল। অনন্ত তাদের এড়িয়ে গণ্ডোলা থেকে মাটিতে পা দিয়েই আল-টপ্ না একফাঁকে পরিচারিকাটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—তারপর কুশল-বার্তা অনুসন্ধান অন্তে প্রথমেই নিবেদন করল ও'র দারুণ দুঃখের নৈবেদ্য: সকালে ও'র সঙ্গে সম্ভাষণ সমাপন না করেই ও'কে এদের পাল্লায় পাড়ি দিতে হয়েছিল শহর দেখার উদ্দেশ্যে। তারপর হাতের দু'আঙুলে নিজের কপালের দু'প্রান্ত ধরে বললে, "রোদ্দুরে ঘুরে কি মাথাটাই না ধরেছে।"

মেয়েটি মৌন, কোন কথাই কইল না, নারী চরিত্র অনন্তর কাছে সবই যেন একছাঁচে গড়া এই কথাই খালি মনে হতে লাগল—অভিমান! ও' কায়মনোপ্রাণে মেয়েটির চিত্ত-বিনোদনে মনোনিবেশ

করল। মেয়েটির অনুকম্পায় তো এখানে আস্তানা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই হোটেলে কালকের দুপুর অবধি থাকতেও হবে যেমন করে হোক—এখুনি বিলের টাকা না চেয়ে বসলেই বাঁচোয়া। একটি কানাকড়িরও পাত্তা নাই অনন্তর পকেটে।

পাশের সরু পথটা দিয়ে মেয়েটি তখন কথা না বলেই এগিয়ে চলেছে, আর অনন্ত চলেছে ও'র পিছন পিছন অনুসরণ করে। তারপর একটা ঘরের সামনে পৌছতে ও' দরজার ঘোরানো ছিট্‌কিনি খুলে দিতেই অনন্তও ও'র সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরে। এবার ও' কোটটা খুলে চৌকির কাঁধটায় কোটটা ঝুলিয়ে রেখে চট্ করে ঘুরে মেয়েটির পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। প্রথমে অনন্ত কোন কথা না বলে ও'র কোঁকড়ান চুলগুলো একটা আঙুল দিয়ে একটু একটু দোলা দিতে লাগল। তারপর সেই আঙুল আস্তে আস্তে ও'র ঘাড়ের কাছে নামিয়ে এনেছে—তখন ঘাড়ে সুড়্‌সুড়ি লাগতেই যেই মেয়েটি ঈষৎ শিউরে উঠে মুখ ঘুরিয়েছে, অমনি অনন্তর বঁড়শীর মত বেঁকানো ঠোঁটের টোপে নিমিষে নিজেকে ফেললো গেঁথে—তারপর তাই মুখে নিয়ে মেয়েটির ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হওয়ার সে কি আপ্রাণ পরিশ্রম—ছিপ্ যে ধরে আছে সে কিন্তু মাছ নিয়ে খেলা করায় উঠেছে তখন মেতে।

অনন্ত জলের মাছকে ডাঙায় তুলেছে, খাবি খেয়ে ছট্‌ফট্ করা ছাড়া—আর কোন উপায় আছে কী তখন ?

অনন্তর মেজাজ এই মেয়ের পাল্লায় পড়ে নিস্‌পিস্ করতে লাগল, কি যেন একটা ন্যক্কারজনক নোংরামিতে। ও'র জীবনে পৃথিবীর এই একান্ত বাজে জীবের সঙ্গে যতবার জড়িত হতে বাধ্য হয়েছে

তেতবারই বহু ক্ষতি ও বেজায় বিপর্যয়ের পড়েছে বাহু বন্ধনে। নারীর আবশ্যকতা স্বীকার করলেও অনন্ত ও'দের নিতান্তই অপদার্থ মনে করে। পয়সা আর সময়ের প্রাচুর্য থাকলে ও'র দরকার হয় মেয়েদের।

অনন্ত নারীর মর্যাদা না দিতে পারলেও মূল্য দিয়েছে—দস্তুরমত দারুণ দাম দিয়েছে প্রত্যেক দফায়। জীবনে মেয়েদের মত অনন্ত এত মেকি আর অচল কোন বস্তু কী আর আবিষ্কার করতে পেরেছে ?

—না বোধহয় !

—তবু আজ ও' এই মেয়েদেরই একটির মোসাহেবি করতে বাধ্য হল, অভাবে স্বভাব নষ্ট, কি আর করা যাবে ?

বাথ্‌টব্‌ থেকে আজ রাত্তিরে অনন্ত সবার সেরা বিছানায় পেল ও'র শরীরটা বেছাতে। কি আরাম ! তুলোর চেয়ে তুলতুলে লাগল—ননীর মত নরম ! তবু গাটা ঘেন্নায় শির্‌শির্‌ করে ওঠে—এমনি মজা। আবছা বাতিটা বেশ ছায়ার মত আলো ছড়িয়েছে চারিধারে তার ওপর ইতালীয় রেড্‌ওয়াইন, উপাদেয় !

ও' আজ এক রাত্তিরের জন্যে এই জার্মান হোটেলের পরিচারিকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী এদ্দার হৃদয়-রাজ্যের হারুন-অল্‌-রসিদ হয়ে উঠেছে বুঝিবা।

অনন্তর নিজের খাওয়া-দাওয়া থাকা সম্পর্কে একটা অসম্ভব কনট্রাস্ট একটা অদ্ভুত ছবি তৈরি করেছে যেন নিজেকে। কখনো প্রাসাদে, কখনো ফুটপাথে। কখনো বেস্ট হোটেলে, কখনো ডার্টি ডেন্‌-এ। ও' খাওয়া-দাওয়া থাকা সম্পর্কে সত্যিই উদাসীন। যেখানে হোক একটা জায়গায় শুতে পারলেই ও' সন্তুষ্ট, যে কোন বস্তু দিয়ে পেটের মধ্যে সেই আদিম বাস্তুঘুঘুটিকে কিছুটা ঘায়েল করতে পারলেই ও'র পরম শান্তি, না খেয়েই তো সাল্‌সবুর্গ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, এবারে ও' পশুর মতই পথে-পথেই জুটিয়ে চলেছে পাথেয়······

দ্বিতীয় দিনের রাত্তিরও ভোর হল ভেনিসের ওপর, আজকেই আর কিছুক্ষণ বাদেই ও' বোটে উঠতে পারবে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে।

আঃ কি আরাম, অন্ততঃ দশ বারোদিনের মত রেহাই। ভাগ্যের রাহাজানির হাত থেকে অন্ততঃ ঐ কটা দিন রক্ষা পাবার আশা রাখে ও'।

ও' এদ্দাকে ঘুম থেকে না উঠিয়েই সাফ্‌সুতরো হয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। তারপর নিজের হাত-ব্যাগটা খুলে বের করলো রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাভার্‌স্‌ গিফ্‌ট্‌খানা', এই বাক্সে বইখানা যে অকস্মাৎ এত কাজে লাগবে তা ও' স্বপ্নেও ভাবেনি। নিজের নাম লেখা, বইটাতে ততক্ষণে শেষ হয়েছে। তারপর মেয়েটি জাগতেই ও'র মুখের কাছে, খুব কাছে নিজের মুখটা নিয়ে বললে: "আজ ও' যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, দেশে ফিরে যাচ্ছে! ও'র মুখ মনে করে বিনা বিলম্বে ফিরে আসবার জন্যেই তো যাচ্ছে এত তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যে এই বইটা উপহার দিচ্ছে ও'কে যাবার সময়। বইটার কবিতাগুলো ও' যেন পড়ে।" তারপর জানাল: "ও, যদি কিছু না মনে করে তবে একটা আর্জি ও' ভারতবর্ষের নামে পেশ করত, যথা —

ভারতবর্ষের অনুন্নত সম্প্রদায়কে মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' আখ্যায় ভূষিত করেছেন, অর্থাৎ তারাই একমাত্র সাক্ষাৎ ভগবানের ভলান্টিয়ার, তাদের সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্যে ও' কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে উপরোক্ত বইটির উপহার প্রদানের আদান হিসাবে। ভারতবর্ষে গিয়ে ও' তা স্বয়ং পৌঁছে দেবে মহাত্মা গান্ধীকে নিজেহাতে। ও'র নাম 'হরিজন ফাণ্ডে'র সাহায্যদাতা হিসাবে অনন্তর দেশের প্রত্যেক পত্রিকাতে ফোটো সমেত বেরোবে — তার কাটিং ও' নিশ্চিত পাঠিয়ে দেবে ও'কে, ও'র এখানকার ঠিকানায়। এতে ও' ভারতবর্ষে এলে

বিদেশিনী হলেও ও'র সামাজিক আসনের বনিয়াদ পাথরের মতই হবে শক্ত—যা টলানোর সাধ্য হবে না আর কারো।

ঘুম থেকে সবে উঠেছে এদা—ও'র এলোমেলো চুল, পার হয়ে আসা রাত্রের স্বপ্নাবেশ এখনো ও'র মুখ থেকে নিঃশেষে মুছে যায়নি। ও' অনন্তর পাশে ড্রেসিং-টুলটায় এসে বসল, তারপর ড্রেসিং-টেবিলটার একটা ড্রয়ার টেনে বের করল, মাত্র পরশু পাওয়া এ-হপ্তার মাইনের টাকাটা—

"অনন্ত হোটেলের হাঙ্গামা মিটিয়ে গণ্ডোলায় উঠতে যাবে···মেয়েটি গণ্ডোলায় অনন্তর ভারি ব্যাগটা তুলে দিতে দিতে চুপি চুপি বললে—"ফিরে আসতে দেরি করনা লক্ষ্মটি, তুমি আমায় বিয়ে করে কবে তোমার দেশে নিয়ে যাবে আমায়? তারই আশায় অপেক্ষাতে দিন কাটবে যে আমার এখানে!"

অনন্ত একটা পা গণ্ডোলার গায়ে চড়িয়ে বললে—"কি বলছ, আমি কখনো দেরি করতে পারি? আমি আমার আর দুই স্ত্রীকে এবার ফেরবার সময় নিয়ে আসবো তোমার জন্যে, তা নইলে তোমাকে আমার অন্দরমহলে বরণ করবে কারা?"

জাহাজে ওঠবার মুইয়ে শ্রীচরণ ছুঁইয়ে অনন্ত পকেট হাতড়ে

দেখল—'হরিজন ফাণ্ডে'র টাকায় হোটেলের প্রাপ্য চুকিয়ে গণ্ডোলার ভাড়াটা ঠিক টায় টায় চুকে গেছে।
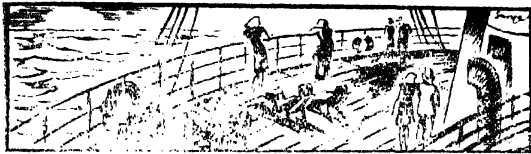
—জাহাজে করবার কিছুই নেই, কিছুই নেই করবার।

ঠুঁটো জগন্নাথের মত ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁহাতক বসে থাকা চলে? ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোগের পালা—একান্ত দুর্ভোগের মতই আসতে থাকে অনবরত। আহারের অন্বেষণ নেই, আবশ্যক নেই, তবু এত অপর্যাপ্ত আহারের উপচার ও'র কাছে ক্রমাগত অপচয় বলে মনে হতে লাগল। এই একান্ত কাম্য অখণ্ড অবসর অনন্ত গান্ধীর কাছে আজ বুঝি অনন্ত হয়েই দেখা দিয়েছে—ও' বরাতের এই অপরিসীম বরবাদ আর সহ্য করতে পারে না। অনবরত খাওয়ার ঘণ্টার এই বিরক্তিকর বেয়াদপিতে এবার সত্যিই বিরক্ত হয়ে ওঠে ও'। একান্ত আবশ্যক অপরিহার্য এই 'আহার' বস্তুটি যেন ইন্দ্রিয় চরিতার্থের মত কিংবা প্রাতঃকালীন নিত্য-নৈমিত্তিক অবশ্য করণীয়ের মত নিতান্ত নোংরা আর অনিবার্য অশ্লীল বলে বারবার অনন্তকে অসহনীয় অশান্তিতে উদ্বাস্ত করে তুলল।

জাহাজটা যে এগুচ্ছে তাও যেন বোঝবার জো নেই, চারিধারে একঘেয়ে জল আর জল।

এই সমুদ্র দেখে বহুত কবি বহুবার বহুত কাব্য কপ্‌চেছে কিন্তু অনন্তর অনুভূতিতে তা নিছক অনুত্তেজক হোমিওপ্যাথি ওষুধের মত নেহাৎ হাল্কা বোধ হতে থাকে।

অনন্ত গান্ধী ভেবে পায় না—ভগবান, আদমি নামক এই উচুস্তরের

উপজীবটিকে যদি বানালেনই, তবে খাওয়া, প্রাতঃকালীন প্রথম প্রয়োজন, আর আসঙ্গ ঈপ্সার ইতর অবশ্যকতার হাত থেকে রেহাই দিলেন না কেন?

ও' তখন আরো ভাবে—আচ্ছা উর্বশীরও কি দরকার হত প্রাতঃকালের প্রথম এবং আদিম আবেগের? ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রেরও তো শোনা যায় শরীর সম্ভোগ সমাধায় সম্ভব হয়েছিল শকুন্তলার জন্ম! কিন্তু কালিদাস? তারও কি খিদে পেতো, বিরহী যক্ষের ঐ মেঘের মারফৎ বেদনা নিবেদনের ফাঁকে ফাঁকে, ঐ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা—সামান্য খালাসীটার মতই খিদে পেতো?

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে ও'র ঘেন্নায়। সৃষ্টিকর্তার উপর রাগে রী-রী করে ওঠে সর্বাঙ্গ। বিধাতার বিরুদ্ধে সারা মেজাজটা ও'র শানাতে থাকে, তারপর বিতৃষ্ণায় বমনের বাসনা জাগে বারংবার।

অসম্ভব এই একঘেয়েমির ঘা কোন মলমে মোলায়েম হবে তা' আর ও'র মালুম হয় না। জাহাজের এই নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ততা নতুন জুতোর মত প্রত্যেক পদে পদে ও'র মনকে মনোকষ্ট দিতে আরম্ভ করেছে। নিজের মর্জি মাফিক যে একটা ভাল হুইস্কি হাতে উত্তেজিত করবে অবসরটাকে এমন কি নেহাৎ নম্র একটা নেংড়ানো নেবুর নির্যাসে অর্থাৎ সরবৎ নিয়ে, তারও উপায় নেই এমনি একটা অর্থহীন অসহ্য অবসর ও'র।

অস্থিরতা ও'র স্থির শরীরের শিরায় শিরায় অসহনীয় আবেগে শিহরিত হতে থাকে।

কিন্তু জাহাজে কী মেয়ের অভাব ছিল? কেন, প্রেমের ভানের

মত অত সহজ আর সোজা বিনা পয়সায় সময় কাটাবার উপায় আর দ্বিতীয় আছে কি দুনিয়ায়? ঐতো ডেকে কেমন জোড়া জোড়া রোদ পোহাচ্ছে—সভ্যতার উলঙ্গ প্রদর্শনী ও'দের বিবস্ত্র অবয়বে কি চমৎকার বিস্তৃতরূপ বিস্তার করেছে!

অনন্ত গান্ধী কি করবে উপায় আছে কি তার কিছু? মেয়ে দেখলেই কিল্‌বিল্‌-করা কেন্নো কিংবা শুঁয়োপোকার কথা মনে পড়ছে এ-ক'দিন ধরে ওর। থেঁত্‌লে যাওয়া শুঁয়োপোকা, খালি পুঁজ সমেত মাংসের দলা, তাতে না আছে হাড় না আছে রক্ত। ও' এবার স্থির নিশ্চিত—মেয়েরা সত্যই শুঁয়োপোকার জাত!

আচ্ছা, শুঁয়োপোকার ব্রেন কী আছে?

থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সারা শরীরময় নির্ঘাৎ ছড়ানো থাকে তা। আর হৃদয়? সে তো পাঁজরাহীন নিম্নাঙ্গে শুধু ধুক্‌-ধুক্‌ করে নাকি।

•

নাঃ, মেয়েদের পাল্লায় অনন্ত গান্ধী কিছুতেই আর পড়ছে না—ও' এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব সবদিক ভেবেচিন্তে ও' ভাবে সামনে ডাক্তার বঙ্কিমের দলেই ভিড়ে পড়া সবচেয়ে ভালো।

ডাক্তার বঙ্কিম মুখুজ্জে লণ্ডনে দাঁতের ডাক্তারি শিখে দেশে চলেছেন, এতদিন বিলেতে থেকেও মেমের মোহাঞ্চলে বাঁধা পড়েন নি—আশ্চর্য বলতে হবে! রসিকতার রস রসগোল্লার মত সব সময় তিনি

তুলতুলে—খালি ব্যাটিং-এর জোরে মাঝে মাঝে তাঁর সেই বাক্যগুলি যেন ক্রিকেটের বলের মত অন্তরসের রসি ডিঙিয়ে আদিরসের ওধার অবধি অবলীলাক্রমে পারাপার হয়ে যায়। ও'র এমনিধারা বাহাদুরিকে তারিফ জানাতে প্রশংসায় সবাই যেন তোতলা হয়ে ওঠে—এ হেন বঙ্কিম ডাক্তার, যিনি বন্ধু মহলে ডাক্তার বাঙ্কাম বলেই বিখ্যাত, তার আসর বাঙালী ফেরতা-ছোকরাদের জমায়েতে সব সময় জমজমাট!

ডেকে ডাক্তার বঙ্কিমের আড্ডা তখন চলেছে পুরোদমে—ও'দের সেখানে কথা চলেছিল তখন অরুণ মিত্তিরকে নিয়ে, আই-সি-এস্ না হয়েই যদিও ফিরছে—তবুও সে নাকি বাংলা দেশের বিয়ের বাজারে একটি রুই কাতলা বিশেষ। কারণ তার বড় দাদা তো আই-সি-এস্, আর এখন নাকি বগুড়ার সর্বময় কর্তা! লগুড়াঘাতে স্বদেশী সভা তিনি সাবড়ে বেড়াচ্ছেন যে রেটে, তাতে সামনে বছরে একটা খেতাব মিললেও মিলতে পারে। অরুণের ভাবী শ্বশুর আর কি চায়? উপরন্তু অরুণের অংশে বাপের টাকাও কিছু যে কম্‌তি আছে এমনও নয়। এ ছাড়া অরুণ দু-দুবার বিলেতে গেছে ফিরেছে, অথচ মেম্ বিয়ে করেনি—অর্থাৎ স্বভাবভ্রষ্ট হলেও চরিত্তিরটা বজায় আছে ষোলো আনাই বলতে হবে।

এবার ডাক্তার বঙ্কিম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুগম্ভীর স্বরে শুধালেন :—

"তা অরুণ দেশে ফিরেই চার চরণ এক হচ্ছে তাহলে এবারে? নিমন্ত্রণটা যেন বাদ না পড়ে, দেখো—আমাদের এই দলের কজনের জন্যে শ্যাম্পেন আর 'বুফে' ডিনারের ব্যবস্থা আলাদা একটু রেখো, বুঝলে হে—আমাদের পাত পেড়ে গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর রাবড়ি রসগোল্লা হঠাৎ এতদিন বাদে সহ্য হবে না।

এমন সময় নিতীশ রায়কে পাশ থেকে কে উস্কে তোলে—ও' বলে :

—কিন্তু বাক্কাম তোমার ঐ 'চার চরণ এক' কথাটার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না।

—এর অর্থই তো হচ্ছে যত অনর্থ! অর্থাৎ—স্বয়ং পানিনি পানিপীড়নকে 'চার চরণ এক হওয়া' আখ্যায় ভূষিত করেছেন, আমি পানিনির সেই অমর আখ্যাটি উদ্ধৃত করেছি মাত্র। আমার ওরিজিনালিটি এতে কিছুই নেই।

সদ্য ব্যারিস্টর স্বধীর বললে :

"—ডাক্তার তুমিই বা বিয়ের বাজারে কিছু কম দামের কী? নিজের কথাটাই বলো না—মিস্ চ্যাটার্জি আজো নাকি তোমার জন্যে তাকিয়ে থাকে জানালা খুলে—সেই যে তের নম্বর বাড়ি, ভুলে গেলে?"

—অপেক্ষা করলে কি হবে, কলেজে পড়তে হেদোর ধারে একদিন এক সাধুকে হাত দেখিয়েছিলুম—সে হাত দেখে বলেছিল 'যে : 'ধন-স্থানে আমার কেবলি কেশাগ্র ভাগ—তাও আবার নাকি গ্রহের নয় উপগ্রহের! তখন অর্থটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি. কিন্তু আজ পেরেছি; অতএব বাসনা থাকলেই বা করছি কী? বিয়ে করলেই তো বৌ আজ ঠাকুরলাল হীরালালে গিয়ে বলবে—'হীরের দুলটা বড় ভাল লেগেছে কিনে দাওনা গো' তারপর জেঠমল্ ধলমলের দোকানে গিয়ে বলবে : 'এই বেনারসী সিল্কের শাড়িটা কি স্বন্দর!'—ব্যাস্, এখন না কিনে দিতে পারলেই শোবার সময় কার্টেন লেকচারের ঠ্যালায় কাঁপতে হবে ঠক্ ঠক্ করে। দরকার কি অতশত হাঙ্গামায়? ট্যাকের অবস্থা ঠনঠনের থেকে টনটনে না হলে বিয়ের বাউণ্ডারিতে পা বাড়ানো মানেই নিজের দড়ি আর কলসির জোগাড় করা। পরের দাঁতের ব্যায়রাম দেখা তখন মাথায় উঠে নিজের দাঁতের ডাক্তারিতেই দিনাতিপাত করতে হবে—বুঝলে হে সব বালখিল্লের দল! আজকালকার . মেয়েদের, শুধু, বিয়ে করলেই হল না—গয়না, শাড়ি

আর গাড়ির বড় আইটেমগুলো বাদ দিলেও লিপ্‌স্টিক্‌, আইব্রাও পেন্‌সিল্‌, রুজ, পাউডার, পমেড, ক্রিম্‌ এই সব খুচরো খরচের মাসকাবারি প্রিমিয়মের ঠ্যালায় চোখে শর্ষে ফুল!

অনন্ত দূর থেকে বঙ্কিমের উক্তিগুলো যুক্তিপূর্ণ বলেই বোধ করল। ও' আকৃষ্ট হয়ে আরো কাছে সরে এল, তারপর ডেকের রেলিংটায় একটি পা উঠিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনতে লাগল ওদের আলোচনা। ডাক্তার বাম্বাম এবার বঙ্কিম দৃষ্টি দিয়ে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্তকে দলে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বললেন:

"—আপনিও দলভুক্ত হতে চান নাকি? ডেক-চেয়ারটা নিয়ে এগিয়ে আসুন না তবে। মিছে লজ্জা পাচ্ছেন কেন?—মেয়েরা এখানে তো কেউ নেই। এখানে ওঁদের নিয়ে নিত্য মাতা বোলানো হলেও—আমাদের এই আড্ডায় চরিত্তিরটা ঠিক বজায় রাখা হয়—শরীর সমেত নারীর এখানে প্রবেশ নিষেধ অন্ততঃ পক্ষে যতদিন ডাক্তার বাম্বাম এখানকার সর্দার—বুঝলে ভায়া?"

অনন্ত ফ্রেঞ্চ-ঘ্যাঁষা নরম উচ্চারণে ক্ষমা চাইল ইংরেজি ভাষায়—যে, ও' বুঝতে পারেনি ওঁর ভাষা।

এবারে বাম্বাম ইংরেজিতে বললে:

"—মাফ্‌ করবেন, আমি ভেবেছিলুম আপনি আমাদের স্বদেশীয়, আজ্ঞে আপনার নিবাস?

—তাহিতি দ্বীপে।

—অ্যাঁ, বলেন কী! রোম্যান্টিক সাউথ্‌ প্যাসিফিক্‌ আইল্যাণ্ডের সেই তাহিতি দ্বীপে—তা এ জাহাজে? এ তো ভারতবর্ষে যাচ্ছে আপাতত।

—আমার মার কাছ থেকে শুনেছি, তাঁর মাতামহীর শিরায় ছিল নাকি ভারতীয় নাবিকের শোণিত, তাই সুবিধা যখন হয়েছে তখন

ভারতবর্ষে—আমার মাতার পূর্বপুরুষের পিতৃভূমিরূপ তীর্থক্ষেত্রে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, বর্মা, মালয়, জাভা প্রদক্ষিণ করে দেশে ফেরার বাসনা।

—তা আপনার আপাতত আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

—লণ্ডনে গিয়েছিলুম করোনেশন উৎসবে, তারপর ফ্রান্সে ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপোজিসিওঁ দেখে ফিরছি।

—ক্ষমা করবেন আমার কৌতূহল, আপনার পেশা? দেশে কারবার—না চাকরি করা হয়ে থাকে?

—তাহিতি দ্বীপের একমাত্র পত্রিকার আমি সত্ত্বাধিকারী আর সম্পাদকও বটে।

—তা ভালো, তা ভালো, তবে আপনি জার্নালিস্ট, কী বলেন? আলাপ হওয়ায় বড় আনন্দ লাভ করলেম—তা আপনার নামটা তো জানা হলো না।

—আঁদ্রে গোগাঁ।

—অ্যাঁ! আপনি কি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পল গোগ্যাঁর কেউ হন নাকি?

—আজ্ঞে পল গোগ্যাঁ যে বিবাহ করেছিলেন সে দেশের একটি মেয়েকে তারই ছেলে হচ্ছেন আমার পিতা।

—বলেন কী! আপনি তো দেখছি তাহলে সাক্ষাৎ গোগ্যাঁর বংশধর!

বঙ্কিম দাঁতের ডাক্তার হলে কী হবে, রুচিবোধের বালাই ছিল ও'র দস্তুরমত। ভান্ গগ এর সঠিক উচ্চারণ যে ফান্ গঃ, আর এটি যে ও' জানে এজন্যে ও' বেশ একটু গর্ব অনুভব করত মনে মনে। এমন কি কোন না কোন ছুতোয় একবার জাহির করতে পারলে বড়ই আত্মতৃপ্তি লাভ করত। দেশে ফিরে ও'র চেম্বার

সাজাবার জন্যে মেডিচি প্রিণ্টও কিনেছে দুচার খানা, এ ছাড়া ভালো ভালো বাছাইকরা বিলিতী রেকর্ডও। অর্থাৎ সমজদার সাজবার সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহের কোন ত্রুটিই ছিলনা। ও'র মতে—দাঁত তোলবার সময় ভালো 'বাক্' কিম্বা 'বেতোফেন' রুগীর মনের উপর ক্রিয়া করে। তাতে দাঁত তোলার পর, গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে থাকে কম, কিংবা পড়লেও তা বন্ধ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

আঁদ্রে গোগ্যাঁ তখন বঙ্কিমকে জিগেস করে:

"—আচ্ছা মঁসিয়ে···"

—আমার নাম ডক্টর মুখার্জি।

—আচ্ছা ডক্টর মুখার্জি, আপনি বলুন তো, আমার চেহারায় ভারতীয় ধাঁচ আছে কী কোথাও? সবাই আমায় গোড়ায় ভারতীয় বলে ভুল করে—কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে আমার দেশের লোকের সঙ্গে আমার চেহারার কী পার্থক্য—কেন আমায় লোকে ভারতীয় বলে ভুল করে?

এবার ডাক্তার বঙ্কিম সুজিতের দিকে ফিরে বাংলায় বললেন:

"—দেখেছ সুজিত, লোকটার নাকটা থ্যাদা থ্যাদা কিম্বা বাদামের মত চেপ্টা চোখ হলেও, কোথায় যেন সত্যিই একটু ভারতীয় আমেজ আছে চেহারায়।"

—হ্যাঁ তুমিও যেমন, অমনি একটা জলজ্যান্ত পলিনেশিয়নের মুখে ভারতীয় আমেজ দেখতে শুরু করলে, ও'র কোনখানটা ভারতীয়? আমি তো ও'র মধ্যে ছিটেফোঁটা কোথাও ভারতীয়ের 'ভ' এরও সন্ধান পাচ্ছিনে।

এদিকে অনন্ত গান্ধী সত্যিই তখন মনে মনে বেশ একটু আতঙ্ক অনুভব করছিল। আদতে এলোপাথাড়ি গাঁজা চালাতে চালাতে ও'র উদ্ভাবনী শক্তি শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে।" গোগ্যাঁর ছবির প্রিণ্ট

ছাড়া তো জীবনে গোগ্যাঁর একখানা ওরিজিন্যাল দেখার ও'র সুযোগ ঘটে ওঠেনি। গোগ্যাঁর জীবনী ? সেও তো মমের 'মুন্ অ্যাণ্ড সিক্স পেন্সের' দৌলতে, সেইজন্য বেশী দূর দৌড়লে দড়াম্ হবার সম্ভাবনা আছে। এটি সত্যিই ও আঁচ করতে লাগল অত্যন্ত রকম।

ওদিকে তখন ভারতীয় দাঁড়কাক দল, যাঁরা ময়ূরপুচ্ছ পরিধানে ময়ূর হয়েছি মনে করে পেখম ঘুরিয়ে ঠোক্কর মেরে বেড়ান সকলকে, সেই সব তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়েলদের মধ্যে জাহাজেই শুরু হয়ে গেছে একটা বিষম চাঞ্চল্য, গোগ্যাঁর সাক্ষাৎ নাতি এক জাহাজেই চলেছে নাকি ভারতবর্ষে—এই গুজব রটনার সঙ্গে সঙ্গেই। আবিষ্কারের গর্বে ডাক্তার বঙ্কিমের বুকের ছাতি মাঝে মাঝে তখন বত্রিশ থেকে চল্লিশে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এক একবার। সত্যিইতো এটা কি কিছু কম চাট্টিখানি কথা—গোগ্যাঁর নাতি, ডিরেক্ট্ ডিসেনডেন্ট, উপরন্তু তার শোণিতে আছে ভারতীয় শোণিত। অরুণ মিত্তির দেশে ফিরে চাই কি অভিজাত পত্রিকা 'অপরিচয়ে' একটা গবেষণামূলক আর্টিকেল্ লিখে ফেলতে পারে —কেন গোগ্যাঁর ছবিতে ভারতীয় ভাবধারার আমেজ দেখা যায়—'সাউথ অ্যামেরিকায় হিন্দু সভ্যতার সন্ধানে'র চেয়েও মৌলিকতায় সে কি কিছু কম্‌তি হবে ? এর যা কিছু ক্রেডিট সবই প্রাপ্য কিন্তু ডাক্তার বাঙ্কামের। বাঙালী মহল বাঙ্কামের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে অ্যাড্‌মিরেশনে পালটে পড়বার উজ্জুগ করেছে তখন। বঙ্কিম ডাক্তার তার নিজের পোজিশ্যন্ পোক্ত রাখার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব প্ল্যান্ করতে ব্যস্ত আঁদ্রে গোগ্যাঁকে কি রকম খাতির করা উচিত, দেশে গিয়ে কোথায় গেস্ট রাখা যায়, কার কার আর্ট কলেক্‌সন্ দেখানো যায়, এই সব ভবিষ্যৎ ভাবনায় দস্তুরমত ঘাম মারতে লেগেছে তখন বাঙ্কামের। দেশে গিয়ে ডাক্তারির পসার বাড়াতে একি একটা কম অস্ত্র। বাঙ্কাম আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক পাব্‌লিসিটির প্যাচটা ও' ভালই বুঝতে পারে। আঁদ্রে গোগ্যাঁ

ও'র ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের যে একটা মস্ত মূলধন এটা ও' ভালই বুঝতে-পেরেছিল। তাই দুপুর বেলায় রেড সির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলার সময় সবকটা ফলের সরবৎ-এর বিল্ বেকসুর ডাক্তার বঙ্কিমের খাতায় জমা হতে লাগল, উপরন্তু রাত্রের আহারের সঙ্গে প্রচুর পানীয় পরিবেশনের চলল পোষ-পাব্বনের পালা।

যাক্, এইবার এত দিন বাদে জাহাজের একঘেয়ে জীবনযাত্রার বদ্‌হজমী পাঁসুটে রংএ গোলাপের পাপড়ির দেখা দিয়েছে যেন আমেজ।

অনন্তর বরাতে এ হল যেন ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। জাহাজ তখন রেড সি পেরিয়েছে—তখন উঠল কিনা আসর জমে। এক একটা দিন যেন হ'য়ে উঠল বাংলাদেশের বিবাহ-বাসরের মত অভূতপূর্ব উৎসব আসর। আর এই অদ্ভুত পরিবেশে অনন্ত গান্ধী অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক জড়িত হয়ে, ছুকৃরি শ্যালিকাবৃন্দ পরিবেষ্টিত জামাতার মত চক্রাকারে উপবিষ্ট অ্যাডমায়ারারদের চব্বিশ ঘণ্টা অসহ্য আদরে বান্‌চাল্ হবার উপক্রম।

অনন্তর অবসর আবার ঘোলাটে হয়েছে এইসব নানা ঘটনার জটিলতায়। ও' দুশ্চিন্তাহীনতার হাত থেকে পেল যেন নতুন দুর্ভাবনার রাজত্বে আবার এক অপূর্ব নবজন্ম!

এবারে ও'র জন্যে সত্যিই তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু ডাক্তার বাঙ্কাম, অনন্ত তথা আঁদ্রে গোর্গ্যার জন্যে ভারতবর্ষের ট্যুর প্রোগ্রাম ব্যবস্থায় তখন বেজায় ব্যস্ত। বাঙ্কামের বাসনা যে ও' কলকাতায় আগে আসুক, তারপর যেখানে ইচ্ছা ঘুরুক ভারতবর্ষে।

কিন্তু কলকাতায় না এলে ও'র প্ল্যান্ সব যে মাটি। অথচ বাক্কাম যতবার ও'কে কলকাতার কথা তোলে ও' ততবারই ধামা চাপা দিয়ে বম্বের এলোরা, হায়দ্রাবাদের অজন্তা, এমনকি কোথায় গোয়ালিয়রের বাঘ গুহা আছে তার সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসায় হয়ে ওঠে আটখানা।

ডাক্তার বাক্কাম এবার আর স্থির থাকতে না পেরে বললেন :—

"—দেখ আঁদ্রে গোর্গ্যা! কলকাতার কালী মন্দির, আর পরেশনাথের মন্দির, তুমি যদি না দেখে ফের ভবে ভারতবর্ষে আসাই তোমার বৃথা। আর আমি জানি, ভারতবর্ষের যত নাবিক সব বাংলা দেশের চট্টগ্রাম থেকে আসে, আর তাদের ডিপো হচ্ছে খিদিরপুরে। খিদিরপুরে না এলে তোমার মার মাতামহীর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতই বাদ পড়ে যাবে, যে কারণে একরকম বলতে গেলে তোমার এদেশে আসা। আমি বলছি, তুমি চল আমার সঙ্গে, তোমার কিচ্ছু খরচ লাগবে না।"

—মঁসিয়ে মুখার্জি, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি আপনাদের তুলনায় অর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত সামান্য—বলতে গেলে পিপীলিকা প্রায়—তাহিতি দ্বীপের জার্নালিস্ট, বুঝতেই পারছেন কী তার অবস্থা! তার উপর নানা দেশ ঘুরতে গিয়ে পুঁজিপাটা প্রায় সাবড়ে এসেছে। বম্বেটা দেখা হলেই আবার জাহাজে উঠবো ঠিক করেছি। সেখানে, আপনাদের কথাই আলাদা! প্রবাদ বাক্যের মত শোনা যায় প্রত্যেক ভারতীয়ই কম বেশি এক একজন মহারাজা বিশেষ, মেজাজে এবং মোহরেও—সত্যি কথা বলতে কী ভারতীয় অথচ আপনার মাথায় মুকুট না থাকাতে প্রথমটায় আমি বেশ একটু দমেই গেছলাম।

এরপর বাক্কামের রেলভাড়া গাঁটের থেকে খসিয়ে আঁদ্রে গোর্গ্যাকে তার রাজকীয় আতিথেয়তার আস্বাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ না দিয়ে পথ ছিল কিছু?

না ভারতবর্ষের সম্পর্কে এই উঁচু ধারণা বিদেশীদের কাছে খর্ব করতে ডাক্তার বাস্থাম কিছুতেই রাজি ছিল না। দেশের মান-সম্মান সম্পর্কে এতদিন বিদেশে থাকায় সত্যিই ও' যথেষ্ট সচেতন হতে বাধ্য হয়েছিল।

যাক বেশি দেরি ছিল না, কালকেই তো বম্বের বন্দরে পৌঁচচ্ছে এই বাষ্পীয়পোত। সেইজন্যে আঁদ্রে গোগ্যাঁকেও বাধ্য হয়ে বঙ্কিমের আমন্ত্রণের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিলনা একদম।

ট্রেনের ভাড়া আর খাওয়া খরচের দায় থেকে ভগবানের দয়ায় রেহাই তা হলে ও' পেল সত্যিই। ভালয় ভালয় একরকম করে কলকাতার কোলে চড়তে পারলেই হয় এখন।
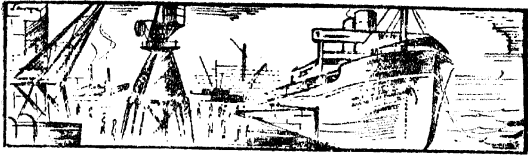
জাহাজ বন্দরের ব্লাউজে ঢুকিয়েছে তার হাত নয়, হালখানা! তারপর পীড়নের পরিবর্তে আলোড়নে চারিধারের জল করে তুলেছে তরঙ্গ সমাকুল।

যাক্, ভালোয় ভালোয় বন্দরে পৌঁছনো গেল শেষ অবধি!

মালপত্তর নামানোর পালা এখন। তারপর আছে কাস্টামের ফাঁদ।

কিন্তু অনন্তর মাথায় ঘুরছিল তখন অন্য কথা। চোখে ভাসছিল ও'র—এইসব মানুষ-নামধারী চিজ্‌গুলির চেহারা। সে চেহারা যদি কোন ফাঁকে সালভাদো দালির দৃষ্টির ফাঁদে পড়তে পারত, পৃথিবী পরিচয় পেত হয় তো একটা অপূর্ব সৃষ্টির, তার নবতম চিত্রে।

অনন্ত তখন দেখছে: মানুষগুলো যেন ইয়া বড় বড় ব্যাঙাচির মত রূপ ধরে পানাপুকুরের মত ঘোলাটে গণ্ডিতে ঘুরঘুর করছে, গর্দভের গড়নে তৈরি তাদের মুখাবয়ব, শুধু পশ্চাতের পরিবর্তে মস্তিষ্ক থেকে গজিয়েছে ন্যাজ—ব্রেন নয় নিছক ন্যাজ। তাদের রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠের চিৎকারে কানে তালা ধরার উপক্রম। বহুৎ সুর বহু রকমের—

কখনো কমিউনিজ্‌ম্‌, কখনো সোসালিজ্‌ম্‌, কখনো ইকোয়ালিটি, কখনো হিউম্যানিটি, রকমারী আওয়াজ।

এইসব গর্দভ গলার ধ্বনিত গিটকিরিতে আকর্ষণ অনুভব করে তারাই, যারা তাদের সমগোত্রীয়।

ওঃ, অনন্তকে নিয়েই তো সাল্‌স্‌বুর্গ থেকে শুরু করে সারা রাস্তাময় জাহাজটায় কি কাণ্ডই না করল এরা, কি অদ্ভুত নাচা-কোঁদা। মানুষ হিসেবে যদি অনন্ত সত্যিকথা বলত মানুষের কাছে, দাবি করত যদি মানুষের মত ব্যবহার, বলত যদি ও'র টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা, খরচে লোক, হিসেব রাখতে পারিনি এই বলে— সিগারেট ধরাবার জন্যে অকুণ্ঠিত দেশলাই চাওয়ার মতই যদি জানাত ও'র দাবি—এইসব তথাকথিত মানুষ, যারা তাকে একবার গান্ধীর আত্মীয় আর একবার পল গোগ্যাঁর নাতি মনে করে জুতো সমেত লাথি নিয়েও মাথায় তুলে নাচতে পারে—তাদের কাছ থেকেই বিপন্ন মানুষ হিসেবে একটা আধলারও অর্ধেক পেত কিনা সন্দেহ। অনন্ত জানে ও'র দেশের লোকেরাই এই প্রত্যাখানের অংশ-গ্রহণে হত সবার আগে অগ্রণী। ও'র সত্যি পরিচয় পেলে তারা ও'র মুখদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই সাত হাত তফাতে সরত সর্বপ্রথম। গণৎকার না হলেও একথা শুনে স্বচ্ছন্দে ও' সঠিক ভবিষ্যতবাণী করতে পারে নির্ভয়ে।

নাঃ, অনন্ত ঠিকই ভেবেছে, মানুষ নাম এদের দেওয়া চলে না, হয় গর্দভ নয় ভেড়া, এই নামই এদের উপযুক্ত। মানুষ-পূজো থেকে মূর্তি-পূজো এদের মজ্জাগত—মানুষ তো আছেই, এ ছাড়া একটা পেলে হয় কিছু, তা উইয়ের ঢিবিই হোক, গাছের গুঁড়ি কিংবা মাটির ডেলা যাই হোক না কেন। তা নইলে বুদ্ধদেবের অভাব ছিল কি কিছু দেশে? বেচারা বুদ্ধদেব প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিলেন—"শুনে স্থির করনা সত্যকে, বইয়ের বুলিতে বিশ্বাস করে ভুল করনা সত্য।

"সত্যকে গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না চোখে চোখে তাকে দেখতে পাচ্ছ।" যে লোকটা গোড়ায় এই রকম বুলি দিয়ে গোড়াপত্তন করেছিলেন, যে লোকটা তার জীবনে ভগবানকে স্বীকার অথবা অস্বীকারের উর্ধ্বে তুলে ধরে মূর্তি দূরের কথা, সকল কল্পনার মূলে মেরেছিলেন কুড়ুলের কোপ, ট্রাজেডি যে, তারই অগণিত মূর্তি সহস্র সহস্র নির্মিত হয়ে তারই শিষ্যদের দ্বারা তারই দেশে পূজো পেতে লাগলো আজতক্।

পুরোনো আমলের কথায় ইস্তফা মেরে আজকের রাসিয়ার কথাই ধরা যাক। সোভিয়েট ইউনিয়নের যিনি প্রধান স্থপতি সেই লেনিন যিনি চার্চকে চৌচির করে মানুষের মনকে তথাকথিত যীশুখ্রীষ্টের মূর্তিতলের অন্ধকূপ থেকে বন্দীমুক্ত করলেন বলে শোনা যায়, যিনি মানুষকে সংস্কার প্রথা আর প্রচলিত বিধি থেকে বি-শৃঙ্খল করলেন, যাঁরা ধর্মকে অহিফেনের মৌতাতের সঙ্গে তুলনা করে বিভ্রান্ত করলেন পুরাতন-পন্থীদের, এমনিধারা আরো আরো কত কিছু,—সেই রাসিয়ার মত জায়গায় আর কিনা লেনিনের মত মানুষেরই দেহ নয় মৃতদেহ নিয়ে, মূর্তিপূজোর অধম পূজোপদ্ধতির কি অদ্ভুত উৎসাহ শোনা যায়। মানুষের আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি কিছু হদিস পাওয়া যেত, তাহলে এই সব ব্যাপার অবলোকনে লেনিনের আত্মার অধুনা কি অবস্থা, তা' পর্যলোচনের হয় তো পাওয়া যেত একটা সুযোগ।

অনন্ত অনুভব করে—মানুষ যদিও মুক্ত, কিন্তু জন্মের পরই সে শৃঙ্খলিত। সে শৃঙ্খল সাম্যবাদেরই হোক অথবা সমাজতন্ত্রবাদেরই হোক। পূর্বে ছিল রাজতন্ত্রের স্বর্ণখচিত শৃঙ্খল, এখন নয় লৌহনির্মিত সাধারণতন্ত্রের নিগড়। রামরাজত্বই বল আর 'সাম'রাজত্বই বল—হরে দরে সেই হাঁটুজল। এক ধর্মের অন্তে যে নামেই হোক আর এক ধর্ম। এক গোষ্ঠীর পরিবর্তে আর এক বেশে আর এক গোষ্ঠির

প্রবেশ—একই গোঁড়ামি দাঁতের গোড়ায় চেপে চলে তারা সেই পূর্বতন সনাতনী প্রথায় অতি পুরাতন আগের মতই—নামকরণের কিংবা বেশভূষার হেরফের মাত্র।

পায়ের তলায় পুরানো পৃথিবী তেমনি ঠেকিয়া আছে।

নির্বোধ মানুষের কোনো আশাই অবশিষ্ট আছে বলে অনন্তর কাছে মনে হয় না। ভবিষ্যৎ ওদের ভূয়ো আর ভুষো কালির মতই অন্ধকার। এরা আজও সত্যিকার মানুষের মহত্ব মনন করায় অক্ষম—পোশাকের পূজোতেই প্রতারিত করে নিজেদের প্রতিনিয়ত। শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়ে তাদের মৃতদেহ নিয়ে মহোৎসব করে।

এদের কি হবে, কি হতে পারে? মহৎ জনের জীবিতকালে এ'রা তাঁদের আদর্শের সুমুখে বিন্ধ্যাচলের বাধা বহন করে বন্ধ সৃষ্টি করতে যেমন উৎসাহিত, মৃত্যুকালে সেই মৃত মনীষীর মেমেরিয়ল রচনায় তেমনি আবার এদের অদম্য উত্তেজনা।

এরাই সেই ইয়া বড় বড় ব্যাঙাচির মত গর্দভের গড়নে মুখাবয়ব সমেত মস্তিষ্কে ল্যাজ বিশিষ্ট মানুষের দল—যাদের চেহারাই তো অনন্তর চোখে এতক্ষণ ভেসে বেড়াচ্ছিল।

অনন্ত নিরাশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এমন সময় ডাক্তার বাক্কামের গার্জেনীর গর্জনে ও'র চমক ভাঙলো—ও' সচেতন হয়ে উঠল মালপত্তরের উদ্দেশে। বাস্তিবস্ত বাস্তব জগতের ছোটাছুটিতে উবে গেল সব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আপাততঃ ও' সুটকেশ দুটো নিয়ে পড়ল বেজায় বিপদে। তার ওপরে লেখা আছে অনন্ত গান্ধী—আর ও' এখানে পরিচিত আঁদ্রে গোগ্যাঁ, পল গোগ্যাঁর নাতি হিসাবে। এখন উপায়? এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল, ব্যাগের ওপর আঁঠা-লাগানো প্যারিসের হোটেলের

নাম লেখা লেবেলটা একটু খুলে এসেছে। চট করে উপস্থিতবুদ্ধি বিদ্যুতের মত ও'র মগজে ঝিলিক মেরে গেল। ও' তাড়াতাড়ি ক্যাবিন-বয়টাকে একটু আঠা সংগ্রহ করে আনতে হুকুম করে দুটো ব্যাগ থেকে দুটো আঠা-খুলে-আসা লেবেল উঠিয়ে ঠিক করে রাখল, তারপর ক্যাবিন-বয়টা আঠা নিয়ে এলে 'অনন্ত গান্ধী' নামটার উপর চেপে মেরে দিল সেই দুটো।

ও' নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল নিজের তৎপরতায়। উপস্থিতবুদ্ধি অনুযায়ী তাপ্পি মারতে ও' একটি ওস্তাদ বনেছে তাহলে সত্যিই!

তা হবে না?

নানা দেশে নানা অবস্থার ছাপ খেতে খেতে হোটেলের প্ল্যাকার্ড-জর্জরিত ও'র জীবনটা ট্র্যাভ্‌লিং সুটকেশের মতই দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

ও' এবার সত্যি সত্যিই নামল তাহলে বম্বের বুকে। পাসপোর্ট দেখানোর সময় ভাগ্যিস্ ও'র পিছনে সেই চেকোস্লোভাকিয়ান ট্যাপ্‌ ডান্সারটা ছিল! বাঙ্কামের দল পড়ে গেছল বহুৎ দূরে।

আরে ওকে? বালিগঞ্জের অনিলের মত দেখাচ্ছে যে, অনিলই তো! সর্বনাশ—অমন করে তাকাচ্ছে কেন আবার? এখুনি অলক বন্দ্যো বলে চিৎকার করলেই তো গেছি, কোথায় যাবে অনন্ত গান্ধী আর কোথায় বা আঁদ্রে গোর্গ্যা।

বাংলাদেশে আদিশূরের আমলে কান্যকুব্জ-আমদানি পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি যে ও'র পিতৃপুরুষ, অর্থাৎ, চতুর্দশ পুরুষের যে বনেদী বাঙালী! ধরা পড়লেই তো।···ও' চোখ শর্ষে ফুল দেখতে লাগল। কি মুস্কিল, বাঙ্কামের দলের সুজিতকে বম্বে থেকে রিসিভ করে নিতে এসেছে দেখছি। আরে অনিলের সঙ্গে ওর বোন শীলা, স্নেহলতাও

এসেছে যে—কত ছোট ছিল ফ্রকপরা দেখে গেছি, আর আজ শাড়ি পরে বর ধরায় পাড়ি মারতে চলেছে।

অনন্ত গাম্ভীর তথা আঁদ্রে গোর্গ্যার মাথায় বজ্রাঘাত। ও' তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে দূরের কাস্টামের লোকটার কাছে ও'র মালপত্তর খুলে দেখানো নিয়ে এমনভাবে নিজেকে মেতে উঠেছে প্রতিপন্ন করলে যে কিছুক্ষণের জন্য সকলকার রয়ে গেল আড়ালে।

এরপর ও' যখন বেরলো বাইরে তখন এক বাঙ্কাম ছাড়া দেখে আর সবাই যে যার পথ দেখেছে। আঃ বাঁচোয়া—ও' এবার সত্যিই অনুভব করল—চুরি বিদ্যের মত মিথ্যে কথা বলাও একটি বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা। নাঃ, বাঙ্কামের জন্যে এবার ও'র সত্যিই কি রকম একটা মমতা বোধ হল।

বাঙ্কাম দূর থেকে ও'কে আসতে দেখে আতিশয্যে চিৎকার করে উঠল ইংরেজিতে: "এই যে মঁসিয়ে গোর্গ্যা, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, আপনার জন্যে অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি যে।"

—ওঃ, আপনাদের কাস্টামে দেখছি, বেজায় কড়া পাহারা। কটা ফ্রেঞ্চ নভেল ছিল, ধরেছে—সেই জন্যেই মারপ্যাচের মারামারিতে হয়ে গেল এত রি।

বাঙ্কাম বললে: "আজ থেকে যে-ক'দিন ভারতবর্ষে থাকবেন, মনে রাখবেন আপনি আমার অতিথি।

তারপর ভারতবর্ষে অতিথির পদমর্যাদা সম্পর্কে ছোটখাট বক্তৃতার জাল বিস্তার করল। পুরাণে অতিথির মন-তুষ্টির জন্যে নিজের ছেলেকে কেমন করে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি—এই গল্পের অবতারণা করতে যাবে এমন সময় একটা ট্যাক্সি পেয়ে যেতে বক্তৃতাকে মাঝপথেই বান্‌চাল্ করে হোটেলের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ল গাড়িটাতে।

লাঞ্চের পর বাঙ্কাম শহরের শরীর সার্ভে করতে বেরিয়েছে তখন

হোটেল থেকে। হোটেলের ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে সমুদ্রের সামনে বারান্দাটার বুকে এলিয়ে দিয়েছে অনন্ত ও'র অবসন্ন শরীরটা। ভারতের উদাস মধ্যাহ্ন। অলস অবসরে ও'র চোখ দুটো অর্দ্ধেক বুজে এসেছে।

ও'র মনে পড়ল সেদিনকার কথা—যেদিন ও', দেশ ছেড়ে পাড়ি দেয় দীর্ঘ বারো বছর আগে, এক যুগ বলতে গেলে আর কি! তারপর এতদিন বাদে দেশে এসেছে। যতই হোক এ-মাটির স্পর্শে এক নতুন স্নিগ্ধতা, এর বাতাসে কি যেন এক নতুন ব্যাকুলতা। সবাই যেন এখানকার নতুন। এখানকার জীবনযাত্রা চলেছে কত আস্তে কত আরামে। ধাবমান টিউবের তড়িৎগতি নেই, ঘূর্ণায়মান এস্কেলেটরের অবিরাম ঘুরপাক নেই, লোকগুলো·কি সুন্দর, চপ্পল পায়ে ঢিলে কাপড়ে স্বচ্ছন্দে সাবলিল ভঙ্গিমায় ধীর পদক্ষেপে ভেসে চলার মত আসা যাওয়া করছে। এখানকার মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করল—সতিই বুঝি বা জীবন অনন্ত, সময় বুঝি বা অসীম। সময়ের পিছু পিছু ছোটবার মূর্খতা এরা করছে না—এদেরই পিছু পিছু সময় চলেছে যেন আর্দালির মত। আকাশ কি সুন্দর নীল—নয়ন-ভোলানো নীল, মন্থর মেঘ সাদা সাদা পালতোলা নৌকোর মত কোন নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে!

অনন্ত ভাবল, এতদিনের আবিলতা কত অজস্র অনিচ্ছাকৃত অনাচারে ধূলিধূসরিত বিশ্ব-বিতরাগী মনকে এবার ধুয়ে মুছে সত্যি সত্যি কাজে উঠে-পড়ে লাগবে। ও'র আদর্শ নিয়ে ডুবে যাবে ও' বাংলা দেশে গিয়ে। নিয়ে আসবে নতুন ভাবধারা। ও' নতুন সাহিত্য, নতুন শিল্প, আর নতুন মানুষের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছে তখন। মাঝখানে তখন একটা দিন খালি কলকাতার ট্রেনে উঠতে। তারপর ও' কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে শেষ করবে। এতদিন কত

লোকের মনে অনিচ্ছায় ও' কষ্ট দিয়েছে, কি মনে করেছে তারা—ভাবছে হয়তো কি নিষ্ঠুর, কি লম্পট, কি নিদারুণ মিথ্যাবাদী, কিন্তু ও'তো জানে প্রবঞ্চনা করতে বাধ্য হয়েছে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। একান্তরূপে প্রাণধারণের জন্যে এ প্রতারণা—এতে কি ও'র পাপ লাগবে ?

ও' যে কত পরদুঃখকাতর, কত সহজ সরল, কত কোমল ও'র মন, ওরা কি তা জানতে পারবে ? বেচারা জেন—ও' তো ইচ্ছে করে ও'কে না বলে চলে এসেছে, তা তো নয়—এমন অবস্থায় পড়ল যে না-বলে যাওয়া ছাড়া অনন্তর মত লোকের তখন উপায় ছিল কি কিছু ?

আহা বেচারা এদ্দা, হোটেলের পরিচারিকা হলে কি হবে ও'র হৃদয়ের তুলনা কী হয় ? ও'র কাছ থেকে অমনি করে ধাপ্পা মেরে অর্থ সংগ্রহ—অকুণ্ঠিত প্রতারণা! অসম্ভব; তার ওপর দেশে ও'র দুই বউ আছে বলে উপহাসময় কী নিষ্ঠুর উপসংহার—ভগবান কখনই এ সহ্য করবেন না। ওঃ, ও' কত নিচে নেমে গেছে, ও' পশুদের সৃষ্টির উৎকৃষ্ট জীব চিন্তা করতে করতে সত্যিই কি পশু চরিত্র অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে ? ও' নিশ্চিত মার্জনা মেগে চিঠি লিখবে এদ্দাকে, ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে ও'র পয়সা—অনন্তর হাতে প্রথম পয়সা আসা মাত্রই, তার সঙ্গে ও' বুঝিয়ে চিঠিও লিখবে, মার্জনা মেগেই চিঠি লিখবে।

ও'র মনটা হঠাৎ যেন আবার নিষ্ঠুর রাক্ষসলোক থেকে উদার দেবলোকের আওতায় পৌঁছে গেছে দেখছি।

অনন্তর মনের সত্যিরূপের পরিচয় পেলে দেখা যায় মানসিক দিকে ও' কত মহৎ, কত সকরুণ, সব সময় সকলকার জন্যেই। তবু মাঝে মাঝে ও' কি যে কাণ্ড করে বসে ও' নিজেই অনেক সময় তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না, হয়তো খেই কতকটা অবস্থাগতিকে,

কতকটা দুনিয়ার উপর ও'র ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে। কে জানে ?

বাস্কাম তখন ফিরে এসেছে শহরের এদিক সেদিক ঘুরে। বাস্কাম এলেই অনন্তর নিষ্পেষণ আরম্ভ হয় যন্ত্রণার জাঁতায়, কাঁহাতক ফরাসী ভাষার নকলে আর ইংরেজি কথাগুলোকে বিকৃত করে আলাপ চালানো যায় ? ও' মনে মনে মনকে সান্ত্বনা দেয় যে এ-যন্ত্রণা ক্ষান্ত হবে আর কটা দিন বাদেই তো—কোনক্রমে পৌছতে পারলে হয়। কলকাতায় পৌছে যেমন করে হোক সরে পড়তে হবে, তা নইলে স্বরূপ প্রকাশ পেলেই……

পরের দিন আঁদ্রে গোর্গ্যাকে বগলদাবা করে বাস্কাম উঠল কলকাতামুখী বম্বে মেলে। বাস্কাম তার আতিথেয়তায় বুঝি কর্ণকেও কোণঠেসা করবার মতলব। খাওয়া দাওয়া থেকে বিছানা জোগাড় অবধি কোন বিচ্যুতিই ও'র ঘটছে বলে মনে হলনা। আঁদ্রে গোর্গ্যা অর্থাৎ অনন্তকে ও' রেলের টিকিট ইস্তক কিনতে দিলনা। উঁচু ক্লাসের বাঙ্কে মায় বিছানা পত্তর ইস্তক বিছিয়ে দেওয়ার কাজ বাস্কাম নিজে হাতে সব করে দিয়েছে—আর অনন্ত বসে বসে বাস্কামের বাহাদুরির মত এই অতিথি-পরায়ণতা পরম আগ্রহে উপভোগ করে ধন্য করতে লাগলো বাস্কামকে, এমনি ও'র ভাবখানা।

ভারতবর্ষের সব কিছু অনন্তর কাছে এনেছে এক নতুন আস্বাদ —সবই যেন ও'র কাছে চূড়ান্ত চমৎকার মনে হতে লাগল। কৃষ্ণ নাগপুরী নাঙ্গা পর্বত থেকে কলকাতার কাছাকাছি মায় পানা-পুকুরগুলো ইস্তক অপরূপ শ্যামাঙ্গিনীর মত চোখের পাতায় ঝিলমিল করতে থাকে। এ যেন বহুদিন বাদে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে ও'র মনোভাবে এমনি একটা মাতলামির পাচ্ছিল প্রকাশ।

কলকাতার মিলের নোংরা বস্তিগুলো, রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলো, ছেলেবেলার অতিদূর অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে ও'কে বুঝিবা।

ঘাটশীলা-ওয়ালটেয়ারে যেতে আসতে কতবার এই পথে গেছে এসেছে। রেলের জানলা দিয়ে তাই তো ও'র উঁকি ঝুঁকি মারার সে কি মরসুম—জীবনে কখনো যেন কলকাতা দেখেনি, সত্য পাড়াগাঁ থেকে সবে শহরে পা বাড়িয়েছে আজ।

অনন্তর এমনিতর উদ্দাম ঔৎসুক্য নজর করে বাঙ্কাম ও'র সাফল্যের অহঙ্কারে যেন আটখানা হয়ে উঠেছে। বাঙ্কাম বলে: "কেমন মঁসিয়ে গোগ্যাঁ, বলেছিলাম কিনা, বাংলাদেশের শোভা, সারা দুনিয়াটায় আর জুটি খুঁজে পাবেন কিনা সন্দেহ।"

অনন্ত গম্ভীর হয়ে প্রতিবাদ করে: "ডক্টর মুখার্জি, আপনি তাহিতি যাননি। তাহিতির অবয়বের সঙ্গে আপনাদের এই বাংলা দেশের অদ্ভুত আদল; সেই হিসেবে, আমার স্বদেশের শোভাও দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যায় না বলে আপনার ভাষা উদ্ধৃত করে আমার দেশের দাবি জানাতে পারি বোধ হয়।"

বাঙ্কাম এর উত্তরে বলে, "বাংলাদেশের উর্বর মাটির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কেরও যে উর্বরতা—এ যে আর অন্য কোথাও নেই। আমাদের এই দেশের যত মনীষী তাঁরা মনন-শক্তি পেয়েছেন সব এই বাংলার মাটি থেকে, তা সে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, আর সি, ভি, রমন কিংবা রাধাকৃষ্ণন্, সে তিনি যেই হোননা কেন। সি ভি রমন আর রাধাকৃষ্ণন্ মাদ্রাজী হলে কি হবে, গোড়াপত্তন আশুতোষের তৈরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়, নৃত্যে উদয়শঙ্কর, মায় সঙ্গীতে দিলীপ রায় তক্—পায়ওনিয়ারের কাজ যা কিছু করেছে সবই এই বাংলা দেশ। এমন কি কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তি পর্যন্ত।"

এর উত্তরে অনন্ত আর একটু হলেই বলতে যাচ্ছিল—'ইংরেজদের ভারতবর্ষে আমদানি এও তো বাংলাদেশের পায়ওনিয়ারিতেই সম্ভব হয়েছে। তারপর ব্রিটিশ শাসনের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভারতবর্ষের প্রথম আই-সি-এস আর ব্যারিস্টার সেটাই বা বাদ যায় কেন? কিন্তু জিবটাকে জড়িয়ে ও' চেপে রাখল মুখের মধ্যেই জোরসে, এক সুতোও নড়াচড়া করতে দিলনা—পাছে কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে পড়ে।

বাঙ্কাম তখনো বকে চলেছে—যে, সারা ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, কলা আর কৃষ্টির, সবই নবজন্ম গ্রহণ করেছে—জানবেন এই বাংলা প্রদেশটার প্রসাদ গুণে। তা নইলে, বম্বেতে ও আমেদাবাদে কত বড় বড় মিল মাথা চাড়া মেরেছে—অর্থবলে ও'রা হতে পারে আমাদের প্রদেশের তুলনায় অনেক উঁচুতে, কিন্তু শুনবেন কাপড়ের মিল থেকে যে শাড়ি বেরোচ্ছে তার পাড়টির ডিজাইন নিশ্চিত বাঙালী আর্টিস্টের। টাটানগরের বিরাট কারখানা সারা এসিয়ায় যার জুড়ি নেই, যাতে জন্ম দিয়েছে বম্বের অনেক কোটিপতিকে, কত প্রদেশের কত লোক প্রতিপালিত হচ্ছে সেখানে, জানবেন আবিষ্কারটি কিন্তু বাঙালীর। তারপর সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি? তাতেও বম্বে চলছে সবার আগে, কিন্তু আচারের মত চাকনা মারার উপযুক্ত আর্টি গুলো সবই আমাদের বাঙালী। অ-বাঙালী থাকলেও তা আমাদের নিউ থিয়েটার্সের আওতায় গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা।

…কি জানেন আঁদ্রে গোর্গ্যা, টাকা পয়সার রোয়াবে এইদেশে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশে মাড়োয়ারীরা লক্ষ্মীকে যেন রক্ষিতা রেখেছে, শুধু তাই নয়, তারা তাঁর লাজবস্ত্র ছিনিয়ে করেছে তাঁকে বিবস্ত্রা, তারপর তাদের সেই উৎকট উৎসব-রজনীর উন্মত্ততার অবসানে শেয়ার-মার্কেটের

চৌমাথায় ছেড়ে দিয়ে কাপুরুষ দুর্বৃত্তের মতই মারে চম্পট। সেখানে আমরা, বাঙালীরা, পরিয়েছি তাঁকে শুচীশুভ্র শাড়ি, শুধু তাই নয়, রুচির সিন্দুর-বিন্দু সিঁথিতে দিয়ে বরণ করেছি তাঁকে বধূরূপে অনুরাগের আলপনা অঙ্কিত অন্তরের নিভৃত আঙিনায়—তাইতো আমাদের কাছে তিনি ধরা দিয়েছেন কলালক্ষ্মীরূপে। জানবেন, বাঙালীদের ওপর এত রাগ, আক্রোশ, আর হিংসা, আজ তার একমাত্র কারণ—পয়সার প্রাবল্যে অন্য প্রদেশ যতই-তড়পে বেড়াক, অর্থের-প্রতি উদাসীন ব্রাহ্মণের মত বাঙালী, একমাত্র কৃষ্টির তেজে সকলের সকল দর্প চূর্ণ করে আজও চলেছে এগিয়ে।

অনন্ত ঝঙ্কামের কথায় মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল—কেন বাঙালী-বিদ্বেষ, কেন বাঙালীরা অন্য প্রদেশের লোকের কাছে দু-চোখের বিষ। বারো বছর আগে দেখে গেছল, আসামে 'বঙাল খেদা' আন্দোলন—ও' আজ তার সঠিক কারণ ধরতে পারল। ও' আর একটু হলেই বলতে যাচ্ছিল, কেন মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, বিজয়লক্ষ্মী, চুগ্‌তাই, ইকবাল, সেরগিল—অজস্র অবাঙালী ভারতের গৌরব মুকুটে নানা মানিক্যের মতই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বাঙালীদের এই অকারণ অহমিকাই ওদের এত অপ্রিয় করে তুলেছে অনেকের কাছে। উড়িষ্যার লোকেরা বাঙালীদের পাল্লায় হয়েছে 'উড়ে মেড়া' মাড়োয়ারী, 'মেড়ো ব্যবসাদার'। হিন্দুস্থানীরা, 'খোট্টা ডাল রুটি চোট্টা'। পাঞ্জাবীরা, ও'তো ট্যাক্সিওলা। এই সব উপেক্ষাময় মূর্খ উক্তিই আজ বাঙালীদের সর্বনাশের সূত্রপাত করেছে। শুধু তাই নয়, ও'দের অধোমুখী করেছে। ঝঙ্কামের মত একজন শিক্ষিত লোক এতদিন বিদেশে থেকেও কি করে এত ছোট প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে ও'র মাথায় তা কিছুতেই ঢুকতে চায় না। ও' কলকাতায় ফিরে গিয়ে যেমন করে হোক বাঙালীর প্রাদেশিকতাপনা ঘোচাবেই ঘোচাবে।

ও' সত্যিই যদি একজন বিদেশী হত—আপাততঃ বিদেশী বলেই তো ও' পরিচিত—উপরন্তু এমনিধারা প্রাদেশিকতা প্রচার একজন বিদেশীর কাছে বাঙ্কামের নিছক নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আর বিশেষ করে একজন বিদেশীর কাছে এদেশের খুঁটিনাটি প্রশংসা ও নিন্দা যে একদম একঘেয়ে লাগবে অনেক আগেই এ মাত্রাজ্ঞানের প্রতি হুঁস হওয়া উচিত ছিল বোধ হয় বাঙ্কামের।

"ব্যোম্ কালী কলকাত্তেয়ালী !"

অনন্তর মনটা কচি খোকার মতই খুশিতে চিৎকার করে উঠতে চায়, ছোটবেলায় বিদেশ থেকে বেড়িয়ে কলকাতা ফেরার সময় ঠিক যেমন করে চেঁচাতো, একেবারে ঠিক তেমনিতরই।

রেলগাড়ির এগিয়ে আসা অঙ্গখানি তখন কলকাতার শরীরে প্রবেশান্তে স্তম্ভন বিদ্যায় যেন স্তম্ভিত রাখল নিজেকে! হাওড়া স্টেসন! অনন্ত আনন্দে বুঝি উদ্বেল হয়ে উঠেছ—নিজের দেশের সহস্র খুঁত থাকতে পারে, কিন্তু তুলনা তার থাকতে পারে কি কোথাও? রামচন্দ্রের চতুর্দশ বৎসর বনবাসের মতই বলতে গেলে এক রকম ও' দেশান্তরে। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য নয়, নিজের ইচ্ছেতেই ও'র এ অবস্থা। এতদিন বাদে সেই দেশে, আবার নিজের ইচ্ছেতেই ফিরে এসেছে। কিন্তু কি মুস্কিল, এতদিন বাদে মাতৃভাষার মারফৎ মনের উপচে-ওঠা যেসব উচ্ছ্বাসগুলো উদগ্রীব আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় উন্মাদ: তাকে প্রতিমুহূর্তে কিনা অনিচ্ছায় অবগুণ্ঠিত করতে বাধ্য হচ্ছে অন্য ভাষায়। ও' যে এখনো পল গোগ্যাঁর নাতি আঁদ্রে গোগ্যাঁ, সেইজন্যেই তো ইংরেজি ভাষাকে ফরাসীর ছন্দে প্রকাশ করার এই দুরন্ত দুর্ভোগ। তাই নিপুণ অভিনেতার মত ও' যেন সত্যিই নতুন দেশে এসেছে, এই প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রতিমুহূর্তে উৎসাহিত আর বিস্মিত সচকিত ভঙ্গিমায়...

আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যে বাস্তবিকই ও' এক অজানা অপূর্ব দেশে হাজির হয়েছে বুঝি বা—কি করবে নিরুপায় ! নিরুপায় !

বঙ্কিমের ভাই এসেছে বঙ্কিমকে অভ্যর্থনা জানাতে—তিনি বয়সে বড় হলে কি হবে, বঙ্কিম আজ কেউকেটা নয়, আজ ও' বিলেত-ফেরতা একটা ডাক্তার, একটা কেষ্ট-বিষ্টু বিশেষ !

বঙ্কিমের এই দাদা বিলিতি মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু—সঙ্গে জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন পাড়া-পড়শীর অনেককে, ভাই আসছে বিলেত থেকে পাশ করে, পাড়ার পদমর্যাদা বাড়াবার সুযোগ সহজে কি ছাড়া যায় ? এ ছাড়া বঙ্কিমের বন্ধুবান্ধবও কম আসেনি। এদিকে বঙ্কিম অনন্তকে নিয়েই অস্থির ! অনন্তর জন্যে বঙ্কিম আদতে অহঙ্কারে আটখানা হয়ে উঠেছে অন্তরে। আঁদ্রে গোগ্যাঁকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ও' ব্যতিব্যস্ত ; ও' আঁদ্রে গোগ্যাঁর যে পরিচয় সকলের সামনে দিল, তার সর্টহ্যাণ্ড নিলে গোগ্যাঁর বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হিসেবে দিব্যি চলে যেতো সেটা। কিন্তু বঙ্কিমকে এখানে অভ্যর্থনা করতে যারা এসেছিল তারা ও'র এই অদ্ভুত একটা লোক পাকড়াও করে অর্থাৎ কিনা আঁদ্রে গোগ্যাঁকে নিয়ে এই রকম উচ্ছ্বাসময় পরিচয়ে আর বক্তৃতার মৌসুমীতে কেউ কেউ মুখে না বললেও মনে মনে হাসতে শুরু করেছে। কেউ বা অবাক হয়ে থমকে রইল, কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিলে পড়ল বঙ্কিমের দাদা। এই রকম একটা অদ্ভুত কার্যকলাপে ও'র দাদার প্রতিকুল মনোভাব সত্যিই মনন করার মত হয়ে উঠেছিল।

এতদিন বাদে ভাই এল, সঙ্গে নিয়ে এল কোথাকার কে এক

লেজুড় আঁদ্রে গোগ্যাঁ! নামও বলিহারি! বাড়িতে নিয়ে যে বঙ্কিম চলেছে এখন ও'কে রাখবে কোথায়? বাঙালী বাড়ি—বঙ্কিমটার বুদ্ধি বিলেত ঘুরে এলেও ছিটেফোঁটাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সন্দেহ হয়।

বঙ্কিম পৌঁচেছে বাড়িতে। মধ্যবিত্ত সংসার, একটা মাত্র শোবার ঘর যেখানে থাকলে পরম সৌভাগ্য মনে করে বরাতকে ধন্যবাদ দিতে হয় বারবার। সেই রকম একটা মধ্যবিত্ত সংসার—ছেঁড়া সতরঞ্চিপাতা তক্তপোষ, আর কটা ময়লা তাকিয়া যেখানে বোটোকখানা কিনা ড্রয়িংরুমের একমাত্র আসবাব! সেই বোটকখানা কিম্বা বাইরের ঘর কিম্বা ড্রয়িংরুম যাই নামকরণ হোক তারই মধ্যে তক্তপোষ হটিয়ে ছোট দুটো ক্যাম্প-খাটে ও'দের বিছানার সরঞ্জাম করে বিলেত-ফেরতা হিসেবে বঙ্কিমকে শোবার-কাম্-বসবার ঘরের এই রকম একটা বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায়, তার প্রতি যেন একটা বিরাট সম্মানের ব্যবস্থা করা হল। বঙ্কিমের মাননীয় অতিথিও সেই এক ঘরেই থরস্থ হলেন।

দেশে পদার্পণের পর প্রথম সকালটাই বঙ্কিমের গেল কিন্তু বেজায় বোদা মেরে। দু'বছরের প্রতিদিনের অভ্যাস মত শুয়োরের মাংস নেই সকাল বেলার জল-খাবারের সঙ্গে, কমলা লেবুর জ্যাম? তা'ও নেই, এমন কি রুটি মাখনও না। ও'র মেজাজ বেজায় চড়ে উঠেছে। মোহনভোগ লুচি আর চা-সমেত কলাইকরা পেয়ালাটার চটা-ওঠা চেহারা পরিদর্শনে ও'র মাথা থেকে পা অবধি আঁদ্রে গোগ্যাঁর সামনে

লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগল—কোথায় বা টি-পট আর ট্রে। উড়িষ্যার আমদানি কেষ্টা চাকর চা আর জলখাবার ও'দের দু'জনের জন্যে রেখে চলে যেতে বঙ্কিম রাগে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর ভিতরে গিয়ে বৌদিকে বললে, "এইসব স্বদেশী খাবার ও'র হঠাৎ সহ্য হবে না। তা'ছাড়া চায়ের বাটিগুলো কি চায়ের বাটি না থুতু ফেলবার পিক্‌দান্?" বঙ্কিমের এতদিনকার আস্তে-আস্তে-হজম-করা ও-দেশী কৃষ্টি বিশেষ রকম বিষম খেয়েছে দেশে পৌঁছেই। আর কিনা তার নিজের বাড়িতেই! কোথায় বিলেত থেকে ফিরে চায়ের বাটির প্রশংসায় আটখানা হয়ে উঠবে, বলবে, চা কেন, যে কোন আহার অথবা পানীয়, খাওয়া অথবা পান করার চেয়ে তার সাজ-সরঞ্জাম ও'র বেজায় হৃদয়-হরণ করে। কোথায় ভেবেছিল, শান্তিনিকেতনের কলাভবনে একটা নিমন্ত্রণ জোগাড় করে কাটলারি আর ক্রকারি সম্পর্কে একটা গোছানো বক্তৃতা মারবে—নাঃ, ওর সব আশা অঙ্কুরেই ধূলিসাৎ। এ বিধাতার মার ছাড়া আর কি! ও' যত শীঘ্র একটা ফ্ল্যাট খুঁজে উঠে যেতে পারলে এখন বাঁচে—ও' ভগবানের কাছে সত্যিসত্যিই এ বিষয় প্রার্থনা করতে লাগল। ও' বৌদিকে উদ্দেশ্য করে বললে, "কাল থেকে আমরা বাইরেই খাব বৌদি, কিন্তু তার আগে এখন চলোতো আমার বন্ধুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় পাতিয়ে দিই। তুমি একটু পরিষ্কার হয়ে তৈরি হয়ে নাও।"

কাদম্বিনী দেবী তথা বঙ্কিমের বৌদির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—কি বলে, ঠাকুরপোর কি মাথার গোলমাল হল না কী! কি কুক্ষণেই বিলেত পাঠানো হয়েছিল, জাত ধর্ম তো গেলই, তার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিশুদ্ধিও কী?...বলিহারি বুদ্ধি বটে কর্তার, ভাইকে সাহেব করে আনা হয়েছে—শুধু শুধু মাথার-ঘাম-পায়ে ফেলা রোজগার করা

টাকাগুলোয় মানুষের বদলে ভাইটাকে মর্কট বানিয়ে আনল। বলো কিনা, চল ঐ কেলে পোড়ারমুখো সাহেবটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—বুদ্ধিশুদ্ধি বিলকুল লোপ পেয়েছে।

ওদিকে বঙ্কিম বলছে, "বৌদি, তুমি যে হোস্টেস্, বাড়ির গেস্টের সঙ্গে তোমার পরিচয় না করে দিলে হবে একান্ত অভদ্রতা। চল চল তাড়াতাড়ি, দেরি কর না মিছিমিছি।"

যাই হোক, রাশভারি বৌদি বলির-পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে বঙ্কিমের পাল্লায় ঘরে এসে ঢুকল। তারপর কিন্তু তার মন্দ লাগল না। আর যাই হোক, ম্লেচ্ছ হলেও কেলে সাহেবটা ভদ্রলোক বলেই মনে হল। ভাঙা হিন্দিতে বৌদি তখন বঙ্কিমের সাহায্যে অল্পসল্প কথাবার্তাও বলে ফেললেন ও'র সঙ্গে। বঙ্কিম বৌদির হয়ে ও'দের দিশী বাজে ব্রেকফাস্টের অর্থাৎ সকালের জলখাবারের জন্যে মার্জনা চাইতে গিয়ে দেখল আঁদ্রে গোগ্যাঁর পাতে 'পিপীলিকা কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়'। আঁদ্রে গোগ্যাঁ বললে, "ও'র এই ব্রেকফাস্ট বড় চমৎকার লেগেছে, ও'কে যেন এইরকম রোজ খেতে দেওয়া হয় যে ক'দিন এখানে আছে।" আদতে অনভ্যর অনেকদিন বাদে মোহনভোগ লুচি আলুর তরকারি বড়ই উপাদেয় লেগেছিল। বঙ্কিম আঁদ্রে গোগ্যাঁর এই দেশী-ব্রেকফাস্টের এমনি বাস্তব প্রশংসায় বেজায় দমে গেল—আর বিশেষ করে বৌদির সামনে।

যাই হোক আঁদ্রে গোগ্যাঁ এবার একলা একটু এদিক সেদিক ঘুরে দেখবার জন্যে বঙ্কিমের কাছে অনুমতি চাইতেই বঙ্কিম ও'কে কলকাতার রাস্তাঘাট সম্পর্কে একটা ইয়াবড় উপদেশের বাহুবন্ধনে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে পিষে মারবার মতলব করতে লাগল। ট্রামের একটা চার্ট, কলকাতার গলিঘুঁজির একটা বর্ণনা, সব কিছুই মোটমাট

ছুঁয়ে যেতে ভুল করল না, এমন কি বড়বাজারের গুণ্ডার গল্প আর পাথুরেঘাটার পকেটমারের সম্পর্কে সাবধান করে দিতেও কসুর হল না ও'র।

এদিকে অনন্তর সারাটা স্বভাব শিশুর মতই মাতৃভাষার মাই চুষতে লোলুপ, ঠোঁট কামড়ে ককিয়ে উঠতে চাইছে তখন, ফরাসী চালে ইংরেজি দুমড়ে কথা বলার দাপটে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে ও'র জিভ, আর পেরে উঠছেনা ও'; কিন্তু কি করবে, কোথায় যায়? সাহারার মত সারা পকেটময় শুধু ধু-ধু শূন্যতা। তবু ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় ও' হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই হেঁটেই বেরোবে স্থির করেছে।

ডাক্তার বঙ্কিমকে ডেকে বললে, "ও'র জন্যে বাড়িতে খাবার আজ যেন না রাখা হয়, ও' বাইরেই আহার সমাধা করেই ফিরবে"; কিন্তু নেহাতই মিথ্যে কথা সেটা, পয়সা কোথায় যে লাঞ্চ কিংবা ডিনার খাবে বাইরে?

লেক্-পাড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে পার হয়ে এসেছে ও' এসপ্লানেডের মোড়, তারপর ওয়েলিংটন, বৌবাজার, এমন কি কলেজ স্ট্রীটের মোড়ও পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

পৌঁছে গেছে হেদোর ধার।

অকারণ নিরুদ্দেশ ও' শুধু হেঁটেই চলেছে, কোথায় যাবে কেন হাঁটছে কিছুই জানে না ও', তবু এগোচ্ছে যেন নেশার ঘোরে। ভুলে গেছে ও' খিদের কথা, বিস্মৃত হয়েছে তৃষ্ণা। দ্বিপ্রহর গড়িয়ে পড়েছে

তখন অপরাহ্নের অলিন্দায়। ও'র কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই, চলেছে তো চলেছেই···

প্রশান্ত সিংহ রোজকার মত আজকেও সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছে একটু বৈকালিক বেড়ানোর তালে। এমন সময় লাগল ধাক্কা, আর একেবারে কিনা সাম্‌নাসাম্‌নি। অনন্তর লক্ষ্য ছিল ফুটপাত আর পায়ের বুটটার পানে, হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছিল ও'।

"চোখ চেয়ে চলছেন্ না বুঝি" চেঁচিয়ে উঠতে যাবে আর কি, হঠাৎ এমন সময় ও'রা আঁতকে উঠল—আঁতকে উঠল অকস্মাৎ—ভয়ে নয়, অসীম আশ্চর্যে!

এ যে অলক বন্দ্যো! অসম্ভব অথচ নিশ্চিত। অঘটন ঘটনের চেয়েও অভাবনীয় এ ঘটনা। প্রশান্ত আনন্দে জড়িয়ে পৌষ্ভীম চূর্ণ করতে চায় অনন্তকে। তারপর দূরে সরে আর্টিস্ট যেমন দূর থেকে তার ছবিকে দেখে তেমনি কায়দায় দূরে সরে এসে প্রশান্ত অনন্তকে দেখতে লাগল—নাঃ, সত্যিই অলক, অলক ছাড়া এ আর কেউ নয়, তবে অনেক রোগা আর অনেক ফর্সা হয়েছে চেহারাটা ও'র।

প্রশান্তর নামের মাফিক হৃদয়টার পরিধিও যেন ওর প্রশান্ত মহাসাগর—প্রসারিত, প্রকাণ্ড। অনন্তকে আলিঙ্গনে আটকে প্রশান্ত বলে, "কবে এলে ভাই? খবর দাওনি কেন?" অনন্ত ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে বলে, "চুপ চুপ আমি অলক নই, পল গোর্গ্যার নাতি। আঁদ্রে গোর্গ্যা আমার নাম আপাতত।"

"হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ," প্রশান্ত আর ও'র বন্ধু হাসি চাপতে পারল না ও'র রকম দেখে—মহা ভারিক্কে আর অতি গম্ভীর ও'র সে

ভাবখানা, সুপার্ব! অলক বন্দ্যো তাহলে এত বছর বিলেতে থেকেও এক বিন্দুও বদলায়নি।

—যাই হোক, সত্যি কবে এসেছ?

—এই তো সবে কালকে ছুঁয়েছি তোমাদের কলকাতার কালামাটি।

—কিন্তু এখন চলেছিলে কোথায়? চল······

—চলেছিলুম ঠিক তোমার উদ্দেশ্যে না হলেও তোমারই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ভাঁড়ারে ট্রামভাড়ারও পুঁজি নেই, তাই চলেছিলুম পায়দলে কলকাতার সঙ্গে পুরোনো আলাপ আবার ঝালিয়ে তোলার মতলবে। এমন এক মুহূর্তে লাগল দুই গ্রহের ধাক্কা—অবিশ্যি একজন মঙ্গল এবং আর একজন শনি। বুঝলুম সবই আল্লার ইচ্ছা—'যব খোদা দেতা তব ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা'। তোমার দেখা পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল, দু'শো টাকা অবিলম্বে আবশ্যক।

—কী ব্যাপার, কী সে··· নাঃ, একেবারে সেই আছ।

—আর বলো কেন, নসীব নেহাতই নসীব, ইংরেজি ভাষাকে ফরাসী জাঁতায় চেপ্টে উচ্চারণ বের করতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল—এখন ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। কি কুক্ষণে পল গোগ্যাঁর নাতি আর তাহিতি দ্বীপ থেকে আমদানি নিজেকে প্রমাণ করতে গেছলুম! তখন কী জানতুম ছাই, মিথ্যের দায়িত্ব সত্যিকথার সহস্র গুণ বেশি।

—সে আবার কী?

—জাহাজে ওঠার পর থেকে পল গোগ্যাঁর নাতি আঁদ্রে গোগ্যাঁ, যিনি তাহিতি আইল্যাণ্ডের একজন জার্নালিস্ট—এই পরিচয়ে এই অবধি তো এসে পৌঁচেছি। এক সদ্য পাস-করা দাতাকর্ণ দাঁতের ডাক্তারের দাক্ষিণ্যের লগি মেরে দেহখানিকে কোনক্রমে কলকাতার কূলে এনে ভিড়িয়েছি। অবিশ্যি আমায় তিনি তাঁর নিজের উৎসাহেই এনেছেন

এখানে, শুধু তাই নয়, বাঙালী হিন্দু বাড়িতে আমার মত একটা ম্লেচ্ছকে তাঁর দাদার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবরদস্তি জায়গাও দিয়েছেন অতিথিরূপে।

—কি নাম, নাম কি বলতো দাঁতের ডাক্তারটির?

—ডাক্তার বঙ্কিম মুখার্জি।

—তুমি কী তবে কন্তেভার্দে ইতালিয়ান বোটে এসেছ?

—হ্যাঁ!

—এতেই তো আমার শ্বশুরমশাইও ফিরেছেন।

—তুমি আবার বিয়ে করলে কবে?

—বাঃ, কবে? 'একপাল পুত্র-কন্যা, সে যেন এক বিপুল বন্যা।' আর তুমি কিনা জিজ্ঞেস করছ কবে বিয়ে করলুম?

—যাই হোক, বাজে বকা রেখে এখন কাজের কথা কই। প্রশান্ত! তোমার কাছ থেকে কিছু জোটাতে পারলে—ভদ্রভাষায় যাকে অপরিশোধনীয় একটা ধার বলে—তাই পেলে, উঠে যেতে চাই একটা মেসে।

—তুমি আমার ওখানে উঠে এস না।

—ওসব বন্ধুর বাড়িটাড়িতে থাকাটাকা বেশীদিন আমার সম্ভব হয় না, এ ছাড়া বাপ্‌স্ রে তোমার শ্বশুর আমায় কী চেনান চেনে—আন্রে গোর্গা! বলে বঙ্কিম ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে কী খাতির না করেছে—দয়া করে উৎসাহের আতিশয্যে বাড়ি ফিরেই টেলিফোনে তোমার শ্বশুরকে আর আমার আদৎ পরিচয়টা জানিও না। আর মনে রেখো, তা হলে আমার সমূহ বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। এখনো ডাক্তার বঙ্কিমের সঙ্গে খিদিরপুরের খালাসীদের দর্শনে যাওয়া হয় নি, কালীমন্দির কিংবা পরেশনাথ কিছুই দেখা হয় নি। এগুলো দেখতে যাবার ফাঁকে একটা মেস ঠিক করে উঠে যাবার মৎলবে আছি।

প্রশান্ত বললে, চল তাহলে বাড়ি, রাত্তিরে খেয়েদেয়ে ছাড়ান পাবে। কিন্তু গিন্নীর সঙ্গে তোমার আলাপও হয় নি তো, চল তোমায় দেখলে খুব খুশিই হবে। তোমার সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কত আজগুবি গল্প তাকে শুনিয়েছি, এবার আদত চিজটির চাক্ষুস পরিচয় পাবে এখন। আচ্ছা অলক, তুমি চবিটা শরীর থেকে সরালে কি করে, বিলেত যাবার আগে তো তুমি আমার মতই ছিলে প্রায়। রংটাও তোমার ফরসা হয়েছে অনেক—

—আর ভাই রং নিয়ে কি হবে, যৌবন কি আর আছে?

—আচ্ছা, বঙ্কিম ডাক্তারের সঙ্গে খিদিরপুরে যাবে কি করতে? কালীমন্দির কি বেলুড়মঠ গেলে না হয় একটা মানে হয়, খিদিরপুরে কি আছে দেখবার তা তো বুঝলাম না। তুমি আমার ওখানে উঠে এস।

—দুর্ভোগের কথা আর বল কেন? সালস্‌বুর্গ থেকে এই তোমার সঙ্গে মোলাকাত অবধি কপর্দকহীন। একমাত্র উইট্‌স্‌ তথা উপস্থিত-বুদ্ধির উপর চালিয়ে এসেছি।

—তা তুমি পয়সা-কড়ি একদম না নিয়েই ফিরছিলে না কী?

—সে আর বলনা, যা টাকাকড়ি ছিল, সব কোথায় উবে গেল কপ্পুরের মত—প্রেম!

—প্রেমের সঙ্গে পয়সার কী যোগাযোগ? তোমার কথা কওয়ার পুরোনো কায়দা বারো বছর বিলেত থেকেও বদলালো না দেখছি।

—তুমি কি বুঝবে প্রশান্ত, বিয়ে করে বসে আছ—প্রেমে তো

পড়নি, কি করে বুঝবে প্রেমের সঙ্গে পয়সার কী যোগাযোগ। প্রেম মানেই পয়সা, পয়সা মানেই প্রেম। টাকার একদিকে যেমন মূর্তি আঁকা থাকে রাজার কিংবা রানীর আর তার উল্টো পিঠে লেখা থাকে তার মূল্য, ঠিক তেমনি প্রেমের উল্টো পিঠে উল্লেখ হয়ে থাকে তার উচিত মূল্যের।

—কিন্তু তার সঙ্গে খিদিরপুর-ডক্ কী সূত্রে বাঁধা পড়ল? তোমার সবই কী একটা হেঁয়ালি।

—আমি লোকটা তো কোন ছার—ভগবানের সারা সৃষ্টিটাই তো হেঁয়ালিময়, তার মধ্যে দেখতে গেলে তুমি আমি সবাই কমবেশি হেঁয়ালিময় নই কী? মায় প্রকৃতির মধ্যে এই হেঁয়ালি কি কিছু কমতি আছে? একজায়গায় উঠেছে মাটি ফুঁড়ে পাহাড়, তাকেই তৎক্ষণাৎ আবার জমীনের সমতলতা কি বিষম বিরুদ্ধতাই না করেছে। একজায়গায় শস্যশ্যামলা ক্ষেত আর একজায়গায় মরুভূমি। এক জায়গায় জল, তাকে আবার অবিলম্বে বাধা দিচ্ছে মাটি। দার্শনিক দৃষ্টি ছেড়ে, এই দেখ না, তুমি একটা সওদাগর-পুত্তুর হয়ে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' হিসেবে বারো বছর ধরে এক নাগাড়ে ছাপাখানার বিরাট কারবার করে অর্থকে অক্টোপাসের মতই সহস্র বাহুতে বন্দী করে অহরহ শুষছ, তবু আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার সবরকম অনর্থের প্রতি কি অসম্ভব আস্থা! তোমার—অদ্ভুত নয়?

—তোমাকে কি সাধে ছোটবেলায় বক্তিয়ার খিল্‌জি খেতাব দেওয়া হয়েছিল? দার্শনিক দাঁও মেরে বক্তৃতা তুমি ভালোই দিতে পার না হয়; কিন্তু কলকাতা শহরের খিদিরপুর-ডক্‌কে কিছুতেই তো বলে এক মহা দর্শনীয় বস্তু তুমি প্রমাণ করতে পারবে বলে মনে হয় না, আমার কাছেও না।

—ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি,' জাহাজে যখন উঠলুম ভেনিস থেকে,

পকেটে একেবারে তখন একটি পয়সার পাত্তা নেই, একটা লেমন-স্কোয়াস খাব তাও সম্ভব নয়। এই সময় ডাক্তার বাক্কামের সঙ্গে পরিচয় ঘটে জাহাজে আকস্মিক। আমার নাম জিজ্ঞেস করতে, আমি বললুম, আমি তাহিতির লোক—পল গোগ্যাঁর ও-দেশী স্ত্রীর ছেলে হচ্ছেন আমার পিতা। শুধু তাই নয়, কথার ফাঁকে এক জায়গায় আরো ঔৎসুক্য বাড়াতে এবং মঙ্গোলিয়ান-মার্কা হলেও পাছে ধরা পড়ে চেহারায় সেই ভয়ে বললুম আমার মার মাতামহীর শরীরে আছে ভারতীয় নাবিকের শোণিত। তাই ভারতবর্ষ একবার প্রদক্ষিণ করে বর্মা মালয় হয়ে তাহিতি ফিরবো। পল গোগ্যাঁর নাতি শুনে ডাক্তার মুখার্জি আমায় তার রাজসিক আতিথেয়তায় ভাসিয়ে এনেছেন এখানে, শুধু তাই নয় খিদিরপুরে এই ভারতীয় নাবিক অর্থাৎ আমার মার মাতামহীর শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা না করিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি।

—এত লোক থাকতে হঠাৎ পল গোগ্যাঁর কথা মনে এল কি করে ?

—সে আর বল কেন ? প্যারিসে থাকবার সময় মমের 'দি মুন এণ্ড সিক্স পেন্স' পড়েছিলুম, তারপর নিজের চেহারাটাতেও বেশ একটা মঙ্গোলিয়ান ছাট আছে—তার ফলেই হঠাৎ মাথায় এল অদ্ভুত এই ব্রেন-ওয়েভ্! মনে আছে, স্কুলে প্রায় আমায় নেপালী অথবা আসামী মনে করত চেহারা দেখে ?

—অলক, আমরা সবাই ভেবেছিলুম তুমি বিলেতে যখন এতদিন রয়ে গেলে তখন এবারে একটা বড় চাকরি-বাকরি নিয়ে মেম সঙ্গে ফিরবে—কিন্তু যা গেছিলে তাই ফিরে এলে, যে একা সেই একাই। রবীন্দ্রনাথের বলাকা তোমার জীবনে যেন পাখা ঝাপ্‌টে ঘোষণা করছে—'হেথা নয় হেথা নয় আরো' অন্য কোথা! আজো, আজো!

—তা হলে যাকে বলে তোমাদের খুবই ডিসাপয়েন্ট করেছি, কি

বল প্রশান্ত? সরকারী চাকরি নেই, মেমের সঙ্গে সংসারও ফাঁদিনি বিলেতফের্তা ভদ্রলোকের মত—অতএব যা ছোটলোক ছিলুম সেই ছোটলোকই রয়ে গেলাম আজ অবধি কি বল?

এরপর প্রশান্ত আর ও'র বন্ধুটি থ মেরে গেল। অলক বন্দ্যোকে দুজনেই ও'রা ধরেছে বিলেতে থাকাকালীন জীবনের ঘটনা একদিন ও'দের শোনাবার জন্যে। উপরন্তু উপদেশ দিল, যাকে বলে গ্র্যাটিস অ্যাড্‌ভাইস তাই, যে ওই সব ঘটনা লিখলে এমন কি বেস্ট-সেলার হতে পারার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

—কিন্তু আপাততঃ তুমি আমার টাকাটার ব্যবস্থা কর প্রশান্ত, তা নইলে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। ধরা পড়লে আমার বিদেশের অভিজ্ঞতাগুলো বই হয়ে বেস্ট-সেলার হবার সুযোগ পাবে কেমন করে তখন?

প্রশান্ত এরপর বললে, "চল তাহলে আমার বাড়ির দিকেই ঘোরা যাক। তোমার সঙ্গে কথার কামান দাগাদাগিতে বিলকুল বোম্বার্ডেড হবার আগেই অন্ততপক্ষে তোমার আর্থিক-আবশ্যকতার একটা হিল্লে করে দিতে চাই।"

এরপর অলক প্রশান্তর ওখানে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অন্তে যখন বাক্কামের বাড়ির দিকে রওনা হবার জন্যে ট্রামে চড়বে পকেট তখন ও'র ছশো টাকার খুচরো নোটে চড় চড় করছে। এসপ্লানেডের

দৌড়ে ট্রামটা চেঞ্জ করে ও' একটা আরাম আর নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস নিতে যাবে ট্রামের সামনের দিকের একটা সিটে বসে, হঠাৎ পাশের বসে-থাকা ভদ্রলোক বোমার মত ফেটে পড়লেন বিস্ময়ে, তারপর ট্রামের আর সকলকে সচকিত করে উত্তেজনার মাথায় উচ্চৈঃস্বরে আবিষ্কার করলেন অলক বন্দ্যোকে !

অলক এবার দেখতে পেল বারোবছর পূর্বের সেই সার্বজনীন মাস্টারমশাই বীরেন ঘোষকে। যে সব চ্যালা-চামুণ্ডারা মাস্টারমশাই নাম উচ্চারণে ওঁর বইয়ের দোকানের বই এবং বই রাখবার র‍্যাকগুলোকে ঝঙ্কৃত করে বিরাট চায়ের আসর জমাত তারা কেউই কিন্তু ওঁর ছাত্র, এমন কি ছাত্রস্থানীয়ও ছিলনা। শেষকাল অবধি এই মাস্টারমশাই নামই ওনার আসল নামকে আস্ত রাহুগ্রস্ত করেছিল। যাই হোক এঁর কাছে ধাপ্পামারার চেষ্টা করলেও ছাড়ান পাবার আশা কম ! তার চেয়ে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ও' ভাবলে। তাইতো অলক মাস্টারমশায়ের উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে বললে, "বহু যুগ বাদে দেখা হল, আজ্ঞে কেমন আছেন ?"

—আচ্ছা লোক যাহোক আপনি ! কবে এলেন অলকবাবু ? সেই যে উপন্যাসের টাকাটা নিয়ে গেলেন, বারোবছরের মধ্যে একটা খবর নেই। এই বারোবছর অজ্ঞাতবাসে পৃথিবীর কোন প্রান্তে ছিলেন ? একবারে বেপাত্তা। ওঃ, বিলেত থেকে কেউ ফিরলেই অমনি ছুটেছি আপনার খোঁজে। সকলেরই এক উত্তর— অলক বন্দ্যো নামই তারা শোনেনি। যাই হোক কোথায় আছেন এখন – উঠেছেন হোটেলে না বাড়িতে ?

—আমার আর বাড়ি কোথায় ? যে কেয়ার অব ফুটপাথ সেই কেয়ার অব ফুটপাথেই।

—না, মশাই আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এক ইকিরও

অদলবদল হল না। যা ছিলেন নিছক তাই ফেরৎ এসেছেন। বারো বছরের বিলিতী আবহাওয়া আর পরিবেশ যার জীবনে কোন প্রতিক্রিয়াই আমদানি করতে পারে নি সে যে একটা সাংঘাতিক চিজ এবিষয় নিঃসন্দেহ। প্যাঁচের পরিখা পেরিয়ে কার সাধ্য আপনার দুর্গ দখল করে। পষ্টাপষ্টি বলে ফেলুন না কোথায় উঠেছেন?

—বন্ধুর বাড়িতে লেকের দিকে।

—কত নম্বর, কোন পথে না বললে কেমন করে বুঝব—লেকের দিকে বললে তো একটা ঠিকানা হল না।

—বি.এ. এস্ আর দাস রোড।

ট্রাম ততক্ষণে জগুবাবুর বাজার পেরিয়ে চড়কডাঙার মোড়ে। মাস্টারমশাইকে ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারেই নামতে হত বোধ হয়, কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছিলেন নিশ্চিত, তাইতো 'চলন্ত' ট্রাম থেকে কথার মাঝখানেই হঠাৎ কেটে পড়লেন আচম্বিতে, তারপর পূর্ণ থিয়েটারের সামনের ফুটপাথ দিয়ে উল্টো পথে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন অদৃশ্যতার আড়ালে।

তখন একেবারে অলক একা সামনের সিটটায়—মনে পড়ল সেই বিলেত যাবার আগে উটকো জার্নালিজম্ আর সাহিত্যচর্চা করে যখন ও' জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ভান করত তখন মাস্টারমশাইয়ের মারফত সেই পাব্লিশারের কাছ থেকে কিছু টাকা উপন্যাস লেখবার নাম করে নিয়েছিল, যে উপন্যাস শেষ অবধি নীরেন সরকারের 'বলাকা' কাগজে দু'সংখ্যা বেরোবার পর অকাল-অপঘাতে অসমাপ্তই রয়ে গেল আজও।

অলক এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে অভাবনীয় সব ঘটনার আশঙ্কাময়

উত্তেজনায়। ও' শঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকে এবার অহরহ। কালকেই যেমন করে হোক একটা মেসের সন্ধান করে যে-কোন উপায়ে উঠে যেতেই হবে।

অলক এইসব কথা চিন্তা করতে করতে যখন আস্তানায় পৌছল, দেখে—বঙ্কিম তখনও জেগে, অত্যন্ত ভাবিতচিত্তে বিছানায় বসে আছে।

অলককে দেখে বললে, "কি সর্বনাশ, অ্যাতো দেরি! আমি আর একটু হলেই যে পুলিস-স্টেসনে খবর দেবার জন্যে যাচ্ছিলুম। কোথায় গেছিলেন মসিয়ে গোর্গ্যা? ভাবলুম কী হল, রাস্তা-ঘাট গোলমাল করলেন, না চাপা পড়লেন গাড়ি-ঘোড়ার তলায়, কিংবা অন্য কোন অ্যাক্‌সিডেন্ট······"

—বলতে গেলে একরকম তাই, লাঞ্চের পর চলে গেছিলুম একেবারে উত্তর-কলকাতা। তারপর আপনার মুখে শোনা পরেশনাথের মন্দিরের কথা মনে পড়তে রাস্তায় জিগেস করতে শুনলুম, খুবই কাছে······

—বেশ করেছেন, কিন্তু তাতে দেরি হবার কারণ কি হল?

—না, আদতে মন্দির দেখা শেষ হলে গলি দিয়ে গলি দিয়ে একেবারে চিৎপুর রোড, তারপর বড়বাজার। এই গলির গোলকধাঁধায় পড়েই তো হাঁটতে হাঁটতে এত দেরি হল যে ফিরপোতে ডিনার শেষ করেই ফিরতে বাধ্য হলুম। বড়বাজারের ভীড়ে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলুম আর কি।

—বাঃ, আপনি তো তাহলে অনেক কিছুই দ্রষ্টব্য জিনিস দেখা শেষ করেছেন। চলুন কালকে শেষ করা যাক খিদিরপুর। ডক্‌-এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। বিমলকে গাড়িটাও আনতে বলেছি ও'র।

পরের দিন সকালে আঁদ্রে গোর্গ্যা অর্থাৎ অলক ও'র কাল্পনিক মার মাতামহীর কাল্পনিক শ্বশুরালয়ের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে পরম উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কলকাতা শহরে যদিও ও'র জন্ম, চোদ্দপুরুষ যদিও এখানে নানা ভাবে নানা রূপে অজস্র আদ্‌মী চরিয়ে চাষ-আবাদ করে এসেছে, কিন্তু খিদিরপুরের খালাসী-পল্লী খানাতল্লাসীতে বেরোনো কারুর কখনো হয়েছিল কিনা বলতে পারিনে অন্ততপক্ষে আজ অবধি ও'র তো হয়নি। আজ ঘটনাচক্রে ভগবান ভূত—ও'তো কোন ছার। তা নইলে এতদিন বাদে দেশ ফিরে কিনা খালাসীর সন্ধান!

খালাসী-পল্লী পরিদর্শনান্তে বঙ্কিম তখন বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু গোগ্যা না ফিরে একটু চক্কর মেরে পরে ফেরবার জন্যে বঙ্কিমের কাছে নিয়েছে অনুমতি।

তখন সন্ধ্যা হবো হবো হয়েছে, বঙ্কিম চটা-ওঠা চায়ের বাটিতে এই ক-দিনে অনেকটা উপায় না পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ও' সবে তখন সামনে-রাখা চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে যাবে আর কি, এমন সময় আগন্তুক আসার সূচনা স্বরূপ সামনের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ঘটল।

বাইরের ঘরে থাকার এই আচ্ছা বিড়ম্বনা। পোস্ট-অফিসের পিওন, চাকরের বাজার-নিয়ে-আসা রূপ শুভাগমন, ছেলেদের বৈকালিক পড়ানোর জন্যে মাস্টার, এমন কি মেথর অবধি সকলকেই দিনের মধ্যে সহস্রবার দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হয় ও'কে। বাকাম সত্যিই ফেড আপ।

যাই হোক এবারও দরজা ও'কেই খুলে দিতে হল অন্য সব বারের মতই। দরজা খুলতেই বাকামের 'কাকে চাই' এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির

পূর্বেই আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন,—আচ্ছা, অলক বন্দ্যো কী এখানে থাকেন?

—অলক বন্দ্যো, অলক বন্দ্যো আবার কে? এখানে অলক বন্দ্যো-টন্দ্যো কেউ থাকে না। পাশের বাড়িতে হবে বোধ হয়—এই বলে দরজাটা ভদ্রলোকের মুখের ওপর দড়াম করতে যাবে বিরক্তিতে কিন্তু ভদ্রলোকটি অভদ্রভাবে বাধা দিলেন। আচ্ছা নছোড়বান্দা লোক যাহোক। বললেন, "দরজা বন্ধ করছেন কী মশাই, এইটিই তো থ্রিএ এস্ আর দাস রোড? এই ঠিকানাই তো। আমার কাছ থেকে তিন শো টাকা নিয়েছে উপন্যাস লেখার অজুহাতে। মাত্র দু'টো পরিচ্ছেদ দিয়ে বাকিটা আজও পাওনার খাতায়। ওর জন্যে কাগজওয়ালা আমাকে পেলেই একচোট কষে গালাগালি দিয়ে প্রত্যেক গলির মোড়ে মোড়ে ধরে। বারো বছর হল রাধাবাজারের সেই কাগজওলার ভয়ে ওধার ঘেঁষিনি।

—কি সব বাজে বকবক করছেন। এখানে উপন্যাস-লিখিয়ে কেউ নেই। আমি ত ডেন্টিস্ট, ডাক্তার বঙ্কিম মুখার্জি, মাত্র তিনদিন হল কলকাতায় পৌঁচেছি।

—ঠিকই হয়েছে, সেও ত তাই বললে তিন দিন হল কলকাতায় পৌঁচেছে এক বন্ধুর ঘাড়ে ভর করে। আপনি ত সেই বন্ধু। বারো বছর বাদে ফিরলে কী হবে, চরিত্তিরটা ঠিক তেমনি রেখেছে চমৎকার।

—কী বললেন, বারোবছর পর দেশে ফিরেছে অলক বন্দ্যো? কী রকম দেখতে বলুন ত?

—দেখতে এই গোল গাল নেপালী-নেপালী মঙ্গোলীয়ান মুখখানা। দেখতে ভাল না হলেও মুখটার মধ্যে কী একটা আছে যাতে ধার করে ফাঁকি মারলেও গালাগালি করতে গিয়েও উল্টে আরও ধার দিতে হয়। মুখে সর্বদা এমন একটি ভাব মাখানো যেন ভাজা মাছটি

উল্টে খেতে জানে না। আদতে কিন্তু ন্যাকামীর খাপে ঢাকা নিছক একটি চাকু।

—অ্যাঁ, বলেন কী? আপনার বর্ণিত অলক বন্দ্যোর চেহারার সঙ্গে আঁদ্রে গোগ্যাঁ যে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

—আঁদ্রে গোগ্যাঁ, সে আবার কে?

—আঁদ্রে গোগ্যাঁ হচ্ছে তাহিতি দ্বীপে বিখ্যাত আর্টিস্ট পল গোগ্যাঁ যে দিশী মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তারই নাতি। উপরন্তু মার মাতামহীর শোনিতে ছিল ভারতীয় রক্ত। তাইত তাকে বম্বে থেকে ট্রেনের ভাড়া দিয়ে নিয়ে এলুম এখানে, আপাততঃ আমার বাড়িতে সে গেস্ট। এখন নেই, বেরিয়েছে, ঘুরে আসবার কথা আছে এখুনি।

—আর সে এসেছে! এতক্ষণে সে ট্যাঙ্গানিকা টপ্‌কে গেছে, হয়ত বা গোয়াটিমালা কিংবা উরুগুয়ে। যাও বা আশা হয়েছিল উপন্যাসের বাকিটা উশুল হবে, তা দেখলুম তামাদির খাতায় তুলতে হল শেষ অবধি, আর কিনা আমার অর্থাৎ এই মাস্টারমশাইয়েরই হাতে। যার প্রতাপে সাহিত্যিক বাঘ আর গরুরা সব একসঙ্গে জল খায়।

বাক্কাম বলে, "আর আপসোস করে কী হবে? বারোবছর ত মশাই এমনিতেই পেরিয়ে গেছল, কী আর করবেন, যেতে দিন।"

—টাকার জন্যে ত নয়, কিন্তু আমাকে ফাঁকি মারবে কেন? বললেই ত হত দিতে পারব না। বারোবছর ধরে জের টানা খাতায়, সে কী চারটিখানি কথা! আপনি ত বেশ এক কথায় সাবড়ে দিলেন, 'যেতে দিন না মশাই।'

মাস্টারমশাইয়ের বিদায়-পর্বের পর বাঙ্কাম সত্যিই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে তখন। বোকাবনার বেদনায় বুকটাময় বাঙ্কামের দাঁতের ব্যথার কন্‌কনানি। কোকেনের ইন্‌জেক্‌শনেও তার উপশম হত কী?
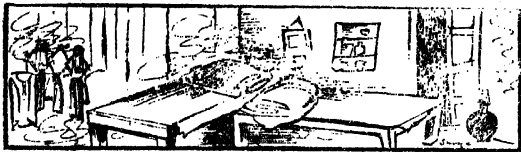
মাস্টারমশাই অর্থাৎ বীরেন ঘোষের আন্দাজটা বিলকুল উপহাসের বৈতরণীতে বানচাল করা চলল না।

গোয়াটেমালা কিংবা উরুগুয়ের সামিল অভাবনীয় এই আস্তানা। সত্যিই উদ্ভাবনী-শক্তি আছে অলকের। তা নইলে ও'রই ভাষায় বলতে গেলে এমন একটা 'মচৎকার' মেস—গা-ঢাকা-দেওয়ার এমন একটা অপূর্ব অথচ এত সহজ উপায়, এর আগে কারো মাথায় এসেছিল বলে মনে হয় না।

এখান থেকে ও'কে কার সাধ্যি খুঁজে বের করে। অলক কলকাতায় উচ্চে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত উঁকি মেরেছে একথা মুখে মুখে নানা রূপে-রংয়ে রটনা হলেও বারো বছর বাদে যে লোকটা বিলেত থেকে ফিরেছে তাকে গ্রেট-ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ড, নিদেনপক্ষে কন্টিনেন্টাল্ হোটেলের আনাচে কানাচে না খুঁজে, গোয়াবাগানের খাটালের কাছে একটা অতি এঁদো মেসের নোংরা ঘরে সন্ধান পাওয়া যাবে একথা ভূত হয়ে মাথা খুঁড়ে ঢুঁড়লেও ঢুঁ-ঢুঁ—অসম্ভব আবিষ্কার করা।

মেসবাড়ির অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে অলকের নোংরা বিছানাটা এককোণে পড়ে, মাথার বালিশটায় চুলের তেলে এ ক'দিনেই বেশ একটা কালচিটে চ্যাৎলার ছোপ ধরেছে। ভাঙা ভাঁড়টা অ্যাসট্রের ওরিয়েণ্টাল্ সংস্করণে দাঁড়িয়েছে যা দর্শনে অনেক 'ফোক্-আর্ট'

ধাতিকগ্রস্ত ভারতীয় সাহেব অথবা সাহেব-ভারতীয় নিশ্চিত অপূর্ব জ্ঞানে অজ্ঞান হওয়া ছাড়া উপায় খুঁজে পেতেন না। ও'র খাটিয়া অথবা মড়া বহনকারী খাটের চারপাশের চারটে বাঁশের খুঁটির খোঁটে-বাঁধা ন্যাতার মত মশারীটাই আদতে কিন্তু দেখবার! তিনটে রং না থাকলে কি হয়—তবুও যেন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের দাপট তার দেহে। সত্যি এমন বাছাই করা আসবাব আমদানিতে অলকের বাহাদুরি আশ্চর্য বটে।

ও' তখন দরজার গোড়ায় ক্যাম্বিস আর কেরোসিন কাঠের সংমিশ্রণে নির্মিত আরামকেদারা নামক একটি বস্তুর বুকে দেহখানি দিব্যি এলিয়ে নিজের হাত দুটোর ওপর মাথা রেখে তোফা তেতে উঠছিল। অর্থাৎ, চুপচাপ পড়ে পড়ে ভাবছিল নানা কথা···বিলেতে থাকতে দেখে এসেছিল সেই স্পেনের ফ্রাঙ্কোর দলের সঙ্গে লয়্যালিস্টদের দারুণ দাঙ্গা। তাতে লণ্ডনের প্রগ্রেসিভ্ অর্থাৎ প্রগতিবাদী লেখকদলের অনেকে গেছিলেন ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে তাল ঠুকতে···এমন কি সত্যিমিথ্যে জানিনে—শোনা যায়, কালা মুল্লুকের মুখ আলা করা ভারতবর্ষের লেখক মুল্ক্ রাজ আনন্দ্ও তাঁদের সঙ্গে বেয়নেটের বদলে নিজের লেখা বইগুলো বগলদাবা করে পায়চারির উদ্দেশ্যে স্পেনের ফ্রন্টে ফপরদালালির জন্যে পা বাড়িয়েছেন। লণ্ডনের 'গাওয়ার' স্ট্রীটের গোলচালা ভারতীয়টোলা এই সামান্য ব্যাপারেতেই নানা নিদারুণ গৌরবময় গুজবে টলটলায়মান—কি উত্তেজনা, কি তর্কের তুবড়িবাজি। ও' ভেবেছিল দেশে গিয়ে চায়নায়, না চাইলেও, যেচে সাহায্য ও'ও এমনি একটা কিছু করবে। কিন্তু সে আশা চায়নার সাহায্যের জন্যে বিশ্বভারতীর আমদানি নৃত্যনাট্যের ড্রপসিন পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও' ড্রপ করতে বাধ্য হয়েছে।

এরপর ও'র মনে হয়েছিল প্যারিসের ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপোজিসিঁও-এ কেন ইণ্ডিয়া প্যাভেলিয়ন নেই—তার একটা বিহিত করা, এই

উদ্দেশ্যে আন্দোলন উপস্থিত করা দেশে। রাসিয়ান, জার্মান থেকে পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ডের মত চুনোপুঁটিদেরও এক একটা প্যাভেলিয়ন বুক চিতিয়ে চোখের গোড়ায় চিৎকার করছে। আর ভারতবর্ষ—যার চল্লিশ কোটি লোক, দেবতা আর উপদেবতা মিলিয়ে তেত্রিশ কোটির ওপরে, নিদেনপক্ষে তিরিশ কোটি হরেক রকমের হরফ আর ভাষা, কম করেও পঁচিশ কোটি বিভিন্ন ধর্ম আর তার দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বারো মাসে তের পাব্বণের পালা যেখানে ফুরোতে চায় না, যার আদিমতম যুগোপযোগী কোলাহলে প্যারিসের আস্ত একজিবিসনটাকে একাই একশো হয়ে হুল্লোড় আর হল্লায় হাঁপিয়ে তুলতে পারত সহজে, দর্শকদের চোখে লাগাত তালা, কানে লাগাতো ধাঁধা—সেই ভারতবর্ষ অথবা হিন্দুস্থানের এত অজস্র সম্পদ থাকা সত্ত্বেও একটা স্থান জুটল না সেই বিশ্বের দরবারে ?

পরাধীন। হোক পরাধীন। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপাল তো স্বাধীন রাজ্য আছে। ও' প্যারিসের সেই প্রদর্শনী পরিদর্শন-শেষে মনস্থ করেছিল ভারতবর্ষে এসে নেপালের হিজ্‌ ম্যাজেস্টির সঙ্গে ভারতবর্ষের এই অপমান সম্পর্কে আলাপের জন্যে দরবার করতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু দেশে এসে খোঁজ নিয়ে দেখে, সে গুড়ে বালি। কারণ, স্বর্গের মত নেপালের, ইন্দ্রতুল্য পুণ্যদেহী রাজা, তাঁর প্রাচীর-বেষ্টিত এবং অপ্সরা-পরিবেষ্টিত অন্দরমহলের নন্দনকানন হতে নাকি বছরে একদিন মাত্র দর্শনদানে পৃথিবীর পাপী পুরুষের পাপ-দৃষ্টির আঘাতের দাগা সহ্য করেন। বছরে সেই একটি দিন আসতে আপাততঃ এখন অনেক বাকী। ইংরিজি হিসেবে নাকি সেটা সামনে বছরের শেষের দিকে পড়বে। অতএব ও'র সে আশাও শেষ হয়েছে। ও'র ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন, দেশের হয়ে কাজ করার সব ভরসা বিলকুল বুঝি ভেস্তে গেছে।

অলকের নানা-ভাবনা-ভরা এমনি একটা মুহূর্তে ভবানী মুখুজ্জে ঢুকল এসে ও'র ঘরে। ভবানী মুখুজ্জে ও'র ঘরের ঠিক ওপরেই এই কদিন হল এসে উঠেছে। পাথুরেঘাটার সিংহ চৌধুরীদের উড়িষ্যায় অবস্থিত কোন এক জমিদারির মফস্বল কাছারিতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নায়েবের কাজ করে ও'। এবার পুণ্যাহের সময় স্বয়ং জমিদার পরিদর্শনে যাবেন সেখানে। তাই সদর কাছারির আহ্বানে কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় হাজির হয়েছে। বাঁটকুল মার্কা বেতের মত লিকলিকে চেহারা, সামনের দাঁতগুলো একটু উঁচু, চোখের কোলে এক ইঞ্চি পুরু কালি। ধূর্ত শৃগালের মত চোখের তারা দু'টো সব সময় চিক্‌চিক্ করছে। ও'র আসা যাওয়া, কথাবার্তা, বেবাক সব কিছুতেই যেন মফস্বলের উদ্‌বেড়ালের আদল। ভবানী সম্পর্কে অলকের এই মানসিক চিত্র কখনো প্রকাশ পাবার সুযোগ পায়নি। পেলে হয়ত হয়ে যেত হাতাহাতি। এমন কি ভবানী সদর কাছারি থেকে বরকন্দাজ বাগিয়ে অলকে বেইজ্জত করবে বলে শাসাতেও মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বোধ করত না। অলক বহুদিন বাদে বিলেত থেকে এসেছে তাই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় বর্ধিত এই ক্ষুদে লোকটির বিচিত্র দম্ভ আর প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের অপকৌশল আর তার প্রয়োগ-চাতুর্যের বাহাদুরি অলকের কাছে কৌতূহল মিশ্রিত ঔৎসুক্য বহে আনত। তাই ভবানীর ও' ছিল একান্ত মনযোগী একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রোতা। ভবানীও ঠিক এই কারণে মেসের মধ্যে অলককে অত্যন্ত আপন মনে করত। কারণ ভবানীর নানা দুঃসাহসিকতাময় দুশ্চরিত্রতার ইতিহাস বিশ্বাস সহকারে কে মনোযোগ দিয়ে শুনবে? ভবানী ও'র দুষ্কৃতির নানা বিচিত্র কাহিনী অলককে বিশ্বাস করাতে পেরেছে ভেবে আনন্দ আর আত্মপ্রসাদ—এই দু'য়ের আলোড়নে আছড়ে আটখানা হয়ে পড়ত। তাই সময় পেলেই এসে অলকের কাছে ও'র মফস্বল

কাছারিতে থাকাকালীন সেখানকার পাড়াপ্রতিবেশীদের রূপসী কন্যা বরকন্দাজ মারফত বগলদাবাই করার ইতিহাস থেকে গাঁজা এবং আফিমের নেশার পার্থক্য সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে যেন হিবার্ট লেক্‌চারের উপক্রমণিকা আঁটত। অলক কখনো কখনো সত্যিই মানুষ পশুর চেয়ে কত অধঃস্তন স্তরে নামতে পারে এই মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধানে কৌতূহলবশতঃ, কখনো কখনো নিছক সময় কাটানোর খেয়ালে তার এই দুঃসাহসিকতার নামে নৈতিক দুশ্চরিত্রতার কাহিনী বিস্ময়ের ভান করে অথবা অতি-মনযোগের গাম্ভির্যের সঙ্গে শুনে ভবানীকে ক্রমাগত উৎসাহিত এবং উত্তেজিত করে তুলত।

এই রকম সব নানা বিশেষ কারণে ও' অলকের উপর আন্তরিক ছিল সন্তুষ্ট। তাই আজ ঘরে ঢুকে অলককে অমন উদাসীনের মত এলিয়ে থাকতে দেখে বললে: "কি হে অলক বন্দ্যো, অমনধারা পান্‌সে মেরে পড়ে আছ যে, ব্যাপার কি? বলছি বাঙালীর ছেলে বে-থা' কর, ঘর সংসার কর—রাজর্ষি জনকও ত রাজত্বি, ঘর-সংসার সব বজায় রেখেও ঋষিত্ব দেখিয়ে গেছেন। তা না, কী বাউণ্ডুলের মত একা একা ঝেসে পড়ে থাকা! দেখ না কেন ভায়া, এই দু'দিন এসেছি তাতেই প্রাণটা যেন কাটা কই ধড়ফড়! ভাতের সঙ্গে কে-ই বা আর মাখনমারা ঘি'টি এনে দেবে, গিন্নির হাতের ফ্রাই করা মাছটার স্বাদই হয় আলাদা! কে-ই বা আর এখানে দুধটি মেরে ক্ষীরটি করে রাখছে! মনটা যেন মরে আছে। তা তোমাদের অবস্থা যে কি, আর বলবার দরকার নেই বুঝছি হে, নিশ্চয় বুঝছি।"

—আপনি আপনার মনিবকে বলে আমার একটা কিছু করে দিন না। বিয়ে করলেই ত আর হল না, রোজগার না করলে বৌকে খাওয়াবো কি? তা নইলে ঘরসংসার করতে কার অসাধ!

—সত্যি তুমি চাকরি করবে জমিদারি সেরেস্তায়! তোমাদের

'এই ছোকরাদের যে আপিসে কলম না পিষলে পেটের ভাত হজম হয় না—একথা বললে কোন কালে এতদিন তোমায় বসিয়ে দিতুম, তারপর আমার মার মাসতুতো বোনের পিসতুতো ভায়ের মেয়ের সঙ্গে বে'রও ব্যবস্থা করে দিতুম এতদিনে। খাসা ডাপোর-ডোগোর মেয়ে, গড়নটি যেন ঘড়ার জল ছলাৎ-ছলাৎ, মাজা মাজা রং—একেবারে মজেকের মেঝের মত পালিশ করা।

ভবানী এই বলে ঠোঁটের কাছে আঙুলগুলো এনে একটা চুমকুড়ি কাটলে। তারপর আবার বললে: "আজকেই কর্তাকে বলব, দেখো আবার মত বদলিও না। আমাদের ছোকরা জমিদার তোমায় পেলে লুফে নয় তুফে নেবে—কব্‌তে লেখে আনন্দোবাজারের পূজোর সংখ্যায়, লম্বা চুল রাখে, নাকে চশমা লাগায় ঐ গো তোমাদের ঠাকুরবাড়ির ঢং-এ, আবার চণ্ডীদাস চর্চা করে, পরকীয়া প্রেমের প্রলোভনে সব সময় ডগমগ। যাক্, মাইনেটা তোমার পঁচিশ টাকার জায়গায় তিরিশ টাকাই করে দিতে বলব। পনের টাকা মাইনেতে এই আমিই ত প্রথম ঢুকেছিলুম। তিন বছরের মধ্যে দেশে তিন তিনটে পাকা বাড়ি, বোয়ের পাছায় বিছে হার উঠেছে—সবই উপরি থেকে। আজ না হয় আমি পঁয়ত্রিশ টাকায় উঠেছি। মাইনে কম—তাই হু'হাত্তা ফাউ, বলবার কেউ নেই। দাঁড়াও, আজই কর্তাকে বলছি। কি হে, চুপ করে রইলে যে?"

—কি বলব বড়ই দুশ্চিন্তা, সত্যিই আপনি যদি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন, দশ টাকাই হোক কি বিশ টাকাই হোক, বড়ই উপকার হয়।

ভবানী মুখুজ্জে অলক বন্দ্যোর চাকরির এমনতর উমেদারিতে নিজেকে একটা হোমরা-চোমরা কেউকেটা বিশেষ অনুভব করল। তাই উত্তেজিত হয়ে অলকের চাকরির একটা বিহিতের উদ্দেশ্যে হঠাৎ

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দমকা বাতাসের মত। যাবার সময় বললে:
"যাচ্ছি, আজকেই সন্ধ্যার সময় দেখা হবে কর্তার সঙ্গে, সেই সময় কথাটা পাড়ব—তারপর রাতে খাবার সময় তোমার সঙ্গে ত দেখা হচ্ছে—কথা ঠিক হল, যেন নড়চড় না হয়। কাজে ঢুকলে কিন্তু আমার মার মাসতুতো বোনের পিসতুতো ভায়ের সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হবে ভায়া।"

ভবানী মুখুজ্জে চলে যেতে অলক আপন মনে হেসে উঠল, ভবানীর সঙ্গে ওর আলাপের কথা ভেবেই বোধ হয়। তারপর ভাবলে অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু নিজের দেশের নানা জায়গার কোন কিছুই দেখা হয়নি—দেশের মানুষ, তাদের মনস্তত্ত্ব, কোন কিছুরই একটা সঠিক ধারণা নেই। জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকলে সেখানকার হালচাল, লোকজন, সমাজ-ব্যবস্থা, বিশেষ করে পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রার একটা নিখুঁত ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। মন্দ কি? বাল্যবয়সে বাংলা-দেশের পূর্বাঞ্চলের নদী, শান-বাঁধানো-দিঘী পার, সেই বাজি ফেলে সাঁতার কাটা—এমনিতর কত অজস্র ডানপিটেগিরির ম্লান হয়ে আসা ছবি ওর চোখের উপর ক্ষণেকের জন্যে বারেক চলকে উঠল। ও তখন জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি নেবে মনস্থ করে ফেলেছে।

মেসের অন্যান্য বাসিন্দারা কিন্তু অলকের মস্তিষ্কে গোলমাল আছে ধরে নিয়েছিল। কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না, নিজের মনে মাঝে মাঝে হাসে, মাঝে মাঝে কি বিড়বিড় করে—তা এক ভগবান জানেন, আর কি একটা খাতায় অনেক রাত্তির অবধি লেখে। ও'কে

মেসের লোকেরা তাই নাম দিয়েছিল 'বুক অফ নলেজ'। ও'রা তাই ও'র কাছে বড় একটা ঘেঁষত না। ও'র ঘরটা আলাদাই ছিল—তার ওপর ঠাকুরকে বাড়তি বকশিশ দিয়ে আবার নিজের ঘরেই খাবার আনিয়ে নিয়ে আরো আলাদা করে রাখত নিজেকে। ও'র এইসব অনিচ্ছাকৃত কায়দাগুলো অন্য সব বোর্ডাররা বেয়াড়া মনে করে চট করে বরদাস্ত করে উঠতে পারত না। সবাই তাই নিয়ে আলোচনাও করত যে—ঐ ত ঘরের ছিরি আবার ঠাকুরকে মাসে পাঁচ টাকা বকশিশ! অতই যদি টাকার গরম ত গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেলেন না কেন লাটসাহেব? মেসের ঠাকুর চাকরগুলোর মাথা খাওয়া! কথাই আর শুনতে চায় না ঝি-চাকরগুলো। তার ওপর একটা কথা বললে অলকের কথা তুলে খোঁটা মারতে ছাড়ে না—এ আর কাঁহাতক সহ্য হয়!

* *

আকাশে সন্ধ্যা নেমে আসবার আগেই সন্ধ্যা নেমেছে কলকাতার কোলে, গলির মধ্যেকার এই মেসের মনোহারী সর্বাঙ্গে। অলকের ঘরের ঝুল আর ধোঁয়ার ঝালর ঝোলান পঁচিশ ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের বাতিটা মাতালের চোখের রাত্তিরের মত ঘোলাটে। মন্দ কি! আর যাই হোক, অলক অন্ততঃ নির্ঝঞ্ঝাট এখানে—এই কথাই ও তখন বসে বসে ভাবছিল। তারপর চাকরিটা যদি উড়িষ্যায় পেয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। একদা নিজে ছিল জমিদার, আর আজ জমিদারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নায়েবের উমেদারি—উপভোগ করার মত অভিজ্ঞতা! ও'র মনের কাছে সত্যিই উপাদেয় আর মজাদার বলে মালুম দিচ্ছিল।

এমন সময় ভবানী মুখুজ্জে তার কথা অনুযায়ী, একটু আগেই এসে পৌঁছে—সগৌরবে ঘরে প্রবেশ করে বললে : "ঠিক হো গিয়া, সব ঠিক হো গিয়া। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে, আর কি চাই? এ ছাড়া উপরি উপায় কিছু না করলেও পাঁচশ। এখন কাল সকালে চল কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎটা সেরে আসবে। তবে একটা কথা, তুমি এম্-এ পাশ আমি বলেছি—সেটা তুমি বজায় রাখবে কিন্তু। দেখো বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না। তারপর কাজটা হাসিল হলে আগাম কিছু মেরে আনতে হবে, বুঝলে বাছা? বলবে, বাড়িতে বুড়ি মা, তিন তিনটে ছেলেমেয়ে, বড় ছেলেটাকে ইস্কুলে ভর্তি করে যেতে হবে।"

অলক ভবানীর কথা আর উপদেশের উত্তরে ও'র একান্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গেল কিন্তু ভবানী থামবার পাত্র তখন? ওর উপদেশ আদি (অকৃত্রিম?) ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর বুকে বসা ব্যাখানকেও যেন মাঝ দরিয়ায় বানচাল করার বাসনায় মরিয়া। ও' তখনও বলে চলেছে : "দেখ অলক, আমাদের কর্তাটি যদি বলে ফ্যামিলি নিয়ে চলুন, কাছারির মধ্যেই কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে—বুঝেছ তো……নতুন-আমদানি-অফিসারের অর্ধাঙ্গিনীটি রূপসী হয়েও ত যেতে পারে!"

অলক বললে—"তখন কি উপায়?"

—গরীবের আবার উপায় কি? নিরুপায়।

—কিন্তু আপনারাই তো বলেন ওপরওয়ালা বলে একজন আছেন, যাঁর কাছে বড়লোক গরীবলোক কিছুই নেই।

—হ্যাঁ, সে তো ভগবান, তিনি ত আছেনই, কিন্তু—তিনি আজকাল সাকারও নন, নিরাকারও নন—তিনি যে আজকাল টাকার। এই তো আগে যে সার্কেল-অফিসার ছিল তার ছুঁড়ি বৌটাকে কর্তার নজরে লেগে গেল—বৌটির বয়স যেমন ছিল কম তেমনি সুন্দরীও ছিল।

উপরন্তু স্বামীর বয়সের সঙ্গে বয়সেরও ছিল অনেক তফাৎ, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে তিনি শেষ অবধি নিজেই উপঢৌকন পাঠিয়ে দিলেন কর্তার কাছে। অবিশ্যি মাইনে আর পদোন্নতি ঘটেছিল তাঁর। সে বিষয় আমাদের কর্তাটির গায়ে মহাশত্রুও আঁচড়টি কাটতে পারবেনা। সবে বিয়ে করেছেন—তবু স্ত্রী কিংবা পরস্ত্রীর গায়ে হাতটি না ছোঁওয়ালেও মাইফেলের সময় পরস্ত্রী আর ইয়ার মোসাহেব না হলে কি জুতসই হয়?

—আচ্ছা এরা সব মানুষ না পশু, নিজের বিবাহিত বৌকে পয়সার লোভে স্বেচ্ছায় পাঠিয়ে দিল ঐ জমিদারটার কাছে? আর জমিদারই বা কি রকম? নিজের স্ত্রী থাকা সত্বেও পরস্ত্রীর ওপর···

—গরীবেরা আবার মানুষ হয় নাকি? তারা ত সব সময় পশু। ইজ্জৎ, সে ত বড়লোকদের ইজারা নেওয়া—যার সাড়ে নিরানব্বই বছরের মেয়াদ আমাদের দেশে ফুরোতে এখনো একশ সাড়ে নিরানব্বই বছর বাকী।—সেটা কি হুঁস আছে?

—তাই তো জমিদার আর তাদের জমিদারির আয়ু প্রায় নিঃশেষিত হবার উপক্রম হয়েছে।

এবার ভবানীর কিন্তু আঁতে ঘা লাগল। বললে: "একচোখো হরিণের মত তোমরা খালি জমিদারদের দোষ দেখছ, ব্যবসাদার বড়লোকগুলো যেন ধর্ম্মের ষাঁড় যুধিষ্ঠির। খবরের কাগজওয়ালাগুলোও তাই। তাদের যত রাগ জমিদারদের ওপর। বলি, ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে বললে বিজ্ঞাপন যাবে বন্ধ হয়ে যে! অতএব যত দোষ নন্দ ঘোষ, পাড় জমিদারদের গাল। হ্যাঁ, বলতে পার জমিদারগুলো বোকা পাঁঠা, কাগজগুলোয় উচিত ছিল টাকা দিয়ে অংশীদার হওয়া, তা না, তারা ক্যালকাটা ক্লাবের টেনিস-কোর্টটা শান-বাঁধানো করে দিয়ে আর লাটসাহেবের বাড়ির দরজায় দাঁড়কাকের মত দাঁড়িয়ে ভাবলেন, কি না কি হনু! ওদিকে দেখ ব্যবসাদারগুলো ক্যালকাটা ক্লাবেও যাবে মদ

খেয়ে ব্যবসা বাগাতে, খদ্দরও পরবে কংগ্রেসি মিটিং-এ, আবার কৌশলে খবরের কাগজওয়ালাদের বিজ্ঞাপনের মুঠোয় চেপে নিজেরা দিনে দিনে কেমন ফেঁপে উঠছে। যতই বল, 'বলং বলং বুদ্ধি বলং' কথাটাকে ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।"

এবার অলক নিজের মনোভাব চেপেই নিছক ভবানীর সন্তুষ্টির জন্যে বললে "তা ঠিকই বলেছেন ভবানীবাবু, জমিদাররা অনেক ভালো এই সব ব্যবসায়ে-বড়লোক-হওয়া লোকগুলোর চেয়ে। বনেদী বড়লোকদের, অর্থাৎ কিনা জমিদাররা যত খারাপই হোক, দিলটা তাদের সত্যিই দরিয়া। ব্যবসাদারদের বুক—সে ত চামচিকের মত, যেন কিপ্টেমীতে চেপ্টে যাওয়া……"

—তবে তাই বলুন, জমিদারদের দোষগুলো দেখে শুধু ও'দের গাল পাড়লেই হয় না, ও'দের প্রশংসা করবার মত জিনিসও অনেক আছে। ও'রা যা করবার—দুষ্কর্মই হোক আর সুকর্মই হোক—বুক ফুলিয়ে করে, যেখানে এই সব ব্যবসাদার লোকগুলো ছুঁচোর মত ছলে নয় কৌশলে কাজ হাসিলের তাকে থাকে, হরে দরে ত সেই হাঁটু জল। দেখতে গেলে বেনে ব্যাপারীগুলো জমিদারদের চেয়ে খারাপ বই ভালোটা কোথায়? অথচ কংগ্রেস থেকে শুরু করে কম্যুনিস্টরা অবধি সবাই, "মারো শালা জমিদারদের!"—সব শেয়ালের এক রা।

অলক ভবানীর এই জমিদারদের হয়ে মোড়লি করায় মনে মনে মেজায় হাসলেও মুখে খুব গম্ভীর হয়ে বললে: "শুনেছি বিলেতেও নাকি জমিদার ছিল, তারপর কালক্রমে তারা ক্ষয়ে এসেছে, তাদের জায়গায় কলকারখানার মালিকরা কিংবা অন্যান্য ব্যবসাদাররা জুড়ে বসেছে—আমাদের পূর্বপুরুষরা একদা গরুর গাড়ি, পাল্কিতে চড়ে চলাফেরা করতেন কিন্তু এখন সেই চলাফেরার ব্যাপার মোটরগাড়ির মারফৎ সমাধা হচ্ছে।"

—তার মানে, তাহলে তোমরা বলতে চাও বিলেতের 'কপিক্যাট' হওয়াই আমাদের একমাত্র কাম্য—তবে কংগ্রেস স্বদেশী ব্যাপার বলে এত তড়পাচ্ছে কেন···বললেই তো পারে তারা বিলেতের মাছিমারা কেরানী।

অলক চুপ করে রইল ভবানীর এই অকাট্য যুক্তিতে। পৃথিবীর প্রগতিধারার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, দেশ, মহাদেশ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব যে পরিবর্তিত হয়ে কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার অবতারণা এর কাছে করে অলক পুনর্বার সময় নষ্ট করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে চাইল না। ও শুধু ভবানীকে সমর্থনের সুরে বললে—"তা ঠিকই বলেছেন মুখুজ্জে মশাই।"

—তবে বলি শোন বাবাজীবন! জমিদারদের পাল না পেড়ে, কর্তার কাছে গেলে তিনি যদি বৌ ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন, তখন কি উত্তর দেবে?

—কি উত্তর দেব আপনিই বলে দিন।

—বলবে বউ অন্তঃসত্ত্বা, হাঙ্গাম মিটলে তারপর মাস কয়েকের মধ্যেই নিয়ে যাব। আর বড় ছেলেটাকে—বলবে—ছোট শালীর বাড়ি থেকে স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে—এ বছরে স্কুলে না দিলে ষোল বছরে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে না। বুঝেছ, আমার যতখানি, তা ত আমি করলুম, এখন তোমার বরাত। তবে চাকরি পেলে অগ্রিম দক্ষিণা যদি কিছু মেলে তবে ফুর্তির জন্যে অর্ধেক ভাগ তার থেকে তোমায় ছাড়তে হবে। চন্দননগরে পার্টি, শুধু তুমি আর আমি, সঙ্গে খালি খাস বরকন্দাজটাকে নেবো। দিশী কলার মদ যা পাওয়া যায় ওখানে···ফাস্ ক্লাস—তারপর গঙ্গার ধারে সেই হোটেলটা—সেখানে শর্ষের তেলের তৈরি ঝাল দিয়ে মুর্গির কারি যা রাঁধে···অমৃত, অমৃত! রাতটা কাটাব কিন্তু সতীর ঘরে—বয়েস মাত্র ষোল, খাসা

যান ! বুঝেছ না চন্দননগরটা যে ভীনদেশী এলাকা, কম বয়েস নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামার কিছু নেই। তারপর তার পরের দিন সকালে ফিরে আসা যাবে'খন কলকাতায় কি বল ? রাজী ত ?
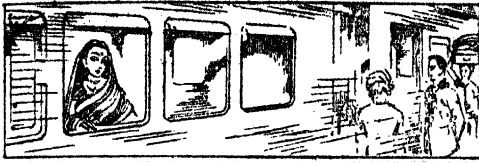
অলক বন্দ্যোর নবলব্ধ চাকরির অগ্রিমলব্ধ বেতনে, চন্দননগর গিয়ে কদলি-গন্ধ-সুরভিত স্বদেশীয় সুরা, আর ষোলকলায় পরিপূর্ণা কোন ষোড়শবর্ষ-বয়িয়সী রূপবতী 'সতী'র সঙ্গলাভ ভবানীর ভাগ্যে ঘটেছিল কিনা বলতে না পারলেও, অলকের কপালে সিংহ চৌধুরীদের জমিদারি সেরেস্তায় যে-কাজটা জুটেছিল, সে-কাজের নামকরণ অথবা অন্নপ্রাশন কোনটারই ইতিপূর্ব্বে যে প্রয়োজন ঘটেনি—এ-কথা জোর গলায় ঘোষণা করা যায়।

একবারে খোদ মালিকের খাস-মহলের কর্মচারীর অভাবনীয় পদ এটা। অর্থাৎ মোসাহেব, পারস্যনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি—এই পদাবলীসমূহ একত্রে সংমিশ্রিত করে, কলকাতার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের রেস্টুরেণ্টগুলোর নব-আবিষ্কৃত অবদানের মতই তোয়ের করা হয়েছিল একটা 'মামলেট' মার্কা পদ।

অনুপস্থিত জমিদার, কিনা—ইংরেজীতে যাকে অ্যাবসেণ্টি ল্যাণ্ডলর্ড বলা হয়, বংশপরম্পরায় এই সিংহ চৌধুরী জমিদার বংশ হচ্ছে তাই। অর্থাৎ তাঁদের জমিদারি উড়িষ্যার কটক ডিষ্ট্রিক্টে অবস্থিত হলেও তাঁরা কদাচিৎ সেখানে পদার্পণ করেন। গোঁয়ারগোবিন্দ নায়েব-গোমস্তার বুদ্ধি, এবং গুণ্ডাপ্রকৃতি বরকন্দাজগুলোর গায়ের জোরেই কাছারির কাজের সুব্যবস্থা এবং প্রজাপালন নির্বিঘ্নে এত পুরুষ তাঁরা করে এসে

আসপাশে সুনাম এবং প্রতিপত্তি দুইই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন প্রচুর।

পাঞ্জাবের ভাগ্যহত কোন এক কুলত্যাগী ক্ষাত্রকুলোদ্ভব ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশে এসে বাণিজ্যের দ্বারা বহু-বিত্তশালী হবার পর আভিজাত্যের ইমারৎ জমিদারির ভিত্তিতে রচনা করে পর পর চার পুরুষ ধরে কুলাঙ্গার সৃষ্টিতে বিলকুল স্বভাবকুলীন বনে গেছেন, এখন এঁরা পৌচেছেন এসে পঞ্চম পুরুষের পাদানিতে! তবে অকস্মাৎ বাংলা মুল্লুক থেকে উড়িষ্যা অঞ্চলে জমিদারি জোগাড়ের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে ইশারা মেলে এই—যে, যে-সময় এঁদের পূর্বপুরুষ এই জমিদারি ক্রয় করেছিলেন সে-সময় বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং একটি ছোটলাটের ছত্রাধীনে। তাই ঐ-সব প্রদেশের সম্পত্তির নিলাম-বিক্রয় হবার কারণ ঘটলে, তা হত কলকাতার হাইকোর্টের হাতায়। সেইজন্যে কলকাতায় অবস্থিত তখনকার দিনের অর্থশালী অনেকেই ঐ-সব নানা প্রদেশে বিষয়বান হয়ে ওঠার বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন অতি সহজে।

হাল্‌ফিল্‌ পিতৃবিয়োগান্তে জমিদারি পরিপূর্ণ আয়ত্তে আসার পর সিংহ চৌধুরীদের এই সবে-ধন-নিলমণি ছোক্‌রা-জমিদার প্রথম চলেছেন জমিদারি পরিদর্শনে পুণ্যাহ উপলক্ষ্য করে। আকস্মিকভাবে ঠিক যাত্রার এই জোড়জোড়ের উৎসাহিত প্রথম তোড়ের মোহনায় পড়ল

এসে ভবানীর সুপারিশ সহ অলক। জমিদারির জটিল কর্মপন্থা, উপরন্তু কর্তা হচ্ছেন কম-বয়সী, অতএব একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির প্রয়োজন অনিবার্য। নজরসেলামীর হিসেব রাখা, সদরে চিঠিপত্তর লেখা, তাছাড়া জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে জমিদারের প্রতিনিধি হিসেবে ইংরিজি কেতায় 'ভেটি' সমেত মোলাকাৎ মারা—নতুন কর্ত্রীঠাকুরাণী চলেছেন সঙ্গে, তাঁরও খাস-তহবিলের তদারকি, উপরন্তু সন্ধ্যার অবসর আসরে কর্তার খোসগল্পের সঙ্গী—এতগুলো কাজ একসঙ্গে সমাধান হল একা অলককে নিযুক্ত করে। আর কি চাই?

অলক অঘটন-ঘটন-পটিয়সী একটি ওস্তাদ—ও'র ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে বসে, অবিশ্যি ভাগ্যই করেছিল ও'কে অমনি। এছাড়া অলক যেমন আসর-জমাটি, তেমনি বিনয় আর সৌজন্যের ন্যাকামিতে নাটকের মহারাজকেও নাকাল করে ছাড়তে পারে—এহেন বিচিত্র গুণবিশিষ্ট একটি গুণধর সচরাচর সহজে পাওয়া যায় কি?

এ কদিন কলকাতায় কর্তার সঙ্গে নিট্ বারো পেগ হুইস্কিতেও যার হুঁস হরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে, শুধু তাই নয়, তারপর সেই বারো পেগ নির্জলা মেলেচ্ছ নেশার নির্যাস নিলকণ্ঠের মত কণ্ঠস্থ করে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল যে কপচে যেতে পারে, কমা ফুলস্টপ স্মরণ করে, সে যে কর্তার নেক্‌নজরে একটি রত্ন বিশেষে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

যাই হোক, অলক পূর্বের মেস থেকে পাথুরেঘাটায় সিংহ

চৌধুরীদের এখানে এসে ইস্তিক ও'র কর্মতৎপরতার প্রচুর প্রমাণ হেলায় দু'হাত ভরে হরির লুট দিয়েছে। এই কারণেইতো এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কর্তার গোপনীয় কথাবার্তার চাবির গোছা স্বভাবতই পৌছল এসে ও'র জিম্মায়।

অলক আগেই অবগত হয়েছিল যে পুণ্যাহের সময় জমিদার রাজগদিতে বসে যখন দর্শনদান করেন তখন তাঁর বাম পার্শ্বের আসনে কর্ত্রী আসীন থাকলে প্রজামণ্ডলের মন মহালক্ষ্মীর প্রতীক প্রত্যক্ষ করে পরিতুষ্ট হয়—শুধু তাই নয়, জমিতে নাকি ফসলও ফলে ভালো, উপরন্তু নজরসেলামীরও আমদানি হয় দুগুণ। কারণ, রাজ-রাণী দর্শনের সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতের পর দুজনকারই পায়ের উপর দর্শনী রাখার রেওয়াজ, অর্থাৎ সম্মান ও সামর্থ্য অনুপাতে দুজনকেই অর্থের অঞ্জলি দিতে বাধ্য।

নজরসেলামীর উপরি আয়ে এবারকার ভাইসৃক্‌ক্ক্ কাপে যেমন করেই হোক ভাঙতে হবে ভাগ্যলক্ষ্মীর সতীপনার ছেনালি···আগের যুগে লক্ষ্মীর বাহন পেচক, এ যুগের দেবী কমলা ঘোড়ার কোমরে ভর করেছেন—তাই মডার্ন মা-লক্ষ্মীর এই ঘোটকরূপ বাহনকে আমাদের কর্তা হাত করে লক্ষ্মীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে চান, তা যত টাকাই ব্যয় হোক না তাতে—স্বয়ং লক্ষ্মী লোহার শিকলে বাঁধা পোষা-পাখীর মতন তখন থাকতে বাধ্য হবেন তো পোষ মেনে। এর বেশি আর কি চাই? তাই একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৌ বগলে পথ চলার বিভ্রাটে, আমাদের কর্তা মাথা গলাতে বাধ্য হয়েছেন।

কোথায় মফস্বলে যাচ্ছেন পানের মাত্রা গানের গৎ-এর মত চড়তে চড়তে আলাপে, শেষে বে-মাত্রা প্রলাপে এসে পৌছবে। তার ওপর আবার ভবানী জীবন্ত রাগিনীর 'ছিনিমিনি' নাচ দেখাবে বলে উপরি প্রলোভনে প্রলুব্ধ করেছে—যার সামনে থোড়াই লাগে কলকাতার মেনকা, রম্ভাদের 'রম্বা' নাচ !—সব শেষ অষ্টরম্ভা !

ভবানীর ভাষায়—'ছিনিমিনি' নাচের ঘূর্ণীচক্রের চক্রান্তে ছুঁড়িদের ছিঁড়ে চলে যায় নাকি চন্দ্রহার, উড়ে চলে যায় বক্ষাবরণী, মেখলা, কটির বসন, সব—সব—ডুমুর-পত্র-বিহীনা বিবসনা ইভের দুর্নিবার ঘূর্ণী নৃত্যের সে দুরন্ত দাপাদাপিতে ধ্বসে পড়ে লজ্জা সম্ভ্রমের সব কিছু—বালাই, পদ্মা-পারের পাড়ের মতই। ভবানী এই 'ছিনিমিনি' নাচের নতুন কম্পোজিসনে এই কমবয়সী কর্তাটিকে বিশেষ অভিনন্দনে গোপনে অভিনন্দিত করবে বলে নিবেদন জানিয়েছে।

নাঃ, এই কদিন বিয়ে করেই আমাদের কর্তা বৌ-এর সন্দিগ্ধ মনের ঘ্যানঘ্যানানি প্যান্‌প্যানানিতে জ্বালাতন—জীবনটার স্বাদই নাকি পান্‌সে করে দিয়েছে তাঁর। তাইতো ভবানীকে সঙ্গে না নিয়ে আগাম পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন উপরোক্ত ব্যবস্থার পাকা বন্দোবস্ত করার দরুণ—যাক, এও কি একটা কম সান্ত্বনা !

অলক মেল থেকে সিংহ চৌধুরীদের বাড়িতে উঠে আসার পর থেকেই পরিচারক-পরিচারিকা মহলে এই নতুন কর্ত্রীঠাকুরাণীর সদা প্রশংসার সর্বদা প্রতিধ্বনিতে তাঁর দর্শন লাভের লোভে লোলুপ হয়ে থাকলেও, সে-কৌতূহল চরিতার্থ হল ট্রেন ছাড়বার সময় সময় প্রায়।

ও' তখন বিলেতের তৈরি সেই চামড়ার তালিমারা ভেলভেট্ কর্ডের পুরোনো স্যুটটার সঙ্গে ভবানীর কাছ থেকে জোগাড় করা একটা বৃন্দাবনী চাদরের ছেঁড়া ফালি গলায় মাফলারের মত জড়িয়েছে—অলককে বিলিতি বেশে বেশ তৎপর দেখাচ্ছিল—যাকে বলে স্মার্ট, তাই। থ্যাদা থ্যাঁদা মুখখানা হলেও লম্বা ছিপ্ ছিপে গড়ন, চুলটা অনেক দিন না কাটায় বাড়ন্তর দিকে পা বাড়ালেও শান্তিনিকেতনী নয়—মন্দ কি, বেশ একটু অদ্ভুত, নতুন নতুন লাগছিল ও'কে। প্যারিসের 'কার্তিয়ে লাঁত্তা' এলাকার উপযুক্ত! এখানে ওগুলো না পরলেই ভালো হত হয় তো—নায়েব বরকন্দাজের মধ্যে ও-বেশ, 'বেনা বনে মুক্ত ছড়ানোর মত' মনে হয় নাকি? কিন্তু অলকের উপায় ছিল না। নতুন স্যুট করার মত পয়সা···অগ্রিম এক মাসের বেতনে সম্ভব হয়নি। এতদিনের অনভ্যাসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ট্রেনে চড়া, ছোটাছুটি, তারপর কর্তার কাইকরমাসে বারবার ওঠানামা খবরদারি—সত্যিই অস্বোয়াস্তিকর, সব সময় 'এই বুঝি খুলে গেল' গোছের একটা ভাব! তাই বাধ্য হয়ে এই বিচিত্র বেশে হাজির হতে হয়েছিল ও'কে স্টেশনে।

'হুজুর' কিনা কর্তা অলককে অমনিতর বর-বেশে—চামড়ার তালিমারা ভেলভেটের স্যুটের সঙ্গে বৃন্দাবনী চাদরের মাফ্লার দর্শনে হেসেই খুন! ভেলভেট কর্ডের চলন তখনো কলকাতার পোশাকের বাজারে মোটেই চল্তি হয়নি, আর অলক যে এতদিন বাদে বিলেত থেকে ফিরেছে—এটাও ও'দের অগোচর, অতএব কর্তার হাসি ও'কে হেসেই হজম করতে হল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "বিলিতি যাত্রার দলের এ-হেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল কোথা থেকে জোগাড় করলে হে? চল পৌঁছনো যাক, তারপর স্যুট পরার শখ হয়ে থাকলে আমার পুরোনো স্যুট দেওয়া যাবে'খন একটা।

—পাঠ্য অবস্থায়, এটা, কলেজে একটা ইংরিজি অভিনয়ের জন্যে তৈরি হয়েছিল,—তাতে আমার হিরোর পার্ট ছিল, তারপরে ভাল পার্ট করায় প্রে হয়ে যেতে এটা পুরস্কার পেয়েছিলুম আমি। এতদিন পরিনি, ভাবলুম রাজ-পরিষদবর্গের সঙ্গে চলেছি—এখন চালিয়ে দিলে হয়তো চলতে পারে। তা নইলে জীবনে এটা পরার সুযোগই আর হত কি না সন্দেহ।

—তা বেশ, তা বেশ। মন্দ দেখাচ্ছে না তোমায়, আমার আসাম দেশের শ্যালকের সঙ্গে কোথায় একটু আদলও আসচে যেন।

'হুজুরের' সঙ্গে যখন অলকের স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে চলেছিল এমনিতর আলাপ, তখন সেই ফাঁকে কর্ত্রীঠাকুরাণী কর্তার কথার আর হাসির কেন্দ্রটিকে কখন সবার অলক্ষ্যে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন তা কেউই জানতে পারেনি। কিন্তু কর্ত্রীর মনে ঐ লম্বা লিক্‌লিকে লোকটার বড় বড় রুক্ষ এলোমেলো চুল, উদাস উড়ো-উড়ো চাউনি, তার উপর অদ্ভুত ভেলভেটের ঐ পোশাক, সব শুদ্ধ যেন একটা রহস্যের গেরোর মত দুলতে লাগল—যার সম্পর্কে আরো জানবার একটা অহেতুক জিজ্ঞাসা, কৌতূহলের সঙ্গে জড়িয়ে, জট পাকিয়ে তোলে অন্তরের অন্দর মহলে।

অলক কিন্তু দাস দাসী কর্মচারীর চক্র-ব্যূহ ভেদ করে তখনো হদিস করতে পারেনি ও'কে—অলকের সঙ্গে প্রথম চোরাই চোখের চোখাচুখির চকমকি জ্বলল তখন, যখন থার্ড বেল বেজে গেছে, গাড়ি চলতে শুরু করবে আর কি! অলক তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ির কামরায় এগুতে যাবে···ঠিক এমনি সময় ট্রেনের জানলার ফ্রেমে মুখখানা—মালুম হল যেন স্টাউইট্‌সের আঁকা অজানা দেশের

রাজকন্যার একটি নিখুঁত ছবি। ভিড় ভেঙে ঢুকতে যাচ্ছিল কম্পার্টমেন্টে—কিন্তু ও' ভিড়ের মধ্যেই থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে গেছে অলক, বাংলাদেশে এ-মুখ মিলল কি করে? যেন যবদ্বীপ থেকে তুলে আনা একটি জুঁইফুলের কুঁড়ি। স্টাউইট্সের আঁকা জাভা কিংবা বলিদ্বীপের নৃত্যরতা একটি রাজকন্যা, শুধু মুখখানি ছিঁড়ে নিয়ে কে যেন এঁটে দিয়েছে এখানে—সেইরকম একটুখানি নাকে কুঁচো হীরের মাঝখানে ঘোর সবুজ রংয়ের পান্নার নাকছাবিটি, কানে হীরের টপ্—সারা মুখখানা যেন মোমের তৈরি মোলায়েম! যার মধ্যে জীবন আছে কিনা আচমকা জিজ্ঞাসা জাগে। শুধু অ্যাগ্রেসিভ্ ডগ্‌ডগে লাল ঠোঁট দুটি, আর বাদামের মত চোখে—চাকু ছুরির মুখাগ্রভাগ মনে পড়িয়ে দেয়।

অলক কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়েছে তখন। প্রাইভেট সেক্রেটারি, তাই পাশের সেকেণ্ড ক্লাস কামরাখানা দখল করার অধিকারী হয়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস্ থেকে হুজুরের কখন আবশ্যক হয় তার ঠিক নেই তো—যাতে জানালা দিয়ে ডাকলেই সাড়া পাওয়া যায়, তাই এই ব্যবস্থা।

অলক চলন্ত গাড়িতে। ও'র চিত্তে তখনো জ্বলন্ত অঙ্গারের মত কর্ত্রীর ঐ ঠোঁট দুটো জ্বলছে। ও' তখনো যেন বুঝে উঠতে পারছিল না ঐ মুখের মধ্যে ওটা ঠোঁট, না কাব্যে যাকে পুষ্পধনু বলা হয় তাই—যার মধ্যে থর-থর চুম্বনের সহস্র শর দম আটকে দাঁড়ানো—কালিদাসের কথায়, বিশ্বের বাসনা বহ্নি বেঁটে বসান হয়েছে যেন, ও-ঠোঁটে।

লিপস্টিকের লাল হল্কায় সত্যি যেন লক্ষ অগ্নিবাণের লালসা হলাহল হয়ে হাঁপাচ্ছে।

অলকের মনের সর্বাঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন। দেশে ফেরবার সময় জাহাজে থাকতে যে বড় প্রতিজ্ঞা করেছিল আর না—অপদার্থ শরীরসর্বস্ব জন্তুগুলোর উপর আসক্তি হারিয়েছে ও', এসেছে অরুচি—কোথায় গেল সে প্রতিজ্ঞা, কোথায় গেল সে অনাসক্ত সাধু আত্মা! বুদবুদের মত ফেটে গেল পুরুষকারের সব প্রচেষ্টা, মোহিনীর একটি ছোট্ট মহোময় ফুৎকারে! গাড়িতে বসা আলকের মানস চক্ষে ভাসছে তখনো সেই মুখ—সে মুখের ভ্রূর এক একটি করে অনাবশ্যক কেশ উৎপাটনে হয়েছে তা ঋজুরেখার মত সূক্ষ্ম, তার উপর আবার অতি সযতনে আইব্রাউ-পেনসিলের নির্ভুল দাগায় করা হয়েছে তা নিখুঁত—সেই সরু ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ দুটির তলায় কাজল দিয়ে টেনে দেওয়া বেঁকানো চোখে যেন আকাশের অতৃপ্ততা, তাতে পলক পড়লে বোঝা যায়, কি অদ্ভুত মৃগয়া-মত্ততায় মাতাল ও-চাহনি। অলকের মনে হল, ও-ওষ্ঠের ইঙ্গিত ও' যেন চেনে, ও-আঁখির ইশারা ওঁর মুখে না আসলেও, মনে পড়েছে···সারা কপালে চন্দনের চালচিত্তির, খোঁপায় ফুলের থোপার ঝুমকো। গায়ের রং? যেন চাঁপাফুলের পাপড়িগুলো পরপর সাজিয়ে তৈরি—নিশ্চয়ই তেমনি নরম, তেমনি 'নাজুক'।

সেই বারেক আধেক দৃষ্টিতেই অলকের মনে হল—যেন পুরোনো হয়ে যাওয়া হাতির দাঁতে অজানা কোন ওস্তাদ কারিগরের অপরূপ কারুকার্য খচিত একটি বিচিত্র পুতুল! যেমনি তার তৈরির নিপুণতা, তেমনি তাতে রকমারি রং-এর রামধনু—সে মূর্তি যেন ছোঁবার নয়, তুলোর বাক্সয় তুলে সে মূর্তি ও'র মনের আজব আলমারিতে আটকে রাখার উপযুক্ত।

বাংলাদেশে অলক তো এতদিন বাদে সবে পা দিয়েছে। ও-চেহারার অদ্ভুত চমৎকারিত্বে অনেক বোনেদী বাংলাদেশের-এক-নাগাড়ের-বাসিন্দারাও হাঁ হয়ে যেত। মেক্‌আপ্‌-এর অমন পারিপাট্য—কপালে চন্দনের আলিম্পন, কাজল-কালো চোখ, আবার ভ্রূতে আইব্রাউ-পেনসিলের পোঁচ, অধরে লিপস্টিক লেপা! প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের প্রসাধন সামগ্রীর অপরূপ ছন্দিত সমাবেশ ঐ শরীরে, অথচ কোথাও গরমিল একটুকুও গলা উঁচিয়ে নেই! কিন্তু কি করে সম্ভব হল? সকলের মনে এ-কৌতূহল জাগা কিছুই আশ্চর্যের নয়, সবার উপর ঐ-চেহারা বাংলাদেশে এল কোথা থেকে!

অলক সিংহ চৌধুরীদের সিং-দরওয়াজায় সবে পা গলিয়েছে, ও' কি করে জানবে যে কথায় বার্তায় চালে চলনে নিছক বাঙালী বনে গেলেও সিংহ চৌধুরীরা জাতে ক্ষত্রিয় হওয়ার দরুণ, আর বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় জাতি না থাকায়, বিবাহ ইত্যাদি নানা প্রদেশের ক্ষত্রিয় রাজা জমিদারদের সঙ্গেই সাধারণতঃ সমাধান হয়ে থাকে এঁদের, এবং এখানকার এই কর্ত্রীঠাকুরাণী নবমঞ্জরি দেবীও আবার হচ্ছেন আসামের বিলাসীপুরের রাজকুমারী। নবমঞ্জরি দেবীর মা হচ্ছেন আবার নেপাল-রাজ্যের দুহিতা। তাইত চেহারায় অমন বর্মা-বলি-যবদ্বীপের এক মোহময় স্পর্শ! তারপর, বাংলাদেশে বিরল—প্রসাধনে ঐ চন্দন-কাজল থেকে লিপস্টিক আইব্রাউ-পেনসিলের প্রাচুর্য, আত্মীয়তাসূত্রে শ্রীপুরা রাজপরিবার থেকে পেয়ে এই পরিবারেও প্রচলিত হয়ে গেছে। কারণ, কর্তার ঠাকুরমা ছিলেন আবার শ্রীপুরা রাজ্যের। এই সব পরিবারে এই প্রসাধন-চর্চাকে সাধারণতঃ 'শিঙার' বলা হয়—সমবয়সী সখী পরিবেষ্টিত হয়ে আরশি, সুগন্ধ সামগ্রী, আর নানা পুষ্প-রেণু সমবিব্যাহারে

নিত্য সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। এঁদের এই প্রসাধন-পর্ব যে বহু সময়সাপেক্ষ এ কথা বলাই বাহুল্য—প্রসাধন-চর্চায় এইরূপ সময় ক্ষেপন করা রাজা অথবা জমিদার পরিবারের অপর্যাপ্ত অবসরেই শুধু সম্ভবপর।

পুরোনো অন্যান্য আমলাদের চেয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারির পদমর্যাদার দরুণ, আর কতকটা আবশ্যকের তাগিদে, এই নতুন-বহাল অলকের—ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে স্থান পাওয়া রূপ পার্থক্যে অনেক বাস্তুঘুঘুদের হৃদয়ে এরই মধ্যে হিংসার ঘুন্ ধরতে শুরু করলেও কর্তার মেজাজ অলকের উপর বেজায় খুশ্।

কর্তার ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের লাগাও অলকের সেকেণ্ডক্লাস 'কুপে'খানা কপালক্রমে বিলকুল খালি, রিজার্ভ না থাকলেও কোন ব্যক্তির পদার্পণ ঘটেনি তাতে। ও' জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এই ট্রপিক্যাল্ আকাশের পিরিচে ধরা টাট্‌কা বাতাস, ধান ক্ষেত আরামসে চুমুক দিতে শুরু করেছে—হঠাৎ নজরে পড়ল পাশেই ফার্স্ট ক্লাস জানলার ধারে সেই মুখ! ফুলের মত ফুটে, একটি হাত বাইরে বের করা—সাপের মত সরু, তুলছে বাতাসের দোলায়, কি অদ্ভুত ভঙ্গিমা সে হাতের! আর মুখ? সে মুখ কাত হয়ে যেন ও'র দিকেই চেয়ে আছে। কি চায় ও'? দুরন্ত বাতাসের দাপাদাপিতে এলিয়ে আছে ও'র এলো খোঁপা।

হয়তো বা আছে এলিয়ে, হয়তো বা নেই—মুখের উপর উপচে পড়েছে এলোমেলো চুলের দু-চারটে ভীরু গুচ্ছ। সে মুখ এত কাছে ও'র, যে অলক হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলেই ধরতে পারে, পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। ফুলের মত সত্যিই যদি ও' ছিঁড়ে নিতে পারতো ওখান থেকে ও'কে, ছিনিয়ে নিতে পারতো...

অলক এইকথা ভাবতে ভাবতে কখন নিজের অজ্ঞাতসারে হাতটা বাড়িয়ে আল্‌টপ্‌কা জড়িয়ে ধরেছে ও'র হাতটা—তা ও' নিজেই জানতে পারে নি। কিন্তু ধরার সঙ্গে সঙ্গেই ধারণা হল—বুঝল বুকের মধ্যে বিদ্যুতের সে কি সাঙ্ঘাতিক শিষ! পায়ের নখ থেকে মাথার কেশাগ্রভাগ অবধি দেহের তমিস্র বিদীর্ণ করে শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ তা কেঁপে। সময়ের জমিন্ মনের তলা থেকে সরে গেছে, করেছে কখন পাতাল-প্রবেশ! হুঁস হতে সংযমের সাঁড়াশি দিয়ে অলক টিপে ধরল নিজের টুঁটি, তারপর হাতটা আল্‌গা করে দিয়ে স্থির চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললে: "সাবধান, হাতটা ভিতরে রাখুন, হঠাৎ আঘাত লাগতে পারে।"

নিমেষে ঝটকা টানে অমনি হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল—যার আওয়াজে তন্দ্রামগ্ন কর্তা উপরের আপার-বাঙ্ক থেকে ঘুমের ঘোরেই চমকে উঠলেন, তারপর জড়ানো গলায় টেনে টেনে অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—"কি পড়ল দেখো তো, নবিনা।" নবমঞ্জরির শর্টকাট আদরের নামকরণ ওটা। ও-নামে আহ্বান এলে মেজাজের ব্যারোমিটার 'দিল-দরিয়া'র দাগে আছে বোঝা যায়।

উত্তরে নবমঞ্জরি দেবী বললেন: "বড্ড বাতাস আসছিল, তাই জানালাটা নামিয়ে দিলুম। ওগো, উঠে বস না, এই অবেলায় ঘুমচ্ছ কেন?"

উত্তর দেবে কে? উত্তর দেওয়ার মালিক ততক্ষণ উত্তর না দিয়েই পাশ ফিরে গভীর নিদ্রায় গা এলিয়ে দিয়েছেন।

কত ছোটখাটো স্টেশনে না থেমেই পেরিয়ে গেল গাড়ি। বড় স্টেশনে থামল হয়তো কিছুক্ষণ। আলোর ঝালরে, অন্ধকার অনেকক্ষণ নামিয়েছে তার ঢাকনা। কামরার একপাশের বাতিটা জ্বালিয়ে নবমঞ্জরি মাসিক বসুমতীটা টেনে নিয়ে নিবিষ্ট মনে একটা গল্পও প্রায় শেষ করে এনেছে। এবার থামল গাড়ি একটা বড় স্টেশনে। এখানেই ডিনার খেতে রেস্টুরেণ্ট-কারে যাবার সময়—এই স্টেশনে রাতের খাবার সমাপনের যা কিছু ব্যবস্থা—সেইজন্যে থামেও অনেকক্ষণ গাড়ি।

বয় বাবুর্চির ছোটাছুটি মাঝে মাঝে বিড়িওয়ালাদের বিকট চিৎকার, তারপর 'হিন্দু পানি' 'মোসলেম পানির' বহুবিধ গোলমালে—আওয়াজের বহুরূপীর বগ্‌লস্ গেছে ছিঁড়ে! এবার কর্তার সত্যিই ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বাঙ্ক থেকে মুখ নীচু করে বললেন—"অলককে বলোনা একটু চেঁচিয়ে, আমাদের খাবারটা এইখানেই দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে, আর ও'কেও কামরাতে আসতে বল—খাবার সময় যদি লোক না থাকে কাছে, আর 'বক্‌বাজি' না হয় একটু, তবে ব্রেনটা বিলকুল বোকা বনে থাকে—খাওয়াটাও যুৎসই হয় না।"

...ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। কর্মচারীকে নিয়ে এক কামরায় বসে বকর বকর বরদাস্ত করা কাঁহাতক পোষায়?—অসহ্য এইসব আস্কারা, ও'র বাপের বাড়িতেও তো সেক্রেটারি আছে, কিন্তু ক'বার তারা মনিবের দর্শন পায়! কাছারিতে কাজের সময় যা একটু দেখা-শুনো, তাও বসে নয়, সব সময় জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকাই তাদের কায়দা। কি অদ্ভুত এদের আদব-কায়দা! স্পর্ধা আর আস্কারায় এদের লোকগুলো অসহ্য অসভ্য। শিক্ষিত হলে কি হয়, এক গেলাসের ইয়ার্কিতে অভ্যস্ত কর্তা থেকে নিম্নতম কর্মচারী সবাই সমান—বেয়াদপিতে সবাই

এখানকার বেগাড়া। কিন্তু উপায় কি? ঘোমটায় ঘাড়েল ভারতবর্ষের আদর্শ নারী, স্বামীর হুকুম বিনাবাক্যে পালনের দিক দিয়ে ঝি-চাকরের চেয়েও অধিক কর্তব্যপরায়ণা। যত অসুবিধাই হোক কর্তার হুকুমে 'না' বলবার ক্ষমতা তাদের নেই।

নিরুপায় নবমঞ্জরি দেবী নতুন করে জানলা খুলতেই বুকটা তাঁর কিসের জন্যে দুলে উঠল তা ভগবানই জানেন—কিন্তু দুলে যে উঠেছিল একথা অস্বীকার করা চলে না। নীড় থেকে বেরিয়ে আসা ভীরু পাখীর মত বুকটা জানলার উপর নিষ্ঠুরভাবে চেপে নিজেকে শক্ত করে নেন নবমমঞ্জরি দেবী, তারপর মুখটা বাড়িয়ে দিলেন কম্পার্টমেণ্টের বাইরে। প্ল্যাটফর্মের ঝাপ্‌সা আলোয় দেখতে পাওয়া গেল অলক ও'র কামরার জানালার ধারে ঠিক সেই অবস্থায় তেমনি চেয়ে আছে যেন ও'রই চোখের দিকে—ও' কি সত্যি এখনো ও'র দিকেই চেয়ে?…

ভূমণ্ডল ভ্রুক্ষেপ-না-করা সে চাহনি, মঙ্গলগ্রহের মত অনাদিকাল ধরে যেন তাকিয়ে আছে পৃথিবীর মুখের পানে—তেমনি স্থির, অপলক, জ্বলন্ত—যার অদ্ভুত আকর্ষণের আড়ালে আছে সব কিছু নিঃশেষে শুষে নেওয়ার দুরন্ত দাবাগ্নি। নবমঞ্জরি সারা শরীরটায় অলককে দেখতে দেখতে একটা অতৃপ্ত ইশারা, দুর্নিবার আকাঙ্খা যেন নিঙড়ে তুলতে লাগল ও'কে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে। ও'র সারা সত্তাটাকে কে যেন মুঠোর মধ্যে পুরে আস্তে আস্তে মুচড়ে মারার মতলব করছে—অনুভব করল, ও'র দম আটকে আসছে যেন। দেখতে দেখতে সত্যি সত্যিই ও'র গলাটা একটা অকথিত তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল, জিবটা আঠার মত টাকরার সঙ্গে যেন এঁটে ধরেছে অকস্মাৎ অস্বাভাবিকরূপে—ও' চিৎকার করে উঠল: "জল, জল।"

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ও' চমকে উঠল, চেতনা ফিরে এল

যেন ও'র কাছে। ও' অলককে খুঁজছিল কিন্তু দেখতে পায়নি এতক্ষণ, এমনি একটা ভঙ্গিতে বললে : "এই যে আপনি, আপনাকেই দরকার, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জ-অ-ল।"

"—জল?" এই বলে অলক চিরন্তন জিজ্ঞাসা-চিহ্নের ভঙ্গিতে ঘাড়টা বেঁকিয়ে চাইল ও'র মুখের পানে।

চন্দনের চত্তর ফুঁড়ে নবমঞ্জরি দেবীর কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, তবু তিনি যথাসম্ভব স্বাভাবিকতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সজাগ হয়ে বললেন—"আচ্ছা, লেমনেড হলেও চলবে। হ্যাঁ, আর খাবারগুলোও এইখানে গাড়িতে দিয়ে যেতে বলবেন, আর আপনাকে এখানে আমাদের কম্পার্টমেণ্টে আসতে বলছেন।"

অলক এর উত্তরে ও'র চোখের উপর নিজের নির্ভীক নজরকে নিষ্ঠুর নগ্নতায় নিশ্চিন্তরূপে নিক্ষেপ করে বলল—"যে আজ্ঞে।"

নবমঞ্জরি দেবী অলকের এই একান্ত নম্রতা যেন ভালো মনে নিতে পারলেন না, বরঞ্চ আবিষ্কার করলেন ও'র উপরের ঠোঁটের একটা ঈষৎ মচকানো অভিব্যক্তি। সেটা কি তাচ্ছিল্যের, না উপেক্ষার, না ও'র মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার অহমিকা? না, কথা বলতে গেলে উপরের ঠোঁটের ঐ মুচকে ওঠা ভাব ও'র একটা স্বাভাবিক মুদ্রাদোষ? এমনিতর নানা সন্দেহে দোল খেয়ে আবার জানলাটা জোরে বন্ধ করে দিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, "এই অদ্ভুত আদমীটার সঙ্গে জীবনে আর কোন কথাবার্তার মধ্যে মরে গেলেও তিনি আর যাচ্ছেন না।

অকস্মাৎ ব্রিজের উপর ট্রেনের পদক্ষেপনের প্রবল প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। দূরান্তে দিক্‌চক্রবালে ভোরের ভৈরবীর বিলম্বিত আলাপ আরম্ভ হয় বুঝি! রাতের আকাশে সত্যিই সোনালী আলোর চক্ষু চোখ মেরেছে।

মহানদীর উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে—সে নদীর বিপুল বপু বিরাটদেহী সরীসৃপের মত।

ট্রেন চলেছে কোন অজানা প্রেয়সীর অভিসার উন্মাদনায়, পিছন ফিরে তাকাবার অবসর তার একদম নেই।

অলকের ঘুমটা হঠাৎ হুমড়ি খেল, চোখ মেলতেই দেখল তন্বী নবমঞ্জরির ক্লান্ত কায়া, ছায়ার মত উষার অস্পষ্ট আলোয় সামনের লোআর-বাঙ্কটায়। কাঠের দেওয়ালটায় ও'র দেহটা হেলানো, হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে, মুখটাও একপাশে অল্প একটুখানি হেলিয়ে—যেন জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখতে দেখতে আলগোছে বসে বসেই বুঝি এই এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়েছে। বালিশটা কখন ঘাড় থেকে সরে খসে পড়ে গেছে মাটিতে, কঠিন কাঠের দেওয়ালের বুকে ঐ নরম মুখটা, ট্রেনের দোলায় বার বার ধাক্কা খাচ্ছে; নিশিথিনীর নিঃশেষিত আয়ুর মত অপূর্ব সে মুখ, যেমন ক্লান্ত, তেমনি নতুন সম্ভাবনার দীপ্তালোকে উদ্ভাসিত। হাওয়ায় এলিয়ে গেছে আঁচল। বডিস্ বিদীর্ণ করে, ফেটেপড়া আনার-কলির মত ও-বুকের ব্যাকুলতা, নিখিলের যৌবন-নিকুঞ্জে যেন ভোরাই পাখী—পক্ষ বিস্তারের জন্যে পাগল!

অলক অকস্মাৎ চমকে উঠল—অ্যাঁ! এ যে কর্তার ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট, স্তূপীকৃত স্যুটকেসগুলোর পিরামিড-মার্কা পিঠের উপর বসে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ক্রমাগত দোল খাচ্ছে···ও'কি সারারাত এইখানে এই রকম ভাবেই কাটিয়েছে? ছিঃ ছিঃ! না, মাতলামি ও' করেনি, তার আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও' নিশ্চয়ই। ও' কি করবে? ও'র কোনই দোষ নেই। গত রাতে সেই ডিনার আসার সঙ্গে সঙ্গেই নবমঞ্জরিকে শুনিয়ে কর্তা শরীরে জোরো ভাব হওয়ার ছুতোয় 'একটুখানি', খাবার নামে 'ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোআইটের' বোতলটা বের করার পর, সেই যে 'পাতিয়ালা পেগ' আরম্ভ হল···সঙ্গে সঙ্গেই ও'কেও জোর জবরদস্তি করে খাওয়াতে শুরু করলেন। সে খাওয়ার যেন শেষ নেই, অগস্ত্য মুনির গণ্ডুষ করার মত সুরার সমুদ্র নিমেষে নিঃশেষ হল বুঝি—সমুদ্র-মন্থনের সমস্ত গরল যেন ও'রই গলাধঃকরণের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে—নির্জলা নিট্ হুইস্কি। একটার পর একটা বোতল—সে যেন ফুরোতে চায় না। তবে এইটুকু মনে আছে, বেহুঁস হবার আগেই হুঁস করে এই ট্রাঙ্কগুলোর উপর চড়ে বসেছিল, আর কর্তা নাছোড়বান্দা উপরের বাঙ্কে উঠতে গিয়ে নেশার ঘোরে সেই যে নীচের বাঙ্কটায় উল্টে পড়েছেন—এখনো সেই অবস্থায়! হয়তো মধ্য রাত্রের অন্ধকারে নবমঞ্জরির দেহের উদ্দেশ্যে একটা লোলুপ হাত প্রসারিত করেছিলেন কিন্তু পৌঁছতে না পেরে বাঙ্কের এক পাশে এখনো সেটা বেরিয়ে আছে অনেকখানি।

নাঃ, অলক মরে গেলেও মাতলামি করবে না—করেও নি। ও' বেশি মদ খেলে গুম্ খেয়ে যায়—বোম্ ভোলার মত মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোয় না ও'র তখন—পাথরের মত অসাড়, প্রাণহীন হয়ে পড়ে, কিন্তু কর্তা ও ঠিক আবার উল্টো, তাঁর সাধারণতঃ অবনম্র অচেতন মন, মদের আস্বাদে মুক্তি পেয়ে উন্মাদ আনন্দে উপরে উঠে এসে তা-তা থৈ-থৈ তাণ্ডব লীলা শুরু করে দেয়।

পুরুষত্বের প্রয়োজন ঘটলে কিংবা অপরিপূর্ণ বাসনায় নপুংসক-ক্লীবরা হয়তো অশ্লীল উক্তিতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের আনন্দ আস্বাদ করলেও করতে পারে, কিন্তু আমাদের এই কমবয়সী কর্তাটির পক্ষে নিজের সদ্য-বিবাহিতা অপূর্ব যৌবনময়ী তৃষ্ণার্তা স্ত্রী সামনে রেখে; অলকের মতন মাত্র ক'দিনের নতুন-বহাল একজন কর্মচারীর উপস্থিতিতে অবদমিত আসঙ্গ ঈপ্সার পঙ্কিল ক্লেদ, আর নারীদেহের প্রতি শৃঙ্গারজনক ইতর ইঙ্গিত উদ্গার করা—শুধু অশোভন নয় মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও অস্বাভাবিক সন্দেহজনক নয় কি?—অলকের মনে হঠাৎ যেন একটা খট্‌কা লাগল।···সবে বিবাহিত এঁরা, অর্থের অকুলানে রোমান্সের রাজত্বে দুশ্চিন্তার ভাঁটা পড়বার মতও ভাগ্য নয়, তবু হাইফেনের মত কামরায় ও'কে ডেকে আনার কি আবশ্যক—এত মদ্যপানেই বা কি লাভ? ও' আন্দাজেই যেন অনুভব করল ও' না থাকলে, একজন না একজন কেউ ও'র জায়গায় কর্তার হুকুমে হাজির থাকতে বাধ্য হত এখানে।—কোথায় যেন কি একটা···

চুলোয় যাকগে, পরের চরকায় তেল দিয়ে ও'র লাভ কি? ডি-মরালাইজ্‌ড্‌ এই ফিউডাল্‌ ক্লাস—পাল্লায় পড়েছি যখন, বরদাস্ত করা ছাড়া উপায় আছে কি কিছু? তবু বারবার ও'র মনে হতে লাগল নবমঞ্জরির মুখের সামনে আজ সকালে একটু বাদে দাঁড়াবে কি করে? নাইবা করল ও' মাতলামি, মানলুম—যতই মদ খাক মহিলার সামনে ভব্যতা বজায় রাখতে ও' ভাল ভাবেই জানে। তবু ও'র মনটা ক্রমাগত গত রাত্রের ঘটনা স্মরণ করে গোলাতে লাগল—কর্তার সঙ্গে এক সঙ্গে কেন গবেটের মত মদ খেতে গেল? আইনে বলে এডিং ও অ্যাবেটিং-এর জন্যেও একটা চার্জ গঠন করা যায়। কিন্তু এখানে অলকের কি দোষ—ও' তো আগাগোড়াই অনিচ্ছুক ছিল।

এখানে যা ঘটেছে সে তো নিছক কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ও' তো শুধু ক্রীড়নক মাত্র।

নবমঞ্জরির দেহটা এবার নড়ে উঠল যেন···ও'র ঘুমে-ভরা চোখের পল্লব ছুটি ভারি পর্দার মত আস্তে আস্তে ওপরের দিকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ও' দেখল অলককে, বাক্স আর স্তূপাকার স্যুটকেসের ওপর চড়ে, ট্রেনের দোলানিতে দুলতে দুলতে অলক যেন 'রোপট্রিক' দেখাবার রিহার্সল করছে।—ও কি! অলকও যে চেয়ে, নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ও'রই নয়নে! ও'কি তবে সারারাত ঘুমোয়নি—জেগে? গত রাতের নেশা নিঃশেষে মুছে গেছে—সে চোখে মদালস মন্থরতার মালুম মাত্র নেই। যেন সারারাত বোতল থেকে নিছক সাদা জল খেয়েছে এমনি একটা ভাব। নবমঞ্জরির নয়নে অলকের সে দৃষ্টিতে মনে হলো যেন দাঁড়ি নেই—দিগন্ত দগ্ধকরা একটা একটানা দাহ। শিকারের বুকে সাপের সম্মোহনের মতই ফাঁদ পাতা সে দৃষ্টি, দুলতে লেগেছে নবমঞ্জরির মঞ্জরিত দেহলী ঘিরে—যার নাগপাশ ও'র মনের আগাগোড়া গতরখানা ঘিরে, ঘুরে ঘুরে ও'কে আস্তে আস্তে আত্মস্থ করতে আরম্ভ করেছে। সে দৃষ্টির নিষ্ঠুর মুঠোয় ও'র এতদিনের শৃঙ্খলিত উপবাসী শরীর আর শ্বশুরবাড়ির বিকৃত আবহাওয়ায় বিদ্রোহী দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত অসহায় অন্তরাত্মা মেলে দিয়ে মূর্ছিত হয়ে যেন গুণতে লাগল মৃত্যুর মত সেই পরম মুহূর্তটির পদধ্বনি।

মিনিটের মিছিলগুলো সময়ের সুড়ঙ্গ ভেদ করে ছুটেছে ট্রেনের মতই। তাদের চাকাগুলো গড়িয়ে চলেছে, চলছে গড়িয়ে আওয়াজ-হীন নিস্তব্ধতার নিঃসীম পাথার বেয়ে···

অলকের চোখ—নবমঞ্জরির মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন অজান্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বুজে গেছে তা ও' নিজেই বুঝতে পারেনি। ও'র বোজা চোখে নবমঞ্জরির এই নতুনতম মুখের বিরাট পটভূমিকায় যেন হাজির হয়েছে তখন অতীতের অজস্র স্মৃতির স্বপ্ন! অবাস্তব শোভাযাত্রার তন্দ্রার তমিস্রা-তীর্থে ভীড় করতে শুরু করেছে তারা—কত লোক, কত পরিচিত বন্ধু, কত প্রিয়তমা ক্ষণিকের প্রেয়সী—অজস্র জনের চেহারা ভেসে ভেসে এসে মিলিয়ে যেতে লাগল।

জীবনটা সত্যিই তো একটা আজগুবি ছায়াচিত্র—কত মিথ্যা, অথচ কত সত্যি! এখানকার দুঃখ, বেদনা, সুখ, স্মৃতি, সব কিছুই কত সত্যি, অথচ কত মিথ্যা! এই বিচিত্র পৃথিবীকে অলকের চেয়ে বিচিত্রতর রূপে কে বোঝবার দুঃসাহস রেখেছে? এখানকার সবই সাময়িক, সবই আপেক্ষিক, তবু চিরন্তনতার কি চমৎকার সুরভিত মোহের পাউডার প্রলেপ এর প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গে। তাই তো জীবনের পলাতক মুহূর্ত-গুলোর উপর জমায় এত মমতা।

অলকের এখানকার সব কিছুর ওপর অননিধারা অসামান্য ঔদাসীন্যের জন্যেই তো, অসাধারণ অধিক আকর্ষণের অধিকার একমাত্র ও'রই আছে। অলক যে বোঝে, এই পৃথিবীর কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই, কোন কিছুরই কোন স্থিরতা নেই, তাই তো প্রত্যেকটি অণুকণার মূল্য—অমূল্য; প্রত্যেকটি মুহূর্তই এখানকার পরম-মুহূর্ত। অলক মর্মে মর্মে এই মর্ম-কথার সারমর্ম উপলব্ধি করে বলেই কমলানেবু আকৃতির পৃথিবীটার খোসা ছাড়িয়ে কমলানেবুর কোয়ার মত তার প্রত্যেকটি কোয়া চিবিয়ে চুষে ছিব্‌ড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আপসোসহীন চলে যেতে চায়—ছিব্‌ড়ের দিকে ফিরে তাকাবার সময় তার কোথায়?

অকস্মাৎ অলক দেখল—ও'র স্বপ্নের মধ্যে সমাগত ওই স্মৃতির

ভীড়ের থেকে সুমুখে এগিয়ে এসেছে যেন ওই মেয়েটি কে? বর্ষার ঢল-নামা আকাশের মত আতুর, লাবণ্যে লচ্‌কানো 'লয়লি' যেন! ঋজু রোগা রোগা গড়ন, গোল চাঁদের মত কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের টিপ, মাথায় আবার ঘোমটা দেওয়া, কে ও'? ভাল-লাগা-কোন-বহুদিন আগের-ভুলে-যাওয়া সুরের মত মিষ্টি, মনে হয় যেন চেনা চেনা···একি, আবার গড় হয়ে এ-যে প্রণাম করতে চায়!

শ্যাম-লী, শ্যা-ম-লী না? এখানে তুমি, তু-মি!!!

—হ্যাঁ, চিনতে পেরেছ দেখছি!

—কত বছর মাঝখান থেকে অতীতের তলায় তলিয়ে গেছে, না? কত, কত দিনের আগের ও-চেহারা, ছেলেবেলার স্মৃতির মত আবছা ঠেকছে চোখে, যেন মনে করতে পারছি, পারছিনা-ও।

—তুমি আমায় এত ভালবাসতে তবু এরি মধ্যে, মাত্র এই পনেরটা বছরের মধ্যে আমি আবছা হয়ে এসেছি তোমার কাছে, এত শিগ্‌গির ভুলে যেতে পেরেছ?

—তুমি তো জানো না, আর জানবেই বা কি করে? আমি যে সাধনা করে 'ভুলে যাওয়ায়' সিদ্ধিলাভ করেছি। লোকের প্রশংসাই ভুলে যাই কত সহজে, শুনলে অবাক হবে! গালাগালি, সে তো বেমালুম গায়েই লাগেনা। কত সহজে ভুলে গেছি ভালবাসা—আর বিরহ? বিরহের বানানই হয়তো বা আর করতে পারবো না। রাগ আর অনুরাগের সে জলুস, সে রং আর নেই—জং ধরে গেছে সব কিছুতে। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে ভুলে গিয়ে খুঁজতে বেরোই আজকাল। তবে, তোমার চেহারা ভুললেও, তোমাকে আমি ভুলিনি শ্যামলী!

—ওগো বলোনা, কেমন আছ?

—কেমন আছি? দাক্ষিণ্যের মত ভাগ্যের দক্ষিণ দুয়ারে দাঁড়িয়ে

এইরকম জিজ্ঞাসার দরাজ-পনা নাই বা দেখালে—লাভ আছে কিছু? কেন ভাল ছাড়া, খারাপ দেখছ নাকি?

—তোমার কথাগুলো ঠিক তেমনি আগের মতই—এলোমেলো অদ্ভুত, বুঝি—আবার বুঝিনা-ও। আমি মফস্বলী মুখ্যু মেয়ে, তোমার কথা বোঝার বুদ্ধি কোথায় খুঁজে পাবো? তুমিই যেটুকু আমায় মানুষ করেছিলে—তবে তোমায় চিনি—এত বেশি চিনি, যে তোমার কথার মানেগুলো বুঝতে না পারলেও আঁচ করতে পারি। এবার একটা বিয়ে করো, দেখাশোনার লোকের তো দরকার। বিদ্বান মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে—যে তোমার কাজে লাগবে। এক যুগের ওপর কাটিয়ে দিলে তো ভবঘুরের মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে—এবার আবার নতুন করে সংসার পাতো, এপার থেকে তোমার ওপারের সংসার দেখে হিংসে হলেও মন্দ মজার লাগবে না দেখতে—জান তো সতীনের ঘর স্বপ্নেও আমাদের অসহ্য—তবু—তবু—

—বিয়ে! বিয়ে! একটি বছর—কি তারও কম ছিল বিবাহিত জীবন আমাদের, না?

—কেন?

—তাই বলছি, আজীবন যে ঘরের ওপর [illegible] করে এসেছি সেই ঘর-বাঁধার নেশার ঘোরে মনে পড়ে, কি ঘুরপাক না খেয়েছি একদা তোমার জন্যে। অতীতের সব কিছু পিছনে ফেলে, বর্তমানকে বিলকুল উপেক্ষায় উড়িয়ে, স্নেহ, মমতা, আত্মীয় পরিজন, সকলকে পরিত্যাগ করে, তোমার কাছ থেকে সব কিছু পাওয়ার দাবি, নেওয়ার মত্ততায় আমার মনের দু-চোখ ছিল অহঙ্কারে অন্ধ, ধরাকে সরা জ্ঞান করলুম। তারপর হঠাৎ সেই তুমিও একদিন সরে পড়লে আমার কাছ থেকে।

—দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, বারো বছর বাদে এই তো সবে দেশের মাটি মাড়িয়েছি, খুব জোর মাসখানেক। অজ্ঞাত-বাসের পর্বই এখনো শেষ হল না। হ্যাঁ, মনে পড়ল একটা পুরোনো কথা, ভুলে যাওয়া কথা অবিশ্যি, শুনলে হয়তো হাসবে, তাই বলছি—মজারও মনে হতে পারে—

—কি ?

—তুমি তো আমায় আচমকা আধ-রাস্তায় রেখে সরে পড়লে, আর দোষ হল কার জানো, আমার! তোমার ভাই বললে—তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছি। তোমার বোন বললে, ওষুধপত্রের অভাবেই তুমি অমনিতর তালাক দিতে বাধ্য হলে না কি! হিতকামী উৎসুক বন্ধু-বান্ধবরা আমার সম্পর্কে, নানা আজগুবি আবিষ্কারের আনন্দে আমি যে একটি 'স্যাডিস্ট' এই চরমপত্র প্রচারিত করলেন। বললেন, তোমার গায়ে হীরের পিন্ ফুটিয়ে আমি নাকি পরম আনন্দ উপলব্ধি করতুম—যার যন্ত্রণা তুমি নাকি সহ্য করতে না পেরে শিউরে শিউরে উঠতে! সবার উপরে মজা হচ্ছে, আমার যে-সব আত্মীয়দের কাছে তোমার নাম ইস্তিক অসহ্য ছিল তারাই তোমার অবর্তমানে শোকের উচ্ছ্বাসে উল্টে-পাল্টে পড়তে লাগলেন সব। বললেন, অমন ভালো মানুষ বৌটাকে অমনি করে মেরে ফেললুম নাকি আমি—দেশ বিদেশে ঘোড়দৌড় করিয়ে। গল্প শুনতে মজার লাগছে, না ?

—তারপর।

—তারপর, একদিন নিজেই তোমরে ফোটোগুলো আগুন জেলে এক এক করে সব পুড়িয়ে দিলুম। শোকের আসর না-আহ্বান করে শ্রাদ্ধের আগেই নতুন নারীর ঘনিষ্ঠতায় ঘুরপাক খেতে লাগলুম—আমার ওপর সকলের সব দোষারোপ দাঁড়িয়ে গেল খাঁটি সত্যি হয়ে, সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আমিও বাঁচলুম, নিজের সাধুতা প্রমাণ করবার হাত থেকে অন্ততঃ পেয়ে গেলুম রেহাই।

—তোমাকে যে আমি চিনি ওগো! নিজের বদনাম বাড়িয়ে তুমি যে কি লাভ পাও···এবারে যখন এতদিন বাদে ফিরলে দেশে, একটা বড় চাকরি কর, চৌরঙ্গিতে একটা বড় ফ্ল্যাট ভাড়া নাও, অবিশ্যি আমি যখন ছিলুম সেই গির্জেটার সামনে পোড়ো বাড়িটায়, মনে আছে? সে রকম নয়, ভাল বড় ফ্ল্যাট। আমি যে তোমায় চিনতুম, তোমার মনের জোয়ার-ভাঁটার খবর ছিল আমার নখদর্পণে—তোমার প্রেমে হয়েছিলুম আমি সব কলঙ্কভাগীনী, কিন্তু ও'রা তোমায় বুঝবে না—বুঝবে না, জানি সব সময় ও'রা তোমার ভুলই শুধু বুঝবে।

—আচ্ছা শুনছি, আর গুণছি: চৌরঙ্গিতে ভালো দেখে বড় ফ্ল্যাট একটা, ভালো ক্রকারি কিনা বাসনপত্তর—হল্ অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন, না আর্মি নেভির?—এর যে কোন একটার হলেই চলবে, কি বলো? আর খানসামা, কটা? একটা প্রকাণ্ড রেডিওগ্রাম যে চাই, সেটা যে কই বললে না?

—সব তাতেই তোমার মস্করা।

—ডাল্ রেসপেক্টেবল্, ভোঁদা-মার্কা ভদ্দরলোক হওয়া ইহজীবনে আর সম্ভব হল না, কি করব? পরজন্মে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ভদ্দরলোক হবার চেষ্টা করা যাবে এখন। কি বলো? জীবনকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করতে করতে এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে এই বুড়ো বয়সে ও-নেশা সহজে ছাড়া চলে না যে, বোকা মেয়ে বিপদের আলের উপর চলার চাল এমন ভাবেই অভ্যেস হয়ে গেছে যে, বিপদ না হলে, বেদনা না থাকলে, জীবনটা জলের মতই বিস্বাদ ঠেকে।

—একটি মেয়ে আবার এসে দৃঢ় পায়ে দাঁড়াক তোমার জীবনের জমিনে, আমি চাই।

—সত্যি কথা বলতে কি হৃদয়হীন এখনকার সো-কল্ড্ সোসাইটি

মেয়েদের মন্দ লাগে না ; রুপোর শিকলিতে বাঁধা পোষা জন্তুর মত মাঝে মাঝে আদর করতেও আরাম লাগে—কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, বিরক্তি এলেই বেয়ারা দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না।

—তোমার তো সব তাতেই বাড়াবাড়ি ! আদরই বা অত কেন, আবার বের করে দেবারই বা দরকার কি ?

—আচ্ছা শ্যামলী, তোমার মনে পড়ে কি, এইরকম মাদ্রাজ মেলের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চলেছিলুম গোপালপুরে সমুদ্র দেখতে, তুমি আর আমি, সেই হঠাৎ প্লাবনে চিল্কার আগেই রেলের লাইনে হলো ব্রিচ—কি ঝড় সারারাত, ঝড়ের দোলানিতে কম্পার্টমেন্ট দুলছিল দোলনার মত। ঝড়ের ঝুলন-লীলা যেন, ভিরু কপোতের মত—কি ভয় তোমার ! সারা রাত গাড়িটাও স্তম্ভিত হয়ে রইল অজানা আশঙ্কায়, তারপর সকালে দেখা গেল—চারপাশে দিগন্তবিস্তৃত জল আর জল, যার মধ্যে দ্বীপের মত আমাদের গাড়িটা হাওয়ার ঝাঁকিতে থর থর করে কাঁপছে, মনে আছে গাড়ি আর এগুতে পারল না, সব সমেত ফিরে এল কলকাতায়।

—একটু আগেই তুমি যে বড় বড়াই করলে 'ভুলে যাওয়ার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ'—তার নমুনা যদি এই নিখুঁত মনে রাখার মধ্যে হয় তবে···আশ্চর্য ! সত্যিই অত পুরোনো দিনের খুঁটিনাটি কথা কি করে তোমার এখনো মনে রয়েছে ! বুঝি, আজও আমার ওপর কতখানি অভিমান সকলের আড়ালে মুখ বুজে গোপনে তুমি লুকিয়ে রেখেছ। কিন্তু পৃথিবীর পায়ের গতি আটকাতে আস্ফালন ছাড়া আমাদের আর কিছু আছে করবার ? এ কি, সময় যে আমার হয়ে এল, যেতে হবে এখুনি—ছুটি আমার ফুরিয়ে এল, দেখ, দেখ, আবার কারা আসছে—কারা আসছে সব যেন তোমার কাছে—আমি পালাই।

—শাইলা, জেন, এদ্দা সবাই দল বেঁধে, কি ব্যাপার, বোসো বোসো।

—বদমাস তুমি, আমাদের ফাঁকি মেরেছ, জোচ্চুরি করেছ, আমাদের সকলকে তুমি প্রতারণা করেছ। আমরা এসেছি তোমায় শাস্তি দিতে—ঐ নেটিভ মেয়েটা কে? আমাদের দেখে সরে পড়ল। ও'কেও আবার ঠকাবার তালে ছিলে! প্রচণ্ড ভণ্ড একটি তুমি। তোমার ভণ্ডামি আমরা শেষবারের মত ভাঙতে হাজির হয়েছি এতদূর থেকে এসে।

—হে স্বকল্যাণী বরাঙ্গনেগণ, তা বেশ, তা বেশ। ভণ্ডামি ভাঙার সময় তো পালাচ্ছে না, পরে ধীরে সুস্থে আরামসে সে-কর্তব্য পালন করতে পারবে স্বচ্ছন্দে, কিন্তু আপাততঃ আসন গ্রহণ করে আনন্দ দাও আমায়।

—আরে, আরে, ডাক্তার বাঙ্কাম দেখছি, তুমি—তুমি!

—হ্যাঁ আমি, আমি এদের জোগাড় করে এনেছি, পল্ গোগাঁর খোকা আঁদ্রে গোগাঁ, বক্তৃমা রেখে এবার মুখোশ খোলো। খুব ধাক্কা দিয়েছিলে যা হোক আমাকে। এদের কাছে হয়েছিলে অনন্ত গান্ধি, আমার কাছে আঁদ্রে গোগাঁ, আবার কত লোকের কাছে কত কিছু—জোচ্চোর কোথাকার…!

—চোট্‌ছো কেন বন্ধু, বোসো, স্টেশন আসুক, চা-এর অর্ডার দেব, তারপর যত ইচ্ছে গালাগালি দিও। যা হয়ে গেছে, যা অতীত, তার জন্যে আপসোস করে কোনো আয়ের আশা আছে কি? তোমার দাঁতের প্র্যাক্‌টিস তাতে কিছু যদি বাড়ে, তবে সব শাস্তিই আমি মাথায় পেতে নেবো।

জেন তখন জোরসে জড়িয়ে ধরেছে অনন্তর অর্থাৎ অলকের গলাটা—ও'র চোখে অশ্রুর ছলছলানি—ও' নাকি অলকের সব দোষ ক্ষমা চাইবার আগেই মার্জনা করেছে। ও' বলল, "ফিরে চল তুমি

আমার দেশে, তোমায় নিয়ে যাব ক্যালিফর্নিয়ায়—এখানে এ কি পাগলামি করে সময়গুলো নষ্ট করছ ?”

—ক্যালিফর্নিয়া, যেখানে পপি ফুল ফোটে—সেই সেইখানে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

শাইলা বললে, “কক্ষণো না, ডারলিং তোমাকে আমি আমেরিকা যেতে দিচ্ছি আর কি ? কি আছে, রাতদিন খালি তো টাকা টাকা ওখানে—আকাশে নক্ষত্র নেই, শুধু গোল গোল চক্‌চকে টাকার চাকতিগুলো চিক্ চিক্ করে, যাতে তুমিতো দু'দিনে দম আটকে মরে যাবে সেখানে। তুমি লণ্ডনে যাবে আমার সঙ্গে। হ্যাম্‌স্টেড্ হিদে আমাদের সেই বাড়ি, তোমার জন্যে আজও ব্যগ্র বাহু বিস্তার করে তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আশায় চেয়ে আছে।”

এদ্দা আগুন হয়ে উঠেছে তখন। ও বললে, “কি বলছে এরা—তুমি যে আমায় বিয়ে করবে কথা দিয়েছ। সিলি মেয়েগুলো কিছুই জানেনা দেখছি, আস্পর্ধা অসহ্য ছুঁড়িগুলোর। তুমি চল আমার সঙ্গে ভেনিসে, আমার হোটেলে, প্রোপ্রাইটরকে বলে এবার তোমার একটা ছিল্লে করে দেব। রবিবার শনিবার আমরা গণ্ডোলায় চড়ে চলে যাব দূরে, শুধু দুজনে।...”

আচমকা ব্রেকের হ্যাঁচকা টানে ট্রেনের গতি মুখ থুবড়ে গেল থেমে। এসে গেছে কটক। অলক তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নের সীমান্ত থেকে ট্রাঙ্কগুলো সমেত ছিটকে পড়েছিল আর কি ? কোন রকমে সামলে নিয়ে যেন বাস্তব জগতে লাফ মেরে ট্রাঙ্কগুলোর ওপর থেকে

নেমে মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে ও' তখন গলাটা বের করে জানলা দিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে দিল—"কুলি, কুলি!" স্বপ্নের ঘোর ও' যেন এমনি করেই ঝেড়ে ফেলবার তালে আছে।

কর্তা চেঁচামেচিতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসেছেন বাঙ্কের ওপর। অলক কর্তার স্যুটকেসগুলো বাঙ্কের তলা থেকে টেনে বের করতে করতে, রোদ্দুর-ঝলমল-করা বাইরের আকাশটার দিকে দেখে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে উঠল: "দীর্ঘশ্বাস যত দীর্ঘই হোক, তাদের পরমায়ু বায়ুতে মেলাতে অতি অল্পক্ষণ সময় নেয় দেখছি। হে মিথ্যার পৃথিবী, তুমি মিথ্যার বলেই তো এত মিষ্টি—তুমি মুহূর্তের মোহের মাটিতে গড়া, আর তাইতো চিরন্তনতার স্বপ্নে এত চমৎকার। তোমার উদ্দেশ্যে তাইতো চির-জাগরূক আমার অগস্ত্য-চুম্বন!

গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই দেখা গেল, স্মিতহাস্যে বিকসিত-দন্ত হন্ত-দন্ত এগিয়ে আসছে ভবানী। সঙ্গে ঐ-দেশবাসী এক দঙ্গল লোক। ওখানকার আমলা কর্মচারী, এ-ছাড়া পাইক বরকন্দাজও আছে। কেউ তরোয়াল, কেউ বন্দুক ঘাড়ে। স্টেশনে সে এক হুলুস্থূল ব্যাপার! স্টেশনমাস্টার থেকে গাড়ির গার্ড অবধি তটস্থ! এ-ছাড়া ভীড় করে দাঁড়িয়ে, কেউ বা স্রেফ্ কৌতূহলবশতঃ, কেউ বা মজা দেখার লোভে হাজির। সত্যিই সে একটা দৃশ্য বিশেষ!

কটক স্টেশনে মাদ্রাজ মেল লেট হয়ে গেল তিন মিনিট।

জিনিসপত্তর নামানো শেষ হয়েছে, জিনিসপত্তর তো নয় সে যেন জিনিসপত্তরের পাহাড়। অলক ভাবল, এ-কম ব্যাপার এক-এদেশেই সম্ভব। বিলেতে লোকেরা বিদেশে বেরোলে যথাসম্ভব মালপত্তর কম সঙ্গে নিয়ে চলে; যথাসম্ভব নিজেকে হাল্কা করে গায়ে হাওয়া মেরে বেড়াতে চায় তারা। আর এখানে ঠিক তার উল্টো, ট্রেনে শোবার সময় কর্তার কোলের পাশ-বালিশটি ইস্তক চাই। অতএব যত পার বোঝা বাড়াও, এই হচ্ছে এখানকার মটো।

স্টেশনের 'ওয়েটিং-রুম' অভিনন্দনের পক্ষে একান্ত অসুবিধাজনক

হলেও, সেই স্টেশনের আপার-ক্লাস ওয়েটিং-রুমই আপাততঃ হয়ে উঠল একটা দরবার-দৃশ্য! পিতৃবিয়োগের পর এই প্রথম জমিদার আসছেন জমিদারি পরিদর্শনে—সঙ্গে আছেন আবার নতুন কর্ত্রীঠাকুরাণী। অভ্যর্থনার পালা সে কি সহজে সাঙ্গ হবার?

এক এক জন লোক দর্শনপ্রার্থী হিসেবে আসে আর ওয়েটিং-রুমের চৌকাঠের বাইরে সরীসৃপের মত সারা শরীরটা মাটিতে বিছিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। তারপর পদমর্যাদানুযায়ী কেউ গিনি, কেউ হাফ্-গিনি নিয়ে কর্তা আর কর্ত্রীমার পায়ের ওপর রেখে, নজরসেলামী দিয়ে আসতে লাগল। অভ্যর্থনার শেষপর্বে, তাঁদের শ্রীচরণপ্রান্তে প্রকাণ্ড দুইটি পুষ্পমাল্য রেখে, আগত আমলা কর্মচারীরা আপাততঃ ইস্টিশানের একমেটে অভ্যর্থনার পালা সমাপ্ত করল।

অলক অবাক হয়ে উঠেছে। এই মধ্যযুগীয় প্রথার এমনিতর প্রশ্রয় ও'র কাছে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অদ্ভুত মনে হতে লাগল। কাল সারারাত একে ওই রকম সাংঘাতিক সুরাপান, তার ওপর এক পেয়ালা গরম চা-ও এখনো অবধি পেটে পড়েনি—খোঁয়াড়ী ভাঙ্‌বে কোন ভরসায়? সকালে স্নানঘরে সেঁধোবার সম্ভাবনা থাকলে না হয় কিছুটা উপকার পাওয়া যেতো, কিন্তু, এই নতুন বিচিত্র ব্যাপারগুলো তাহলে নেহাৎ-ই যে ও'র নজরের আড়ালে থেকে যেতো। অসুবিধা হোক, বিংশ-শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক সম্মানের এ-হেন বিসদৃশ দৃশ্য দেখার সুযোগ ও' কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। অভিজ্ঞতা আদায়ের জন্যেই তো ও'র এখানে আসার এত আগ্রহ। ও-দিকে অলক ওয়েটিং-রুমের মধ্যে অবস্থিত কর্তার অবস্থায় আরো তখন উৎসুক হয়ে উঠল—

মজা মারার লোভে সত্যি ও' লোলুপ হয়ে উঠেছে। পুতুলের মত চেয়ারে-বসে-থাকা কর্ত্রীর পাশে ইজিচেয়ারটার পা-রাখবার প্রসারিত হাতলদুটোর ওপর, কর্তা প্যাকাটির মতো তাঁর পাদপদ্মযুগল সমাগত

অভ্যর্থনাকারীদের মুখের ওপর বিস্তৃত করেই সেই যে চক্ষু বুজেছেন—কে কি করছে, কে কি দিচ্ছে, কিংবা কে কি বলছে, তা একবার ভ্রূক্ষেপ করা সম্ভব হয়ে উঠল না!

গতরাত্রে মদ্যপানের অত্যধিকতা, তার ওপর আবার সকাল দশটায় কাঁচাঘুম ভেঙে গেছে···হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, সামর্থ্যে আর কুলিয়ে উঠছিল না, কর্তার শরীরটার দিকেও নজর দেওয়া চাই তো। লোকের নামে শুধু শুধু দোষ দিলেই হল নাকি? দেখা গেল মাঝে মাঝে খালি পায়ের উপর স্বর্ণমুদ্রার আচমকা শীতল স্পর্শে চমকে চমকে উঠে তিনি ঘুমের ঘোরেই জড়িতকণ্ঠে"—আঃ, আঃ, বিরক্ত করিসনে বলছি না?" বলে পা দিয়েই সেগুলো ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন মাটিতে। গত রজনীর নেশার জের তখনো তাঁর জুৎসই জমে, বেশ বুঁদ হয়ে আছেন বলেই বোধ হল।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আমলা কর্মচারীদের মধ্যে তখন কর্তার এইরূপ কীর্তিতে অস্পষ্ট কানাকানি—প্রশংসার একটা কল্লোল বয়ে গেল। সবাই তখন বলাবলি করছে—"একেই বলে রাজটীকা ললাটে লিখা, স্বর্ণমুদ্রা, তাকেও কিনা পা দিয়ে ঠেলে ফেলছে! এ-বুকের পাটা রাজার ছেলে না হলে, যার তার হয়? বনেদি-বংশের বংশধর একেই বলা হয়। ধন্য ধন্য! যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, তাতে এই নতুন কর্তার নামডাকে মনে হয়, সারা একশো ষাট মৌজায় শঙ্খঘণ্টা বাজবে। রাজার বেটা বটে!"

ইতিমধ্যে কোন্ ফাঁকে ভবানী যেন কোত্থেকে চিলের মত এসে কর্তার পায়ের কাছে ঝাপটে পড়ল। তারপর হুমড়ি খেয়ে সেই নজর-সেলামীর স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিজের কোঁচড়ে কুড়িয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট খাতায় টুকতে লাগল—যে যে দিয়েছে তাদের নাম। হিসেব রাখতে তো হবে! টাকা-কড়ির হিসেব রাখা ব্যাপারে ভবানীর চেয়ে উপযুক্ত লোক কে আছে?

এবার এখান থেকে ডাকবাংলোয় যাবার পালা। চাউলিয়াগঞ্জ — ডাকবাংলো স্টেশন থেকে একমিনিটের পথ—হয়তো বা একমিনিটও নয়। কিন্তু একে হুজুর চলেছেন, তাতে কর্ত্রীঠাকুরাণী সঙ্গে। তাঁদের সাথে আগত সদরের লোকজন পরিচারক পরিচারিকা, কারুর পায়ে যাতে পথের ধূলিকণাটিও না লাগে ভবানীর নজর সেদিকে অত্যন্ত কড়া। ও' আগাম দশটা ঘোড়ার গাড়ি মোতায়েন রেখে দিয়েছিল স্টেশনে। এই জন্যেই ত ভবানীর সদর কাছারিতে এত সমাদর। মুখের কথা খসাবার আগেই দেখা যায়, ভবানী কাজ হাসিল করে এসে হাজির। কর্তার নেক-নজর এই সবের জন্যই তো ভবানীর ওপর। মফস্বলের দশটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি—সেই, সেই দেশলাইয়ের বাক্সর বড় সংস্করণ যেগুলো—যেন চলন্ত অন্ধকূপ !

কর্তাকে কোন রকমে চ্যাংদোলা করে ওয়েটিং-রুম থেকে এনে চাপিয়ে দেওয়া গেল একটা গাড়িতে। কর্ত্রীকে পরিচারিকা পরিবেষ্টিত করে, জানলা-ঝাপ্‌টা বন্ধ অন্য একটা গাড়িতে আগেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর্দানশীনা কি না! তাই দিনে-দুপুরে কর্তার সঙ্গে এক-গাড়িতে যাওয়ারূপ বে-পর্দা কিংবা বে-চাল এখানে হওয়া উচিত নয়। তবে কর্মচারীরা, প্রজাবৃন্দরা, পুত্রের সামিল। তাদের দর্শনদানে তাই কোনরূপ অন্যায় হয় না, অন্ততঃ শাস্ত্রে লেখা আছে তাই। কাছারির জ্যোতিষী নিত্যানন্দ মহাপাত্রর সঙ্গে এই নিয়ে অনেক আলোচনার পর ভবানী শাস্ত্রের এই নির্দেশ সকলকে অবগত করিয়েছে।

সবাই গাড়িতে উঠে ডাকবাংলো অভিমুখে এগিয়ে গেছে তখন। কেবল অলক বাদে। ভবানী এসে হাজির হল অলকের পাশে। তারপর অলকের থুৎনিটি নেড়ে বললে—"কি গো, দিব্যি ভেলভেটের

কোর্তায় সোনার কার্তিকটি সেজেছে দেখছি, আবার বিন্দেবনী চাদরের মাফ্‌লার—বেড়ে দেখাচ্ছে মাইরি !"

অলক বিশেষ করে এই ধরণের বাক্যালাপে বিশেষ পরিচিত না থাকায় উত্তর দিতে একটু দেরি হচ্ছিল। ভবানী সেই ফাঁকে বেশ ভারিক্কি মুরুব্বিয়ানা চালে বলে চলল :

—যাক্‌ এখন আমার হাতে পড়েছ, তোয়ের হয়ে যাবে শিগ্‌গির। ভয় নেই, হেথায় ভবানীর রোয়াবখানা দেখতে পাবে।

এবার ভবানী মুখটা অলকের কানের কাছে এনে বললে—"দশখানা গাড়িতে দস্তুরি একটাকা হিসেবে দশটাকা, নজরসেলামী থেকে একটা গিনি, দুটো হাফ্‌ গিনি নিজের জন্যে হাতিয়ে তারপর হিসেবটা ঠিক করেছি এবার তুমি বুঝে নেবে ভায়া। কিঁ, বুঝেছ ?"

বিস্ফারিত নেত্রে অলক আঁৎকে ওঠার মতই বললে—"অ্যাঁ ?"

ভবানী অলকের মুখের কাছ থেকে নিজের মুখটা সরিয়ে এবার নাকটা সিঁটকে তুলে বললে—"এঃ, এখনো যে মুখে গন্ধ ভক্‌ভক্‌ করছে।"

—কি করবো কর্তা জোর করে···

—ইল্লি, ইল্লি···

—ইল্লি মানে কি, মুকুজ্জে মশাই ?

এবার ভবানী অবাক-হওয়া-অলকের ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে এই প্রশ্ন করায় হেসে ফেটে পড়বার দাখিল হল, বললে—

"আর মনে বুঝে দরকার নেই। বলছিলাম কি যে, আমাদের সময়ে এই কর্তার বাপ জোর করে প্রথমে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন সকলকে। সন্ধ্যের আসরে যখন জোড়হস্তে আমরা ছোক্‌রা কর্মচারীরা হাজির থাকতুম তাঁকে ঘিরে, তিনি নিজে বোতলটা খুলেই আগাম মুখে পুরে অর্ধেকটা ঢক্‌ ঢক্‌ করে শেষ করে তারপর আমাদের দিকে ফিরে

বলতেন,—'এই বালখিল্য বাঁদররা, নাকটা টেপ।' আমরা তখন সবাই তাঁর আদেশ অনুযায়ী নাকটা টিপে ধরলে, বলতেন—'এবার মুখটা উঁচু করে হাঁ কর।' তারপর হাঁ করলে সটান বোতল থেকে সকলের মুখে সেই নির্জলা বারুণীর প্রসাদ সমান ভাবে বণ্টন শেষে বলতেন—'এবার মুখ বুঝে গিলে ফ্যাল।' আমরা অমনি দশ পনেরজন এক সঙ্গে মিলে ঢকাৎ করতাম। তারি মজার ছিল সে সব দিনগুলো হে!"

—তারপর?

—তারপর আমাদের মধ্যে থেকে সবাই নেমকহারামি করলে। হারামজাদার দল! খালি আমি কর্তব্য সমাপন না করে আজ তক্ যেতে পারলুম না। এই কর্তার বাচ্চা বয়সে হাতেখড়িটি আমি নিজে হাতে দিয়েছি—যাকে বলে 'নাড়া বেঁধে' চেলা হওয়া, এই কর্তা হচ্ছে আমার তাই। আমার হাতে হাতেখড়ি মানুষ, সেই কবে থেকে জান? যখন সদরে সুমারনবীশের কাজে ছিলুম, তখন থেকে। এখন আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নায়েব।

—বলেন কি?

—তা তুমি যতটা গোবৎসটি সেজে থাক অলক, আদতে কিন্তু ততটা নও মনে হয়? ভাজা মাছ তুমি ভালভাবেই উল্টে খেতে জান মনে হয়। চল, আজ যাওয়া যাক। আজ রাত্তিরে অন্ধকারের আলোয়ান মুড়ি দিয়ে নিয়ে যাব এখন এক জায়গায়।

—কি যে বলেন মুকুজ্জেমশাই।

অলক একটু হাসল—যেন লাজুক নাবালক, কিছুই বোঝে না এমনি একটি হাসি। এ-হাসিতে ভবানী অলকের উপর সত্যি-ই খুশি হয়ে উঠল, বললে—"দেখ কর্তার খাসমহলের খবরদারির কাজে বহাল হয়েছ। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। আমার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎও আর যখন তখন সম্ভব হবে না। অন্দর-মহলের দিকে

নজর টজর মারতে যেয়োনা! শেষমেষ নষ্টঘষ্ট কিছু ঘটলে, তুমি তো যাবেই আমিও সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্র সমেত···

অলক নিতান্ত ন্যাকার মতোই জিজ্ঞেস করলে—"তার মানে?"

—এ-সবের মানে বলতে নেই, বুঝে নিতে হয় বৎস। একে তোমার ওই খোকা-খোকা চেহারা খানা; তাতে ওই উপোসী মেয়ে আমাদের কর্ত্রী, বেশি দেখা-দেখি হলে খাই-খাই করে উঠতে পারে কি না! জবরদস্ত জোয়ান ছিন্ন একের বেশি ত্ব মকারান্ত নিয়ে একসঙ্গে যাতব্ববি মারা···গতরে কুলিয়ে ওঠা অমনি চাট্টিখানি কথা না কি? কর্তা আমাদের তান্ত্রিক মতে মদের আসরেই অষ্টপ্রহর মেতে, তার ওপর বাকী সময় বৈষ্ণব মতে পরকীয়া-পাগল। এরপর বৌয়ের কাছে ওঠা-বসার সময় কখন?

—সে কি? কর্ত্রীর নাকের গোড়ার জমিদারিতে এসেও এই বেলেল্লাগিরি সমানে চলবে বলতে চান? প্রজাদের সুমুখে স্ত্রীর চোখের গোড়ায় একটু সামলে চলা···

—বৌয়ের চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থার জন্যেই তো আমাকে অগ্রিম পাঠিয়েছেন কত্তা।

—কর্তা তাহলে বৌকে একটুখানি সমীহ করে চলেন দেখছি।

—করতে চায়, তবে শেষকাল অবধি ধোপে টেঁকে না।

—আহা, অমন সুন্দরী মোমের মতো কর্ত্রী···

—থাক্, আর বেশি প্রশংসায় প্রয়োজন নেই ন্যাকাচৈতন, গাড়িতে উঠবে চল এবার।

—মুকুজ্জে মশাই, আপনার মত হলে, আর কিছু মনে-না-করলে আমি এইটুকু হেঁটে যেতুম। কাল সারা রাত কর্তার কম্পার্টমেণ্টে বসে বসেই কাটিয়েছি। একবারের জন্যেও পা'টা ছড়াতে পারিনি। হাঁটুগুলো সব ধরে আছে এখনো, সকাল বেলা একটু হাঁটলে···

—না, এখানে ও-সব ফক্কুড়মি চলবে না। একে তুমি সদরের লোক, তাতে কর্তার খাস-দরবারী। অমনি হেঁটে হেঁটে হটহট করে গেলে মান ইজ্জত সব ধূলিসাৎ হবে। এটা কলকাতা নয়। একান্তই যদি হেঁটে যেতে চাও, তবে দাঁড়াও, একটা বরকন্দাজকে বলে দি, সঙ্গে যাক তোমার।

ভবানী এবার ভগ্নকাংস কণ্ঠে একটা হুঙ্কার ছাড়ল—এই ভিখারী-বিশোয়াল, এই দিকে আয়—

এরপর ভিখারীবিশোয়াল কাছে এসে দণ্ডবৎ জানালে ভবানী হুকুমের হুমকি সহকারে বললে—"যা বাবুর সঙ্গে সঙ্গে—ডাকবাংলো অবধি যাবি। দেখিস, খবরদার একলা যেতে দিবি নে!"

বরকন্দাজটা তার সাত হাত লম্বা চোঙওয়ালা মোগল আমলের গাদা বন্দুকটা আর একবার কাঁধের উপর ভাল করে বাগিয়ে নিয়ে বললে—"আজ্ঞে যা হুজুর।"

বরকন্দাজকে এইরূপ যথোপযুক্ত হুকুমের পর ভবানী এবার প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়িটায় গিয়ে উঠে পড়ল: তারপর চলল ডাকবাংলোর দিকে।

ভবানী চলে যাবার পর অলকের নজর পড়ল ওপর বরকন্দাজটার ওই মান্ধাতার আমলের বন্দুকটায়। ও' তাই নিয়ে হয়ে উঠল বেজায় কৌতূহলী। ওটাকে পরীক্ষা করার প্রবল বাসনায় ও' হয়ে উঠল পরম উৎসুক। বন্দুকটার জন্ম-তারিখের ইতিহাস নিয়ে ও' তখন মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। ও' সত্যিই যেন একটা মহামারী গবেষণার গোলকধাঁধায় নিজেকে গুলিয়ে তুলতে শুরু করেছে। ও'র দৃঢ় ধারণা, পুরাতাত্ত্বিকতার পরিচয়ে বন্দুকটার সত্যিই একটা পরিচয় আছে। বরকন্দাজটা তখন ও'কে গর্বের সঙ্গে বোঝাতে শুরু করেছে বন্দুকটার ইতিবৃত্ত। তারপর অলৌকিক মাহাত্ম্যময় উপকথার অবতারণা করতে তোড়জোড় শুরু করল।—

—এ বন্দুক দেখে অবাক হচ্ছেন? তা হবার কথাই বটে। হুজুর, এ বন্দুক যে সে বন্দুক নয়—এ ষণ্ড রাজার আমলের বন্দুক। অলক ষণ্ড রাজার নাম শুনে হেসে ফেলেছে, ও বললে—"ষণ্ড মানে ত ষাঁড়। —ষাঁড় আবার রাজা হয় নাকি? দূর বোকা।"

—হুজুর, ষণ্ডরাজা মানে ষণ্ডগোত্রীয় রাজা; ব্যাঘ্রগোত্র, নাগগোত্র, রাজাদের এমনি সব এখানে গোত্র আছে যে হুজুর।

অলক এবার মনে মনে বুঝল সত্যিই হাসির এতে কিছু নেই; বরঞ্চ একটি আদিম তথ্যের তোরণ উন্মুক্ত হয়ে উঠল ও'র কাছে। ও'র মনে হল বাংলাদেশে ও'রা যেমন শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, কাশ্যপ এমনি সব মহামহা এক একটি মুনিঋষিদের গোত্রভুক্ত, অর্থাৎ তাঁদের মতামত মেনে চলা, তাঁদের আদর্শের উপাসক হওয়া কিংবা তাঁদের 'ইজিমের' সাপোর্টারভুক্ত হওয়া—ঠিক তেমনি এই দেশেও এই সব একেকটি জন্তু একেকটি দলের 'টোটেম' কিনা প্রতীক ছিল। আর দলপতি অথবা সর্দাররা ছিল ওই দলের রাজা, তার মানে বোঝা যাচ্ছে 'টোটেম' ওঅরশিপ অর্থাৎ প্রতীকপূজা উড়িষ্যাতে খুব অল্পদিন আগেও ছিল। অলকের উৎসাহের এবার তোড় নেমেছে। ও' উৎসাহিত হয়ে আরো জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করলে—"তা ঐ ষণ্ডরাজার বন্দুক এখানে এল কি করে, এদের এস্টেটে?"

—হুজুর এ ষণ্ডরাজা ছিল কুজং-এর একছত্র অধিপতি। রোমিত পাণ্ডুয়া—এ-সবই আগে ছিল কিল্লা কুজং-এরই এলেকা অন্তর্গত। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে কুজং-এর ষণ্ডরাজা পালিয়ে পারাদ্বীপে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইলেন। ইংরেজ সরকার তখন রাজাকে না পেয়ে তার রাজত্বের কুজং আর রোমিত অংশ কলকাতায় নিলেম করল হাইকোর্টে। বর্ধমানের মহারাজা সেই নিলেমে কিনে নিলেন কুজং আর রোমিত। শুধু বাট্টে মৌজা নিয়ে বাকী ছিল এই পাণ্ডুয়া

কাছারি। ইংরেজরা পরে তা জানতে পেরে এই শর্তে যাট্টে মৌজা নিয়ে পাণ্ডুয়া কাছারিকে আবার নিলেমে ওঠাল কলকাতায়, তখন সিংহ চৌধুরীরা খরিদ করেন কুজং আর রোমিত বাদে বাকী এই একশত যাট্টে মৌজা।

—মৌজা মানে কি?

—মৌজা মানে একটা গ্রাম আর তার সঙ্গে সেই গ্রামের চায আবাদী জমি, তাকেই হুজুর মৌজা বলে।

—আচ্ছা, তারপর খণ্ডরাজার কি হল?

—তারপর খণ্ডরাজার পাণ্ডুয়া কাছারি এই বাঙালী বাবুদের এক্তারে আসার সময় থেকে এই বন্দুকও এক্তারে এসেছে। জানেন হুজুর, খণ্ডরাজার মালখানার ঠিক মধ্যিখানে মোতায়েন থাকত এই বন্দুক। কার সাধ্যি সে মালখানায় ঢোকে চুরি অথবা কোন বদ মতলবে? এ বন্দুকের যে চোখ আছে। চোর এলে দেখতে পায়। তারপর চোরের দিকে ফিরে নিজে নিজেই 'ফয়ার' হত।

—বলিস কি, আপনা আপনি বন্দুক কখনো ফায়ার হয়?

—হাঁ, কিন্তু খণ্ডরাজার রাজত্বি শেষ হবার পর, বিদেশী বাঙালী রাজা যেদিন থেকে রাজগদি অধিকার করেছেন সেদিন থেকে এর ঘোড়া মানুষে টেনেও ফেলতে পারে না, তো আর ফয়ার হবে কি করে?

—কেন, এর কারণ কি?

—হুজুর, এ বন্দুকের চোঙ্ দিয়ে আওয়াজ শোনা যায়—কান্নার আওয়াজ।

—এখন শুনতে পাব?

—এখন তো হয় না, প্রত্যেক মাসের অমাবস্যার রাত্তিরে এর মধ্যে ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার একটা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আসে কানে।

—আচ্ছা দেখি, বন্দুকটা আমি ফায়ার করতে পারি কিনা।

—হুজুর, এমন কথাও মুখেও আনবেন না। যে দুজন লোক চেষ্টা করেছিল, সে দুজন লোকেরই পর পর ভেদবমি হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ ঘটেছে। এটা যে-সে বন্দুক নয় হুজুর—মন্ত্রপড়া বন্দুক!

—তবু দেখি ছোঁড়া যায় কিনা।

—একাজ আমি করতে দিতে পারিনে। পশ্চিমেশ্বর মহাদেবের পূজো করে স্বপ্নে আদেশ পাবার পর, তবে এ-বন্দুক কাঁধে রাখার সাহস করেছি। কার এতবড় বুকের পাটা, যে আমি ছাড়া অন্য লোকে একে ছোঁবে। অন্য লোক একে ঘাড়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এ বন্দুক রাত্তিরে উঠে তার ঘাড় মটকে দেবে। এ-ছাড়া পাওয়া পৌঁছুলে দেখবেন হুজুর মণ্ডরাজার আমলের তোপ আর তোপিনী, কাছারি বাড়ির সামনে রাখা আছে। পুণ্যাহের সময় মাঝ রাত্তিরে প্রত্যেক বছরে সেই তোপ আর তোপিনী জাগে। তাতে দস্তুরমত গর্জন হয়। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নায়েবমশাই এই ভবানীবাবু নিজে কানে শুনেছেন।

—তোপ, তোপ মানে ত কামান—যা দিয়ে গোলা ছোঁড়া হয়।

—আজ্ঞে হাঁ।

—তা তোপিনীটা কী?

—একজোড়া আছে যে হুজুর; একটা স্বামী, একটা স্ত্রী।

—ও বুঝেছি। সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার তাহলে। গর্জনের পর কিছু হয় নাকি?

—সে আর বলেন কেন! ভবানীবাবু তখন সবে এসেছেন স্ত্রীপুত্র নিয়ে পুণ্যাহের দিনেই। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নায়েবমশাই ভবানীবাবু যে-সে লোক নন। ডাকিনী- যোগনীসিদ্ধ কিনা। সেই পুণ্যাহের দিনেই মাঝ রাত্তিরে জেগে চিৎকার করতে করতে ভয়ে থরথর করে কেঁপে ছেলেপুলে সমেত ঘরশুদ্ধ লোক কোয়াটার থেকে বেরিয়ে এসেছেন একেবারে

কাছারির উঠোনে। ও'দের অমনি চিৎকার শুনে ম্যানেজার বাবু শুদ্ধ্ বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে; সারা পাণ্ডুয়া গ্রাম শুদ্ধ্ জমায়েৎ।

—তারপর?

—ভবানীবাবু বললেন তিনি নিজের কানে তোপ আর তোপিনীর গর্জন শুনেছেন—তারা বলছে, খণ্ডরাজার রাজত্ব যে-সাহেবেরা সর্বনাশ করেছে সেই-সাহেবদের রক্ত খাব। না পেলে হায়জায় সারা গ্রাম এবার উজাড় হবে।

—তা সাহেবদের রক্ত দেওয়া হল, না হায়জায় সারা গ্রাম উজাড় হল?

—হুজুর এই ভবানীবাবু বড্ড একজন তান্ত্রিক গুণী; ইনি কামরূপ কামেচ্ছা থেকে কুমারীপূজা শিখে ডাকিনী-যোগিনীদের বশে রেখেছেন। মাঝে মাঝে গভীর রাত্তিরে পরী আসে ওঁর পূজোর ঘরে।

—তুই কি করে জানলি যে উনি সিদ্ধ পুরুষ?

—কি বলছেন, এখানেও উনি মাঝে মাঝে কুমারীপূজা করেন। উলঙ্গ কুমারীর মধ্যে মা কালীর ভর করান। মদকে উনি শোধন করে কারণ করতে জানেন। তাই বোতল বোতল বেগর পানি মদ কারণ করে ঢকঢক্ খেয়ে যান। কিন্তু কিছু নেশাটি হবে না ওঁর। তা নইলে বড় ম্যানেজারবাবু তোপ-তোপিনী সাহেবদের রক্ত চাইছে—এই কথা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে এক হপ্তার মধ্যে ওই ম্যানেজারবাবুর বড় মেয়েরই হল হায়জা বেমারী। তারপর ম্যানেজারবাবু পায়ে ধরে অনুরোধ করায় ভবানীবাবু কারণ সহকারে সারা একটা দিন ক্রিয়াকর্ম অন্তে তোপ আর তোপিনীর সন্তুষ্টি-সাধনে সমর্থ হয়ে সাহেবের রক্তের বদলে বছরে বছরে ছটা কুঁকড়ো, ছ-বোতল কারণ অর্ঘ্য দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে, শেষে তোপ আর তোপিনীকে শান্ত করেন। আগে তো তোপ আর তোপিনীর জন্তে

কুমড়ো বলি দেওয়া হত, কিন্তু এর পর থেকে কুমড়ো বলি বন্ধ হয়ে গেছে। তার যায়গায় কুঁক্ড়ো বলি দেওয়া হয়, আর দু-বোতল কারণ—বিলিতি কারণ!

—তোমারা তাহলে কুঁক্ড়ো খাও?

—আজ্ঞে না, আমরা উড়িয়্যাবাসীরা বৈষ্ণব শ্রীশ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর ভক্ত।

—তবে প্রসাদ কে পায়?

—কেন? ভবানীবাবু নিজেই সব প্রসাদ গ্রহণ করে আমাদের ছাড় করে দিয়েছেন।

—ও:, তাই নাকি?

—কি বলছেন, আজ্ঞে, এই বন্দুক আর এই তোপ আর তোপিনীর কথা উম্‌রো ঝুমরো পুরাণেও উল্লেখ আছে যে!

—আচ্ছা তোমার বন্দুকটা এখন একটু ভাল করে দেখি। তুমি না হয় ধরে দেখাও, আমি ছোঁব না। কী দরকার বাবা, রাত্তিরে ঘাড়টাড় যদি মট্‌কে দেয়।

বরকন্দাজ ভিখারীবিশোয়াল অলকের বিশ্বাসে এবার খুশি হয়ে ঘাড় থেকে বন্দুকটা নামিয়ে ও'র চোখের কাছে ধরল—

অলক দেখল, বন্দুকটা সত্যিই একটা অ্যান্টিক্ কিউরিও বিশেষ হওয়ার উপযোগিতা রাখে, কিন্তু গাদা বন্দুকটার দিশী কামারের তৈরি ঘোড়াজুটোর প্যাঁচ, জং লেগে ক্ষয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে যে, সত্যিই তা টিপে কোন ফকলের সম্ভাবনা একবারে ষোলআনাই বৃথা।

ওরা কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কে ডাকবাংলো ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। কি করবে, আবার ঘুরে উল্টো মুখে পা চালাতে বাধ্য হল তাই।

…সামনে গাড়িবারান্দা, তারপর লম্বাচওড়া বেড়ে টানা বারান্দাটা। তার পিছনে সারসার ঘর, পরিষ্কার ছিম্‌ছাম্‌।

এই ডাক-বাংলোর বাঁপাশের তিনি খানা ঘর নেওয়া হয়েছে একশো ষাট মৌজার জমিদার বড় তালুক পাণ্ডুয়া কাছারির মালিক যুদ্ধজিতেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরীর জন্যে—অর্থাৎ কিনা আমাদের এই কর্তার জন্যে। বাঁপাশে কর্ত্রীর ঘর, তারপর কর্তার, আর সবার শেষের ঘরখানা ছিল অলকের।

কটক হচ্ছে এদিককার হেড-কোয়ার্টার, অথচ পাণ্ডুয়া কাছারি কটক থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল—এদিককার মামলা মোকদ্দমা সব কিছুই কটক কোর্টেই বিচার হয়। সেইজন্যে পাণ্ডুয়া কাছারির এইখানেও একটা ছোটখাট দপ্তর আছে। এখানকার সেরেস্তায় একজন মুহুরি, একজন মামলোৎকার—অর্থাৎ যে মামলা মোকদ্দমা তদ্বির করে, একজন টর্নি, (অ্যাটর্নির অশিক্ষিত সংস্করণ) একজন ল-অফিসার, আর একজন উকিল—যার নামে আমমোক্তারনামা আছে। তিনি-ই হচ্ছেন এই দপ্তরের কর্ণধার, আর অন্যরা সব মাঝিমাল্লার মতই অনেকটা।

কটকের এই সেরেস্তার যত সব আমলারা হুজুরের শুভাগমনে, ডাক বাংলোর গাড়ি বারান্দায় দর্শন আশায় ভিড় করে।

কর্ত্রীমা পরিচারিকাদের নিয়ে তাঁর ঘরে পর্দা ফেলে হয়তো হাতির দাঁতের দশ পঁচিশের ঘুঁটিগুলো হাত-বাক্স থেকে বার করেছেন।… ট্রেনের ঝাঁকুনিতে কর্তার বেজায় মাথা ধরেছে, জ্বরজ্বর ভাব, গা-ম্যাজম্যাজ করছে। সকালে, কিনা আমাদের দুপুরে, তিনি জলপান ইত্যিক করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

অলক স্টেশন থেকে এসে স্নানের পর পরোটা আলুভাজা আর ডিম-সিদ্ধ দিয়ে বেশ ভাল করে যখন প্রাতঃরাশ শেষ করল, তখন দুপুর দেড়টা বাজে। জমিদার বাড়িতে বেলা দেড়টার সময় প্রাতঃরাশ, সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা ছটার সময় দ্বিপ্রাহরিক আহার—যাকে লাঞ্চ বলে তাই। রাত্তির সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে সন্ধ্যা বেলার চা, আর রাত্তির আড়াইটে তিনটে বেজে গেলে রাত্তিরের খাওয়া অর্থাৎ ডিনার সমাপন করা হয়। এমনি অনিয়ম—এ একটা আভিজাত্যের অঙ্গবিশেষ। এখানে এই মফস্বলে এসেও তার ব্যতিক্রম যাতে না-হয় অর্থাৎ তাড়াতাড়ি যাতে খাওয়া-নাওয়া সাঙ্গ না হয় তার জন্যে রান্নাঘরে একটা পাইক বসিয়ে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ভবানী খুব ভাল রকমই করতে পেরেছে বোঝা গেল। এক চুলও এসব ব্যাপারে ভুল হওয়া ভবানীর দ্বারা সম্ভব নয়।

অলক সেই বেলা দেড়টায় প্রাতঃরাশ সমাপন করে বিছানায় পড়ে একটু হাত পা ছড়িয়ে ঘুম দেওয়ার পর যখন উঠল তখন সাড়ে পাঁচটা

বাজে। তখনও তুপুরের ভাত তৈরি শেষ হয়নি। ও' মুখ-হাত ধুয়ে একটু স্টেশনে ঘুরে আসবার মতলবে এগোতে যাবে, দেখে সকালের সেই বন্দুক ঘাড়ে বরকন্দাজটা ও'র পেছু নিয়েছে, ও' মনে মনে ভাবতে লাগল,—ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল যাহোক—নিশ্চয়ই ভবানীর হুকুম, আমি বেরোলেই এ' আমাকে অনুসরণ করবে! একদিনেই দেখি অতিষ্ঠ হবার দাখিল!

স্টেশন থেকে এদিক ওদিক ঘুরে অলক যখন ফিরল, তখন কর্তা উঠেছেন। বারান্দার এক কোণে একটা টিপয়-এ কলকাতা থেকে আনা লেমনেডের বোতলগুলোর কয়েকটা সাজানো। হুজুরের সন্ধ্যের সময় ঘুম থেকে উঠেই বড় তেষ্টা পায়! তাই লেমনেড খাচ্ছেন; কিন্তু গেলাস খালি হলেই কর্তা বারবার কেন ঘরের ভিতর ঢুকছেন? এ-রহস্য, অলক গোড়ায় গোড়ায় ভেদ করতে পারছিল না, এমন সময় অকস্মাৎ হাওয়ায় ঘরের পর্দাটা একটু উড়ে যেতে, ফাঁক দিয়ে অলকের চোখের উপর জিন্‌এর বোতলটা চমকে গেল—যাক বোঝা গেল, জিন্‌টা খেলে কর্ত্রীর সম্মানটা বজায় থাকে, অর্থাৎ মুখে গন্ধ পাবার যো'টি নেই। অলককে কর্তা একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন। অলক বসল। ঠিক সেই সময় পাশের অন্য আরেকজনদের কামরা থেকে ছুটো বেয়ারা গোছের লোক একটা ইজিচেয়ার বের করল বারান্দায়। তারপর তাদের সাথে সাথে একটি জাঁদরেল গোছের লোক বেরিয়ে এল লোকটার বয়েস হলেও, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা! মাথায় কাঁচা পাকা চুল। রঙ্‌ তামার মত। ঈগলের ব্যাঁকানো ডানা যেন ইয়া গোঁফ ঠোঁটের তুপাশে পাখ্‌না মেলেছে। বারান্দায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে

তিনি চিৎকার করলেন! সেই চিৎকারে বারান্দা, ঘর, সব গমগম করতে লাগল। লোকটার গলা বটে, যেন দামামা! ডাকবাংলোর হাতার মধ্যেই—অল্প দূরেই অবস্থিত 'হিন্দু রান্নাঘরের' কোয়ার্টার থেকে দুটো লোক ছুটতে ছুটতে হাজির হল। তার পর লোকটার সঙ্গে কি কথাবার্তার পর 'আজ্ঞিয়া হুজুর' বলে চলে গেল। এবং কিছুক্ষণ বাদে একটা সোনা-বাঁধানো বিরাট গাঁজার কল্কে লোকটার সামনে এনে হাজির করল। লোকটা সেটাতে একটা টান মেরে সেই চাকরটার হাতে ফেরৎ দিয়ে বললে, "ভাল ধরেনি, ধরা ভাল করে শঁড়া" চাকরটা ফুকফুক্ করে দুচারবার সেই কল্কেটা হাতে নিয়ে টান মেরেছে এমন সময় লোকটা আবার চিৎকার করে উঠল—বললে, "এবার এদিকে নিয়ে আয় ব্যাটা। টানতেও পারিসনে!" তারপর পাশের আরেকটা দাঁড়িয়ে থাকা লোককে হুকুম করল—"মার ব্যাটাকে, পক্কা পক্কা দিটা গোইঠা পকাই বেক্ক ধরি কিরি বাহার করিদে।" তারপর দেখা গেল সেই চাকরটাকে আরেকটা চাকর মাথায় চাটি মারতে মারতে গলাধাক্কা দিয়ে বারান্দার বাইরে বের করে দিয়ে এল। ততক্ষণে যে লোকটা এতক্ষণ হুকুম করছিল সে নিজের মুখটা কুঁচকে, গোঁফটা এক হাতে উঠিয়ে ধরে, আরেক হাতে কল্কেটা নিয়ে একটানে প্রায় কল্কে সাবাড় করে—পাক্কা সাড়ে তিন মিনিট অবধি তার ধোঁওয়া বের করতে লাগল। নাক মুখ সব দিক দিয়ে ধোঁওয়া বেরিয়ে, তার সারা মুখটা তখন ধোঁওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে! গাঁজার কড়া গন্ধে আমাদের হুজুর অর্থাৎ যুদ্ধজিতেন্দ্রনারায়ণ কাসতে কাসতে বিষম খাবার দাখিল—বললেন "ছাখ না অলক, লোকটাকে পটিয়ে পাটিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে যদি গাঁজাটা খাওয়াতে পার—একটা হ্যাইনেস, ড্রিঙ্কটা জুৎসই করে জমাবো ভেবেছিলাম, মাটি হয়ে যাবে দেখছি—এ ইয়ার্তা"

গন্ধে ধরে এল।" ডাকলেন, "অলক এদিকে

অলককে আর যেতে হল না, লোকটার গাঁজায় দম দেওয়া তখন এমনিতেই সমাপ্ত হয়েছে দেখা গেল। কারণ, কল্কেটা তিনি তখন নামিয়ে রেখেছেন মাটিতে। তারপর একটু পরেই আরেকটা চাকরের মত লোক এসে সেটা উঠিয়ে নিয়ে গেল।

আমাদের কর্তা জিন চালতে তখন ঘরে ঢুকেছেন···এই ফাঁকে, লোকটা গঞ্জিকা সেবনের কৃপায় রক্তবর্ণ চক্ষুদুটো অলকের দিকে ঘুরিয়ে, উচ্চারণে উড়িয়্যার টান মারা বাংলা ভাষায় জিজ্ঞেস করলে—"আপনারা কোথা থেকে আসছেন।"

অলকের এই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে আলাপ করার বেজায় ইচ্ছে হয়েছিল আগে থেকেই, কিন্তু কোন উপায় না পেয়ে চুপ করে ছিল এতক্ষণ। এবার সুযোগ পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এল ওর কাছে, তারপর ও'র জিজ্ঞাসার জবাবে বললে—"কলকাতা থেকে।"

লোকটা তখন সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললে, "[illegible]" অর্থাৎ কিনা বসুন। তারপর জিজ্ঞেস করলে—"কি কাজের জন্যে এখানে এসেছেন এবং অন্য লোকটিই বা কে।"

এর উত্তরে অলক বললে—"অন্য লোকটি হচ্ছে শয়ে যাট মৌজা বড় তালুক পাওয়া কাছারির মালিক, পঞ্চ শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত যুদ্ধজিতেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ চৌধুরী। আর আমি হচ্ছি কিনা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রী অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, চুল। প্রেসিডেন্সি কলেজ, আই, এ, স্কটিশ চার্চ, ম্যাট্রিক, হেয়ার স্কুল।"

ঠোঁটের দুপাশে পাওয়া মফস্বলের লোকের কাছে কর্তার এবং নিজের

পরিচয় দেবার জন্যে পই-পই করে উপদেশ দিয়ে ভবানী তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিয়েছিল। অলক তাই—পরিচয়ের এই রকম প্রস্তাবনায় হাসির দমকায় বিদীর্ণ হবার দাখিল হলেও খুব গম্ভীর ভাবে রেল গাড়ির মত গড়গড় করে মুখস্থ বলে গিয়ে মুখ টিপে রইল। লোকটা এবার সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে—"ওঃ, বড় তালুকের জমিদার! আর আপনি কি পাস বললেন···এম্মে কলকাতা ইন্‌ভারসিটি, আর বাকীগুলো কি—ওগুলো সব বড় বড় পাস. না?"

কথাবার্তার এই ফাঁকে একটা চাকর রুপোর ছোট একটা রেকাবিতে পাচ ছটা কালো মার্বেলগুলির মত গোল গোল আকারের জিনিস লোকটার সুমুখে এনে ধরল। লোকটা এবার অলককে বললে—"একটা খাবেন?"

অলক জিজ্ঞেস করলে—"জিনিসটা কি?"

উত্তরে লোকটা বললে, "খুব ভাল জিনিস—মোদক, এতে খাঁটি মধু, খাদহীন মুক্তাভস্ম, স্বর্ণভস্ম দিয়ে আমার বিশেষ হুকুমে বিশেষরূপে তৈরি।"

অলক ও'কে জিজ্ঞেস করলে, "এ খেলে কি হয়?"

উত্তরে লোকটা বিকট মুখব্যাদান করে একটা মুচকি হাসির সঙ্গে বললে—"খেলে আট দশটা ইস্ত্রি-ক সামলে নিয়ে চলা কিছুই নয়।"

অলক হেসে বললে—"তার একটা ইস্ত্রিও যে নেই", তারপর জিজ্ঞেস করলে "তা আপনার সবশুদ্ধ কটা 'ইস্ত্রি' যে এগুলো খাচ্ছেন?"

তার উত্তরে লোকটা আঙুল গুণে গুণে মনে করতে লাগল। তারপর বললে—"পাট্টো মহাদেই একজনই, তবে বিবাহ তিনটে, আর সেবিকার সংখ্যা হচ্ছে আট দশ কি তার কিছু বেশি হবে হয়ত।"

এমন সময় আমাদের কর্তা ওদিক থেকে ডাকলেন, "অলক এদিকে

শোন।" অলক কাছে আসতে বললেন, "ঐ বাজে লোকটার সঙ্গে কি বকবক করছ, বস এইখানে।"

—স্যর, ভারি মজার লোক। আপনি ঘরের মধ্যে চলে যেতে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, কোথা থেকে আসছি, আর আমরা কে? আমি আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার পর বললুম—'আসছি কলকাতা থেকে'; এমন সময় লোকটার কাছে চার পাঁচটা গোল গোল মোদক একটা চাকর নিয়ে এল। লোকটা তার থেকে আমায় একটা খেতে বলছিল, বললে, 'এর একটা খেলে নাকি দশ বারোটা বিয়ে করতেও কিছু বাধা নেই।' আমার একটাও বিয়ে নেই এই ছুতোয় আমি কোনক্রমে রেহাই পেয়েছি।

কর্তা মোদকের এই সবিশেষ পরিচয়ে যেন উৎসাহে আটখানা হয়ে উঠলেন, বললেন "লোকটা কে হে, আর ওই মোদকটারই বা নাম কি, কোথায় পাওয়া যায় একটু জেনে নিলে না কেন? দশটা বিয়ে করার জন্য নয় তবে চেখে দেখা যেত কি হয়—ঐযে খানসামাটা যাচ্ছে, ডাক ত হে ওকে।"

—এই খানসামা ইধার আও, হুজুর বোলাতা হায়!

খানসামা এসে কর্তার সুমুখে কুর্নিশ দিয়ে দাঁড়াল। কর্তা তাকে তাঁর কাছে সরে আসতে বললেন। খানসামা সসম্ভ্রমে কর্তার কাছে সরে এল। কর্তা তখন অদূরে উল্টো-দিকে-মুখ-করে-বসে-থাকা সেই লোকটাকে দেখিয়ে খুব আস্তে আস্তে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, "আদমিটা কে?"

—হুজুর এ তো গন্‌জাম্ বরমপুরের কাছে যে বলীকুদ আছে, সেখানকার রাজা, বহুৎ বেশি গন্‌জা মোদক আউর আফিম খাতা—মাথা ভি থোড়া গড়বড় হো গিয়া।

—আঁ, বলিস কি অতবড় বলীকুদ রাজ্যের রাজার ঐ চেহারা!

সঙ্গে একটা কর্মচারী নেই, বন্দুকধারী বরকন্দাজ নেই—চেনবার যো আছে ?

এর পর খানসামাকে কর্তা বললেন, "আচ্ছা ঠিক হ্যায়, তোম্ আভি যানে সক্তা।" তারপর অলককে বললেন, "রাজা সাহেবকে গিয়ে বল ত তার যদি অসুবিধে না হয় কিছু, তাহলে আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমার পুরো পরিচয় জানোত—বলবে বড় তালুকের জমিদার।"

—আজ্ঞে, আগেই আমি যা আপনার পরিচয় দিয়েছি তাতেই ও' ভড়কে গেছে।

—না হে, বড় রাজা! আমার মত তিনটে জমিদার ও'র জামার পকেটে গুঁজতে পারে—এত বড় এলাকা ও'র।

এবার অলক সেই লোকটি অর্থাৎ বলীকুদের রাজার পেছন দিক থেকে গিয়ে, সামনে এসে রাজার যায়গায় ইচ্ছে করে মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর সম্বোধন শেষে বললে, "আপনার পরিচয় পেয়ে আমাদের হুজুর আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান, অসুবিধা কিংবা আপত্তি না থাকলে এখুনি আসতেন।"

—সে কি, সে কি, আমিই যাচ্ছি। তারপর উড়িয়া ভাষায় বিকট চিৎকার করলেন—এই দধি দাস্‌সে, কোয়াড়ে গলা ? আমোর টেবিল খণ্ডে সেয়াড়ে বড় তালুকর রজার পাখেরে নেই চল—মোঙ্গক দিটা-গোটা নেই আসিবি সাঙ্গেরে।

"যে আজ্ঞিয়া", বলে ছুটতে ছুটতে একটা চাকর এসে হাজির হল। তারপর টেবিলগুলো নিয়ে গিয়ে আমাদের কর্তার টেবিলের গায়ে এনে রাখল। কর্তা ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন বলীকুদের রাজাকে অভ্যর্থনা করতে, দুজনকার নমস্কার এবং সম্ভাষণ শেষে দুজনেই দুটো ইজিচেয়ারে বসলেন। আমাদের কর্তা রাজাসাহেবের জন্যে ঢেলে

নিয়ে এলেন ডবল জিন্, আর রাজাসাহেবও কর্তার জন্যে রুপোর রেকাবিখানা এগিয়ে দিয়ে নিবেদন করলেন ডবল মোদক, চারটে-জিনের পর মোদকের দুটো ছররা গুলি খেয়ে আমাদের কর্তা ভোঁ হয়ে গেলেন একদম, আর রাজাসাহেব সেই ফাঁকে জমে উঠলেন অলকের সঙ্গে।

বন্দুকের কথা, শিকারের কথা, ক্যামেরার কথা, অনেক কথাবার্তাই হল। শেষকালে অলক প্রতিশ্রুতি দিল কর্তার ক্যামেরায় কালই রাজাসাহেবের একটা ফোটো তুলে দেবে। রাজাসাহেব তখন অলককে বললেন, "কি সামান্য মাইনে নিয়ে এত গুণী লোক—বড় তালুকে মিথ্যে চাকরি করছ? ওঁর কাছে চাকরি করলে, একশো টাকা মাইনে, খাওয়া পরা সব এমনি। এক্ষুনি বহাল করতে পারেন।" অলকের মত লোকই এতদিন তিনি খুঁজছেন। আদতে অলক গোড়াতে এক 'মহারাজাধিরাজ' সম্বোধন করেই কুপোকাৎ করে ফেলেছিল। কী গালভরা সম্বোধন! একে মহারাজা, তাতে বিরাজবাহাদুর। কতখানি সময় লাগে উচ্চারণ করতে! বলিকুদের রাজাবাহাদুর আপন মনে দু'তিনবার মনে মনে নিজে নিজেই আউড়ে দেখেছেন ভারি সুন্দর লাগে শুনতে। কিন্তু কর্মচারীদের নিজে নিজেই তো এমনি সব কায়দা শেখানো যায় না! এই রকম একজন লোক থাকলে—সে-ই সব এমনিতর সম্বোধন, আদব-কায়দা, শিখিয়ে দিতে পারত। চোতা-মার্কা আমার সব আমলা-কর্মচারীগুলো। বাঙালী হলেই শিক্ষিত, কায়দা-কানুন দুরস্ত,—লেখাপড়া সব জানে কিনা!

রাত্তির হয়ে গিয়েছিল অনেক, কর্তা টলতে টলতে নেশার ঘোরে

কিংবা ইচ্ছে করেই তা এক ভগবান জানেন—নিজের ঘরে না ঢুকে, কর্ত্রীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কর্তার এই আকস্মিক অভাবনীয় আগমনে পরিচারিকা মহলে ঘটল যেন মহাপ্রলয়! এই আচম্বিত প্রভঞ্জনে ছিটকে গেল হাতির দাঁতের দশ-পঁচিশের ঘুঁটিগুলো—কে কোথায়! কর্ত্রীর আসর মুহূর্তে আমুল ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

সদর থেকে আমদানি বিরাট চাকর কর্মচারীদের আস্তানায় আরম্ভ হল গুঞ্জনের গুমগুমে আগুন।

বিবাহের পর সেই ফুলশয্যার রাত্রিতে নাকি কর্তা যা একবার ঘরে ঢুকেছিলেন কর্ত্রীর, তারপর এই একবছর বাদে আজ। এর মধ্যে এক রাত্রির জন্যেও কর্তা, কর্ত্রীর মহল মাড়ান নি। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসর জমিয়ে বসতেন বৈঠকখানায়, আজ একি অঘটন-ঘটন ঘটল?

যাক, পরিচারিকারা কেউ টিপ্পনি কাটলে, কেউ দেওয়ালে মাথা ঠুকে মানত করলে, যাতে সামনে বছরে একটি সোনারচাঁদ রাজপুত্তুরের আবির্ভাব ঘটে! তারপর রাজপুত্তুরের আবির্ভাব হলে কে কি চাইবে, জটলা পাকিয়ে তার একটা ফর্দের খসড়া করতে তখন উঠে পড়ে লেগে গেল সবাই। সে এক মহা হুলুস্থুলুস! রেষারেষি, মারামারি, তর্কাতর্কির ব্যাপার। অবিশ্যি সবটাই চলল চাপা গলায়, কানাকানি আর ফিস্‌ফিসিনিতে।

ওদিকে কর্তা টলতে টলতে কর্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন বটে, কিন্তু তারপর হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বেহুঁস—অমনিতর নেশায় টলে পড়া ছাড়া, প্রেমে পড়া কি সম্ভব? যাক্, অলকও ও'র ঘরে ঘুমোবার তোড়জোড় করল। শরীরটা সত্যিই ও'র ক্লান্ত! তাই বিছানায় দেহটা বিছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নিদ্রায় নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ও'র কানে কিসের যেন চেঁচামেচির লুকোচুরি খেলায়—ও' ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখে—

বলিকুদ রাজার চাকর-বাকরগুলো এদিক সেদিক বেজায় ছুটোছুটি করছে। একি! চেয়ার টেবিল খাট বিছানা বালিশ বলিকুদ রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার চারধারে এলোমেলো ছড়ানো কেন? অলক স্তম্ভিত! ও' বিলকুল্ এবার বোকা বনে গেল; দেখে, খাটটার চারপাশে রশি দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে বারান্দার বাইরে ঘাস-বেছানো জমিতে নিয়ে গিয়ে রশির শেষ দিকগুলো ডাকবাংলোর ছাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক দল চাকররা মিলে সেগুলো লুফে নিয়ে খাটটাকে দড়ির মারফৎ ছাতে উঠিয়ে নিল। এমনি করে একে একে চেয়ার টেবিল, সব উঠে গেল ছাতে। অলক বুঝতে পারলে না, মাঝ রাত্তিরে ও'কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নাকি! এমন আজব ব্যাপার হওয়া বাস্তবে কি সম্ভব? ও'র নিজের চোখ দুটোকে রগড়াতে রগড়াতে র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে কাণ্ডখানা ভালং করে তদ্বির করবার জন্যে বারান্দার বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল—এযে বলিকুদের রাজাসাহেব স্বয়ং! দাঁড়িয়ে থেকে, চাকরগুলোকে হুকুম দিচ্ছেন। রাজাসাহেব অলককে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন, বললেন—"চলুন, ওপরে চলুন। আপনাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল। একটু গল্প-সল্প করা যাবে। নীচে বেজায় গরম, তাই টেবিল চেয়ার পালঙ্গুলোকে ছাতে পাঠিয়ে দিলুম। একটা বাঁশের সরু মই বানিয়েছে, আমরা ওটাতে করে ওপরে উঠবো।"

অলক বুঝল, রাজাসাহেবের মগজে মোদকের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবু যাই হোক, অলক রাজাসাহেবের এমনি ধারা অসম্ভব আজগুবি সব ব্যাপারে বেজায় মজার মালুম পেল যেন মনে। ও' তাই রাজাসাহেবকে বললে—"আজ্ঞে, মহারাজাধিরাজবাহাদুর, আগে উঠুন ত! তারপর আমরা ত আছি-ই।"

'মহারাজাধিরাজবাহাদুর' এই সম্বোধনে বলিকুদের রাজাসাহেব

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন আরেকবার। মোচ্ দুটোকে মুচড়ে নিলেন দু'বার, তারপর বুকের উপর তিনটে থাপ্পড় মেরে ছাতিটাকে ফুলিয়ে নিলেন তিনবার। এরপর ছাড়লেন খাস চাকরের জন্যে একটা হুংকার! চাকর হাজির হলে তার উদ্দেশ্যে বললেন—"চল্।"

অলক নীচে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—বলিকুদের রাজা-সাহেব তাঁর ঐ বিপুল শরীর নিয়ে মই-এর ক্ষীণ স্কন্ধে ভর করেছেন। ঐ বিপুল শরীর নিয়ে অমনিতর ক্ষীণাঙ্গিনী বেয়ে ওপরে ওঠা, সে কি সহজসাধ্য ব্যাপার! বিরাট হাঙ্গামার লেগে গেল একটা হৈ-হৈ কাণ্ড! রাজাসাহেব এক-পা ওঠেন, আর তাঁর বিশাল মাংসল পশ্চাৎভাগটা চাকরেরা ধরে তলা থেকে ঠেলে দেয় প্রাণপণ শক্তিতে ওপর দিকে—যেমন কলকতা শহরে তেতলার ওপর ভারি লোহার বিমগুলো ওঠে, 'হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো' চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে—অনেকটা তেমনি।

সারারাত্তির বকবক্ করতে করতে রাজাসাহেবের ঘুম এল যখন, তখন পূব আকাশের অলিন্দায়, অন্ধকারের চিকের আড়াল থেকে ভোরের আলো উঁকি মেরেছে। রাজাসাহেব এবার সেই ঠাণ্ডা খোলা ছাতেই শোবার আয়োজন করলেন। মোদকের উত্তাপে বয়লারের মত বলিকুদের রাজার সারা অবয়বটাকে হয়ত তখন গন্গনে রেখেছিল একটা অহেতুক উত্তেজনার আঁচে। নইলে, অলক কিন্তু অনুভব করল সারা রাত্তির হিমে বসে থাকায় আর জাগরণে, ও'র বোধ হয় জ্বর এল বলে! যাই হোক, রাজাসাহেব ও'কে আশ্বস্ত করেছেন, আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওঁর রাজত্বে আসার জন্যে, এমন কি পটায়েৎ অর্থাৎ কিনা

রাজগদির ভবিষ্যত অধিকারীর ঠিক নীচেই যে, অর্থাৎ মধ্যম পুত্রের গার্জেন টিউটরের পদমর্যাদাও দিতে প্রস্তুত। এ-ছাড়া ভাল মাইনে ত নিশ্চয়ই দেবেন।

দুপুর একটায়···এ-ই খুড়ি, না, না, সকাল একটার সময় সকলকার সঙ্গে অলকও যখন বিছানা ছেড়ে উঠল, তখন নিজের স্বভাবের এমনিতর চমৎকার উন্নতিতে ও' নিজেই চমৎকৃত হয়ে উঠছে। ও'র মনে পড়ল আজকেই ও'দের ডাকবাংলো ছেড়ে বজরায় উঠে যাবার কথা, কারণ কটক থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত পাণ্ডুয়া কাছারিতে পৌঁছবার দু'টি উপায়। একটি বজরায় কিংবা অন্য কোন জলযানে করে ক্যানালের মধ্যে দিয়ে জলপথ পেরিয়ে। আরেকটি মোটরে—স্থলপথে। জলপথে কিংবা স্থলপথে—যে পথেই হোক, তাদের শেষ সীমানা থেকে পুনশ্চ পাল্কিতে চড়ে দশ মাইলটাক পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হয় পাণ্ডুয়া গ্রামে, তথা বড় তালুকের কাছারিতে।

জমিদারের সঙ্গে এসেছে বহু লটবহর, লোকজন, উপরন্তু কর্ত্রীমাও সঙ্গে চলেছেন। মোটরে মফস্বলে স্থলপথে এই চল্লিশমাইল একটানা রাস্তায় কর্ত্রীমার নানা কষ্ট—হয়ত অসুবিধে হতে পারে, তাই বজরার ব্যবস্থাই সকলে অনুমোদন করেছে। উপরন্তু নিজেদেরই যখন বজরা রয়েছে! সকলে তাই এই সকাল অর্থাৎ বেলা একটায় উঠে মালপত্তর গোছগাছে বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। অলক কি করবে? চা-টা খেয়ে পাশের মাঠটায় পায়চারি করছিল, এমন সময় ও' দেখা পেল ডাকবাংলোর খানসামাটার। ও' তার সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিল।

কি করবে? মালপত্তরের বালাই ও'র নেই বলতে গেলেই চলে—ছোট্ট একটি স্যুটকেসই যা ও'র সম্বল! বড় ব্যাগটা? সে ত বাস্কামের বাড়িতেই ফেলে চলে এসেছিল। এই স্যুটকেসটায় যা ধরেছিল তাই সঙ্গে নিয়েই ও' বাস্কামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিনা। খানসামার সঙ্গে অলক কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। ডাকবাংলোয় এই উৎকল দেশের ইসলামী খানসামার অজার অর্থাৎ ও'র দাদামশার প্রথম চাকরি। তারপর ও'র বপ্পাও এই চাকরিতেই মারা যায়। এখন ও-ও এই চাকরি করছে। যাকে বলে—তিন পুরুষের ধারাবাহিকতা ও'র মধ্যে বর্তমান! একি কম কথা! উড়িষ্যার ছোটবড় রাজা জমিদার প্রায় সকলকেই ও' ভাল করে চেনে। শুধু তাই নয়, তাদের নানারকম গোপন ব্যাপারে ঘাই মেরে অনেককেই ও' ঘায়েল করতে পারে। এই বলিকুদের রাজাকে ও'কি আজ চেনে? ছোটবেলায় যখন ও' এই পাশের মাঠটায় ন্যাংটো হয়ে খেলা করে বেড়াত তখন থেকে দেখে আসছে। খানসামা বলিকুদের রাজার গুণ-কীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। উড়িষ্যার রাজাদের মধ্যে জগন্নাথের রাজা অর্থাৎ পুরীর রাজা—যাঁর দর্শনের সময় সারা ভারতবর্ষের সব রাজার দর্শনী মানে নজ্‌রানা লাগে, সেই পুরীর রাজার একগুষ্টির লোক হচ্ছে এই বলীকুদ রাজা। এঁরা হচ্ছেন 'দেও' বংশ। উড়িষ্যার রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ এঁদের।

—বল কি, খানসামা? উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ রাজবংশের নমুনা কি ওই সোনা-বাঁধানো গাঁজার কল্কেতে, না মুক্তোভস্ম মেশানো মোদকের গুলিতে?

খানসামা তার দেশের রাজার ওপর অলকের অমনি নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে মনক্ষুণ্ণ হল। তাই দোষ কাটাবার জন্যে আরো উৎসাহের সঙ্গে বলে—"না, বিশ্বাস করছেন না সেক্রেটারি বাবু? সত্যিই মাথাটার

যা একটু দোষ আছে, তা নইলে উড়িষ্যার মধ্যে এঁর মত তেজী রাজা খুব কম আছে। খাঁটি সূর্যবংশী ছত্রী। মানুষ ত কি ছার, বনের বাঘ ভাল্লুকেরাও যে কাঁপে এঁর তেজে।"

অলক মুচ্‌কি হেসে আবার টিপ্পনির সঙ্গে বলে—"বনের বাঘভাল্লুক কাঁপানোয় আজকাল আর কি বাহাদুরি আছে? বন্দুক হাতে থাকলে, সূর্যবংশের ছত্রী না হলেও আমার সামনেও বাঘভাল্লুকরা অমনি কেঁপে থাকে।"

—না না, সেক্রেটারি বাবু, বন্দুক সঙ্গে নিয়ে নয়, শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে বড় বড় বাঘকে নিয়ে বেড়ালের মত বশ করে খেলা করতে শুধু ইনিই পারেন। কেন এনার যে বড় সার্কেস-পার্টি ছিল, নাম শোনেননি? অবশ্যি অনেকদিন আগেকার কথা। আমাদের ছোট বেলাকার কথা। নিজের চোখে দেখা।

—ও, সেই বলীকুদ সার্কস-পার্টি! সে কি এই রাজার ছিল নাকি? মনে পড়ে, আমরাও ছোটবেলায় দেখতে গিয়েছিলুম।

—শুধু কলকাতায় নয়, আরো কত দেশে। কতবার কত জায়গায় গেছে সে সার্কেস। খেলা দেখে তাজ্জব বনে গেছে সবাই—কত মেডেল, কত প্রশংসা-পত্র পেয়েছেন এই রাজা—সে কি গুনতি আছে?

—তাহলে সার্কসের সর্দার হচ্ছেন গিয়ে তোমাদের রাজা?

—না, না, তা নয়; এই সেদিনই ত হোআইট্ সাহেব, এখানে যিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—তিনি হীরাকুদ রাজার নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলেন তাঁর এলাকায়, সেই পথে পড়ে বলীকুদও। বলীকুদ রাজা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসছেন শুনে আমন্ত্রণ পাঠালেন, তাঁর কাছেও আসবার জন্যে। বলীকুদ রাজার পাগলা ধরণের মেজাজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভালভাবেই জানতেন আগে থেকেই। তাই, যে লোক এসেছিল আমন্ত্রণ জানাতে, তারই মারফৎ পাল্টা খবর পাঠালেন যে, বলীকুদ যাবেন রাজাসাহেবের

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, কিন্তু সেখানে পনেরো মিনিটের বেশি তিনি থাকতে পারবেন না। বলীকুদ রাজা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর পাঠিয়ে জানালেন—তাতেই রাজি! তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসবার সময় খুব খাতির যত্ন আদর আপ্যায়ন করে নিজে আধমাইল পথ আগাম গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসে অভ্যর্থনার আতিশয্যে তাঁকে ডুবিয়ে ফেলে, দরবার ঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন। এখন খাবারদাবার ব্যবস্থা করতে অন্দরের দিকে এগোতে যাবেন আর কি, এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন পনেরো মিনিট হয়ে গেছে এবার তিনি উঠবেন। আর যায় কোথায়? পাশের ঘরে কুকুরের মত বেঁধে রাখা ছটা সাতটা পোষা বাঘ শিকলি খুলে দিতে-ই সেই দরবার ঘরে এসে ঘোরাফেরা করতে লাগল তারা! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ত এদিকে সাদা পান্তলুন খাঁকি হবার দাখিল। তখন রাজাসাহেব সেই হোআইট সাহেবকে খাইয়ে দাইয়ে পনেরো মিনিটের যায়গায় পাক্কা দেড়টি ঘণ্টা বাদে ছেড়ে দিলেন, বললেন, "এদেশে অতিথিকে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে জগন্নাথ মহাপ্রভু কুপিত হন।" এমনি আজব প্রকৃতির লোক ইনি।

রাজাসাহেবের উপর খানসামার এই লম্বা গল্পের ছলে প্রশংসাপূর্ণ প্রশস্তির পর অলক বললে—"তা কাল মাঝরাত্তিরে যখন চেয়ার টেবিল পালঙ্ক দড়ি বেঁধে ছাতে টেনে টেনে ওঠাচ্ছিলেন, তখনই বুঝেছি ইনি কি প্রকৃতির লোক! তা ইনি এত বড় রাজা, এঁর এখানে নিজের বাড়ি নেই? ডাকবাংলোয় যে উঠেছেন বড়?"

—হুজুর, বাড়ি ত আছে কিন্তু সেখানে টিকায়েৎ থাকেন।

—টিকায়েৎ মানে?

—টিকায়েৎ মানে রাজার বড় ছেলে, যিনি রাজগদি পাবেন, অর্থাৎ যার কপালে রাজটিকা দেওয়া হয়।

—তবে ছেলের কাছে না উঠে,—এখানে?

—হুজুর, বাপে-ছেলেতে সাপে-নেউলের সম্পর্ক যে!

—কেন?

—সে বড় গোপন আর বড় সরমের কথা!

—কি বলই না, আমি বিদেশী লোক, আমি গল্প শোনার লোভে শুনছি! তোমার কোন ভয় নেই, আর একটি কানেও কখনো পৌছবে না!

—বলব কি হুজুর, ছেলের বৌ দেখতে বড়ই সুন্দরী, তার উপর শেষকালে...ঐ মাথাটার একটু দোষ আছে! তাইতো টিকায়েৎ সাহেব বলীকুদ থেকে বৌকে নিয়ে পালিয়ে এসে বরাবর কটকেই থাকেন। বলীকুদে আর যান না। রাজাসাহেবও ছেলের বাড়িতে এখানে ঢুকতে চাইলেও পারেন না।

—অ্যাঁ, বল কি? নিজের—নিজের ছেলের স্ত্রী?

—আজ্ঞে।

ও'দের এমনিতর আলাপ যখন চলছে জোরসে, হঠাৎ ভবানী কোত্থেকে এসে হাজির হল সেখানে। তারপর টিপ্পনি কাটল, "খানসামার সঙ্গে বেড়ে জমিয়েছ যে দেখছি!" তারপর খানসামার দিকে ফিরে একটা চোখ মেরে বললে: "কি ব্যাপার খানসামা?" এবার অলককে খানসামার আদৎ পরিচয় দিয়ে তার গুণগানে অষ্টমুখ হয়ে উঠল! যথা, 'ওরে বাব্বা, কটকের বিল্লি ও', যে-সে লোক মনে কর না হে ও'কে।' ভবানীর এই কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও' অলককে বগলদাবা করে টেনে নিয়ে চলল কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে নল্‌চে আড়াল দেবার ভঙ্গিতে মুখটা অলকের কানের কাছে এনে ফিস্‌ফিস্ করে উপদেশ দিল—"কর্ত্রীকেও সোনার

কার্তিকের মত চেহারাখানা দেখাবে মাঝে মাঝে। কর্তার কাছে যে কাজ হাসিল করতে পারবে না, কাঁচুমাচু মুখে কচি খোকাটি সেজে কর্ত্রীকে দিয়ে তা মঞ্জুর করিয়ে নেবে—এই সব অমূল্য টিপ্‌স্‌, আমার কাছ থেকে যা পাচ্ছ, জীবনের উন্নতির পথে তার জরুরৎ কতখানি, তা বুঝবে। মাড়োয়ারীরা বলে, 'লাখো রুপেয়া দেনে সাকৃতা, মগর্‌ আক্কেল মৎ দেনা'! তা তোমাকে দেখে আমার একটা মায়া করে কেমন! তাই আক্কেলই দিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে।"

অলক এর উত্তরে গম্ভীর হয়ে বলে, "আপনি না থাকলে এই চাকরি আমার পক্ষে জোটানো ছিল স্বপ্নের অতীত।" ভবানী অলকের এই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ উক্তিতে খুশিই হল!

কিন্তু অলক মনে মনে আফসোসে আটখানা হয়ে উঠেছিল তখন —খানসামার সঙ্গে অমন চমৎকার আলাপটা মাঠে মারা গেল যে!

ভারি সুন্দর বজরা। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি পরিপাটি। একটা ছোটখাট বাড়ি বললেই চলে। সামনে বসবার ঘর। সেই বসবার ঘরেই কর্তার শোয়া এবং বসার ব্যবস্থা হয়েছে। কর্ত্রীর ঘর ঠিক এর পরেই। স্নানের ঘরটা কর্ত্রীর আর পরিচারিকাদের ঘরের ঠিক মাঝখানে। তারপরেই রান্নাঘর। তারপর অলকের জন্যে আরও একটা ছোট্ট কুঠরি। এ-ছাড়া চাকর-বাকর আমলারা বোটের ছাতে ত্রিপল খাটিয়ে তাদের ডেরা তৈরি করেছে তোফা।

চোখের অগোচরে পরদার আড়ালে থাকায় নবমঞ্জরি নিরুপায় এ-ক'দিন পলে পলে সূর্যমুখীর মত অলকের উদ্দেশ্যে একাগ্র দেহ মনে উৎসুক বাহু বিস্তার করে অপেক্ষা করেছে। শুনেছে অলকের পদধ্বনি, কান দিয়ে মধুর মত চুষেছে ও'র গলার আওয়াজ। অলক কিন্তু বেশ ভালই ভুলে ছিল, মেতেছিল এখানকার নানা বিচিত্র মানুষের পরিবেশে। মস্‌গুল্‌ হয়ে বেড়ে কেটেছিল ও'র ডাকবাংলোর দিন।

কিন্তু আজ আবার নবমঞ্জরির সঙ্গে চোখে চোখে ধাক্কায় ধরাতলশায়ী! ও' যেন আবার জখম, গুরুতর জখম হয়েছে।—চিত্ত বীণার তারে তারে বিষম-চোট-খাওয়ায় বাজল যেন তিলক-কামোদের কান্না!

বোট ছাড়ল, অভিজাত মার্কা লাঞ্চ-টাইম মানে দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর—কিনা বেলা সাড়ে পাঁচটার পর।

ক্যানালের দুপাশে বেশ উঁচু পাড়। কেয়া ঝাড়, ফনি-মনসার বনে ভরা। দূরে পশ্চিম আকাশে—অস্ত-রবির দরবারে খাটান হয়েছে সন্ধ্যার রাগ-রক্তিম সামিয়ানা। বাতাসে বহন করছে সেখানকার সানাইয়ের পূরবাঁইয়া সুর। অদূর উর্ধ্বে সন্ধ্যা তারার স্নিগ্ধ হাসিটি।

ভারতবর্ষের সন্ধ্যার শান্ত পরিপূর্ণ এই অপরূপ শ্রী ও'কে উতলা করে তুলল—বিলেত থেকে এসে কলকাতায় সেই গোয়াবাগানের মেসের অন্ধকূপে—সকাল থেকেই তো রাত্রি হয় সেখানে। মেসের যে-ঘরটায় অলক থাকত, সকাল থেকেই ইলেকট্রিক আলো জালতে হত সেখানে, এত অন্ধকার এঁদো সে ঘরটা। তাছাড়া এমনিতেই তো কলকাতার সন্ধ্যা কদচিৎ নজরে নামে!—নয় কী?

অলক বোটের জানলাটার ধারে চৌকিটা টেনে নিয়ে বসে বসে দেখতে লাগল দৃশ্য। ক্যানালের আলের ওপর দিয়ে আট-দশটা লোক গুন টানছে, আর বোটটা স্থির জলকে দুখানা করে রাজহংসের রাজসিক কেতায় এগোচ্ছে আস্তে আস্তে। বোটের মশালচি এসে কেরোসিনের একটা ডুম্ জেলেঁ দিয়ে গেল ঘরে, কেরোসিনের আলোটা হঠাৎ অলকের কাছে চমৎকার মনে হতে লাগল।—কেমন ম্লান, কেমন যেন করুণ! চোখে-খোঁচা-মারা আস্পর্ধা নেই ও'র গায়—গাঁয়ের মেয়ের ভুলে-ভরা শহুরে ভঙ্গিমাটির মত, ভারি মিষ্টি। ঘিয়ের প্রদীপ হলে হয়ত আরো আরাম দিত ও'কে।

হঠাৎ অলকের ডাক পড়ল কর্তার কামরা থেকে, অলক পড়ল মহা

ঝাঁপরে—এখন যায় কি করে? যেতে গেলে পরিচারিকাদের মহল মাড়িয়ে না হয় এগুলো স্নান-ঘর অবধি, তারপর? কর্ত্রীর ঘর ডিঙোবে কি করে? কাকে দিয়েই বা আগাম খবর দেয়? ও' চাকরদের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে এল—দেখে মাঝিটা হাল ধরে বসে আছে; তাকে বলল, বোটটাকে একটু বাঁধতে।

এরপর, অনেক চেঁচামিচি করে অনেক মেহনতের পর বোটটা বাঁধা হল। ও' বোট থেকে নেমে কর্তার ঘরে এসে হাজির হল। কর্তা অলকের দেরি দেখে চটেই খুন, তারপর অলক যখন বুঝিয়ে ও'র অসুবিধের কথা বললে—তখন কর্তা অবিলম্বে হুকুম করলেন কর্ত্রীর ঘর পরিবর্তনের। পরিচারিকারা এল অলকের কুঠরিতে, আর কর্ত্রীর শয্যা রচনা হল পরিচারিকাদের কামরায়। আর অলক এল কর্ত্রীর ঘরে, অর্থাৎ কিনা ঠিক কর্তার ঘরের পাশেই আর কি।

কর্তার ইচ্ছায় যখন কর্ম, তখন আর কার আপত্তি থাকতে পারে? কেবল কর্ত্রী আর অলকের মাঝখানে ঘটনাচক্রে রইল শুধু বাথরুমটার ব্যবধান। বাথরুমটার দুটো দরজা—একটা কর্ত্রীর ঘরের দিকে, আর একটা অলকের ঘরে।

এই বোটের যে স্থপতি তার উদ্দেশে আর কর্তার এমনিতর ঘর বদলের উন্মাদ ব্যবস্থায়—একশ ষাট মৌজা বড় তালুক পাণ্ডুয়া কাছারির জমিদার-গৃহিণী পঞ্চশ্রী শ্রীল শ্রীমুক্তা পাট্ট মহাদেই অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ পাটরাণী নবমঞ্জরি দেবী রাগে অপমানে বাইরে আগুন হয়ে উঠলেও তাঁর অন্তরের নিভৃত নির্জনে—এতদিনের উপবাসী অনাদৃত ক্রন্দসী হৃদয়, আজ কি যেন কি ভাগ্যের প্রভাত সংগীত শুনে কারাগার ভেঙে পাগলাঝোরার মত আগল খুলে বেরিয়ে আসার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে পাগল হয়ে উঠতে লাগল।

হায়রে—অলকের অলক্ষে বসে থাকা যে অজানা ভাগ্যদেবতা

মাকঁড়সার মত নিরন্তর জাল বুনে চলেছেন—তাতে কখন যে ফাঁদে ফেলে কাকে শিকার ধরবেন তিনি, তার সঠিক নির্দেশ আগাম যদি জানতে পারত কেউ।···

সারা রাত বোট চলেছে। সকাল হল। অভিজাত-মার্কা সকাল মানে বেলা একটা দেড়টা নয়, আমরা সাধারণতঃ যাকে সকাল বলে থাকি তাই, অর্থাৎ সাড়ে ছটা সাতটা হবে।

সোমপুর লক-গেটে এসে পৌঁচেছে বোট। লক-গেটের মধ্যে ঢোকবার তোড়জোড় চলেছে। মাঝিমাল্লা আমলা কর্মচারীর চিৎকার হৈ-চৈ-এ অলক জেগে উঠল।

লক-গেট বস্তুটা অনেকের কাছে গোলকধাঁধা বিশেষ মনে হতে পারে। অন্তত অলকের কাছে গোড়ায় গোড়ায় তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভোরের বেলায় অমনিতর হৈ-চৈ-এ ঘুম ভেঙে বোট থেকে নেমে পাড়ে এসে যখন ব্যাপারটা লক্ষ্য করল তখন একটা মজার আর ছেলেমানুসি উত্তেজনার আমেজ অনুভব করতে লাগল যেন মেজাজে।

ক্যানালের জলপথকে সান বাঁধানো ইমারতি চৌকাঠের ফাঁদে বিরাট দুপাটি দুপাটি করে চারপাটি কপাট দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে; আর তারই নাম ইংরেজী ভাষায় হয়েছে লক-গেট। এই ক্যানালের বিস্তৃত বহু শত মাইল জলপথ নিয়ন্ত্রিত করা হয় মাঝখানের এমনিধারা অনেকগুলি লক-গেটের মারফৎ। প্রকাণ্ড একটা সিমেণ্ট বাঁধান

জায়গা যেন বিশাল লম্বাটে ঘর একটি। যার এক এক দিকে ঐ এক এক জোড়া করে প্রকাণ্ড দরজা, প্রায় দোতলা সমান। প্রথমে এক পাশের দরজা খুলে বোটটাকে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেটা বন্ধ করে আর এক পাশের দরজা আস্তে আস্তে খুলে সেই ঘরটার মধ্যে জল ভর্তি করতে থাকে। তারপর সেই ঘরের জল যখন সামনের দিকের এগোবার জলপথের সমান সমতায় এসে হাজির হয়, তখন সে পাশের দরজাটা দেখা যায় বিলকুল খুলে গেছে। বোটটা তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে লক-গেটের বাইরে। এই ব্যাপারটা সমস্তই পাড়ে অবস্থিত একটি গোল চাকার মত জিনিসের কলকব্জা মারফৎ ঘটিত হয়। প্রত্যেক লক-গেট থেকে বেরুবার সময় একটা মাশুল লাগে।

এই লক-গেটের লাগাও, পাড়ে অবস্থিত ছোট একটি খড়ের বাংলো টাইপের ঘর আছে। তাতে একটি বাবু, দুটি কর্মচারী সরকার বাহাদুরের মাশুল ইত্যাদি আদায়রূপ বাহাদুরি দেখাবার জন্যে বাসা বেঁধে থাকেন। লক-গেট খোলা এবং বন্ধ করার এই বৃহৎ ব্যাপারটাও এঁদের কৃপা। এই বোটটাকেও লক-গেটের সেই ঘরের মত জায়গায় পুরে যখন তাতে আর এক পাশের উঁচু জলের সঙ্গে সমানে আনবার জন্যে জল ভর্তি করতে লাগল তখন বোটটা মুহূর্তে মুহূর্তে—নৃত্য-দোদুল হয়ে ভেসে উঠতে উঠতে উঠে এল ক্রমশঃ ওপরে।—ব্যাপারটা ভারি মজার মালুম হতে লাগল অলকের।

এবার এ-বোট লক-গেট পেরিয়েছে—পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমলাদের জন্যে বোট থেমেছে, পাতা হয়েছে পাড় থেকে বোটের গা অবধি যথাসম্ভব চওড়া এক কাঠের তক্তা। অলক বোটের ভিতরে

আসতে যাবে, দেখা হল নবমঞ্জরির সঙ্গে—মুখটি জানলার ধারে শুকতারার মত জেগে। ও'দের চোখে চোখে সকালবেলার সম্ভাষণ এমুনিধারা চাক্‌না মেরেই সমাধা হল যেন।

সেই চল্‌তি ট্রেনে অলক যা ও'র হাতটা ধরে সাবধান-বাণী প্রচার করেছিল—তারপর একটি কথাও আর হয় নি এর মধ্যে। আমলা কর্মচারীর ভীড়ে পরস্পরের নৈকট্যের নীড়-ভ্রষ্ট হয়েছিল ও'রা।

নবমঞ্জরি হাই তুলে আবার বুজলো তার চোখ। মাত্র এই দুদিনের বৈচিত্র্যে—অদ্ভুত বিচিত্র সে অনাস্বাদিত আস্বাদের একটা আঘ্রাণ, 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং'-এর মত হয়ে এতদিনের উপোসি আত্মাকে ও'র উন্মাদ করে তুলে ছিল, আদত স্বাদ সংগ্রহের ফিকিরে। অনাঘ্রত কুসুমের মত ও'র ঘুমন্ত কায়ার কোলে কোলে তখন ককিয়ে উঠেছে—সহস্র বাহু বিস্তারিত অগ্নিময় আমন্ত্রণ সহ কামনার দাবদাহি নিশ্বাস। নবমঞ্জরির নবনী-কোমল কায়ার তলায়, এত দিনের সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে জাগরণের উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। গলিত লাভার আলোড়ন যেন সংগোপনে অনুভব করল ও' ও'র সবিশেষ অঙ্গে—সেই আধ ঘুমের মধ্যে থেকেই। তাই কি পাশ-বালিশ বুকে আঁকড়ে ধরে বার বার ওলট-পালট খেতে লাগল অমনধারা ?

যাক, সকাল বেলায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘুম ভেঙে উঠল যখন সবাই, তখন সবে বেলা একটা! মুখ-হাত ধুয়ে চা খাওয়াটা একটু দেরিতেই হল—দুপুর দুটোয়।

নবমঞ্জরিও জেগেছে, সাঙ্গ করেছে সকাল বেলার খাবার পালা। পরিচারিকারা ঘিরে বসেছে ও'কে রোজকার মতন। রোজকার মতনই তারা পেতেছে দশ পঁচিশের ছক্‌খানা।

কিন্তু নবমঞ্জরির মন অন্য চিন্তায় আজ উধাও···ভাবছিল ও' অলকের কথা—মনে মনে আঁকছিল বিশেষরূপে অলকের অবয়বখানা হয়তো—

সত্যিই অলককে নবমঞ্জরি নজর করেছিল যেন অজানা আশার আশাতিত অরুণ উচ্ছ্বাসের মত! যার আলো—সম্ভাবনার সম্ভাষণে, দশ মাস নইলে অন্ততঃ পক্ষে, আট মাসের মতন তো অন্তঃসত্ত্বা। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া অচেতন অসাড় নবমঞ্জরির জীবনে এবার বরাত যেন করাতের মত কোথায় চিরতে শুরু করেছে—তার ব্যথার ইশারা—কি জানি কেমন করে মিলেছে ও'র সারা সত্তার সর্বাঙ্গময়, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে বেঁকেছে সে বেদনা, কোন্ কুটিল-চক্রপথে চলেছে তার শাণিত বক্রগতি, অবচেতনার আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি আঁকলেও এখনও তার সঠিক হদিস—চেতন জগতে পরিপূর্ণ পাকড়াও করা সম্ভব হয় নি।

অলক বোট থেকে কখন পাড়ে নেমে পড়েছে। তারপর চলন্ত বোটের সঙ্গে সঙ্গেই হেঁটে চলেছে গাছের ছায়ায় ছায়ায়—হঠাৎ ও' ছেলে-বেলাকার তৈরি নিজের একটা গানের কলি আপন মনে গুণ গুণ করে উঠল—

মন বলে ওগো, বেদনা—বেদনা—
আমি বলি তারে কেঁদনা! কেঁদনা—

একদা অলক কবিতা লিখত, লিখত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, একধারসে সব কিছু। মনে পড়ল বাংলা মাসিক-মহলের অনেকেই দস্তুরমত ও'র নামডাকের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—তার জোরেইতো উপন্যাস লেখবার নামে মাস্টারমশাই অর্থাৎ বীরেন ঘোষের কাছ থেকে

অপ্রিয় তিনশো টাকা, সেই বারো বছর আগে কোপ মারা সম্ভব হয়েছিল, আর যা শোধ করা আজো অবধি সম্ভব হল না। সম্ভাবনার ভ্রূণহত্যা হয়ে গেছে, হয় তো বা নিজেই করেছে। যাক সে অতীতের কথা—অতীত মার্কা প্রতিক্ষণ। তলিয়ে যাক তিমিরময় তমসায়, তারপর আবার সেই তমিস্রাতীর্থে তিক্ষ্ণ তরবারীর আঘাত হেনে বিদির্ণ করে বেরিয়ে আসবে প্রতিটি মুহূর্ত নব কলেবরে নিত্য নতুন বর্তমানের বেদিতে। নতুন মঞ্চালোকে ভূপতীত হবে নতুন ভূমিকায় আনকোরা সব নায়ক-নায়িকার ভীড়—নতুন সমস্যা, নতুন ঘটনা, এই তো জীবন! তাই একথা ও' ভাল করেই বোঝে।

কিন্তু আপাততঃ কি হবে?......,

অলক যে ও'র গানের বাকী লাইনগুলোর হারিয়ে ফেলেছে খেই—মনে পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে না—

ও' ধনি ও' রূপের ফণি—
বাহুর ডোরে রাহুর মত
আমারে তুমি আর বেঁধোনা—
মন বলে ওগো, বেদনা—বেদনা—
আমি বলি তারে, কেঁদনা—কেঁদনা—

নাঃ, ঠিক হলনা, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল লাগছে শেষকালটায়। বিস্মৃতির বন্যায় গানের রেল লাইনে বিলকুল ব্রিচ্ ঘটেছে। অতএব বাকীটা—শিস-টানার ট্রলিতে চড়েই ও' পার হবার মতলবী। ও' বেড়ে শিস টানতে পারে, দুপুরের দোয়েলের মত শিস দিতে দিতে এগিয়ে চলতে লাগল—বোটের মন্থর গতির সঙ্গে সঙ্গে। তখন উর্ধ্বলোকে মধ্য-দিনের উত্তাপ ধাপে ধাপে আরো ওপরে চড়তে শুরু করেছে। অলক এবার অনুভব করল স্নানের আবশ্যকতা। একবার ভাবল, ক্যানালের কোলে সমর্পণ করে যদি

ও' নিজের শরীরটাকে—ওঃ কি আরাম! কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, যে ও' জমিদারের প্রাইভেট-সেক্রেটারি রূপ একটি জন্তু। যার পক্ষে হয় তো অন্যায় হবে ক্যানালের জলে সন্তরণের প্রচেষ্টা করে যদি—হয় তো জমিদারের সম্মান অমনিতর বে-কায়দায়—চিৎপটাং হবে। দরকার নেই অত গোলমালে পা গলিয়ে, তার চেয়ে বোটের বাথরুমই নিরাপদ।

ও' বোটটা পাড়ে লাগাতে বললে মাঝিকে। অলক, বোটটা পাড়ে লাগাতেই, জানলা গলে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল—সটাং। পাড় থেকে তক্তা পেতে 'গ্যাংওয়ে' তৈরি করা রূপ হাঙ্গামার অবসরই দিলনা ও' কাউকে। ও' নিজের ঘরে ঢোকার এই সহজ পন্থা নিজেই আবিষ্কার করেছিল।

ঘামে ভেজা গেঞ্জিটা পাঞ্জাবি সমেত খুলে ছুঁড়ে দিলে অদূরে বিছানার ওপর, তারপর বাথরুমে দরজা ঠেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লাগল ধাক্কা······

একটি মুহূর্ত মাত্র শুধু, ঝড়ের রাতে বিদ্যুতের আলোয়-দেখা পৃথিবীর আদিম উলঙ্গ রূপ যেন—বিবস্ত্র শরীর বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া অজস্র জলের ফোঁটাগুলোর ফাঁক দিয়ে বর্ষায়-ভেজা-মাটির মত নরম সে সকরুণ স্নিগ্ধতা···এক লহমার নজরেই—অনন্ত কালের জন্যে ও'র অন্তরকে যেন উর্বর করে তুলেছিল। কিন্তু বাইরে ও' তখন এই অকস্মাৎ ঘটনার আকস্মিকতায় বজ্রাঘাতের মত লজ্জাঘাতে, বিমূঢ় হ'য়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল নিজের ঘরে।

বাথরুমের ও'র দিকের খোলা দরজাটাকে যে ভেজিয়ে দেওয়া উচিত, এমন বুদ্ধিটারও উপস্থিত অভাব ঘটেছিল ও'র ঘটে। সাপের মত সরু লীলায়িত একটা হাত তৎক্ষণে বেরিয়ে এসে আল্‌তো করে দরজা টেনে ছিট্‌কিনি এঁটে দিয়েছিল তখন ভিতর থেকে।

নগ্নতা নজর করার নেশা কিংবা উলঙ্গ অঙ্গ অবলোকনের কৌতূহলী চিত্ত কোনটাই ও'র নেই। এটা চুনের ঘরে দাঁড়িয়ে অলক দ্বিধাহীন দিব্বি গাল্‌তে পারে। তবু নেশায় নাজেহাল অন্তস্থল! এ-অবস্থা হল কেন তবে?

সত্যিই অমনিধারা অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় ও'র পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়—কেমন করে সম্ভব হবে? ও-দেশে থাকতে নারীর নগ্নদেহ, আর্টিস্টের মডেল হিসেবে, নিরাভরণ উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য-পটীয়সী হিসেবে, ঝুড়ি ঝুড়ি দেখেছে—ইয়ত্তা নেই সে-সবের।

মরুভূমির নগ্ন নির্লজ্জ দেহের মত উত্তাপিত অসংকোচ সে চেহারা-গুলো সব, চোখে রুক্ষ আস্পর্ধায় আস্ফালন করতে পারে—কিন্তু সলজ্জ শ্যামলতা কোথায় তাতে? তা দেখে নেশার সুর্‌মায় রঞ্জিত হয় না যে চোখ! কিন্তু এটা কি হল আজ?···দরজাটা ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছিল, না ভাগ্যের চক্রান্তে হয়েছিল এ ভুল? ও' বুঝতে পারল না ঠিক।

ও' ভাবতে লাগল: এই স্নানরতা শরীর···শ্রাবণের অঝোর ধারা-বর্ষণে—বিদ্যুতের-আলোয়-দেখা বসুন্ধরার বিবসনা দেহ যেন! সাংসুমা ভাসের মতই মসৃণ সে সর্বাঙ্গ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল, ঝরে ঝরে পড়ছে—বেদনার সমুদ্র মন্থন শেষে উঠে এসেছে অশ্রুর উর্বশী! উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের বিশৃঙ্খল কামনার প্রলাপ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এ-দৃশ্য অলকের অন্তরে এনেছিল যে বর্ষার বুঁদ হয়ে যাওয়া নেশা!

ও' চলন্ত বোটের জানলা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—শরতের দিগম্বর অনন্ত অম্বরখানির উদাস অবয়ব! ভুলে গেল নিজের স্নান। বিকেল পাঁচটার সময় যখন ভাত বেড়েছে ও'র জন্যে, তখনো ও'র খেয়াল নেই।

তবু অলক এখন থেকে হল অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কেন যে এত

সাবধান হল অলক, তা' ও' নিজেই জানে না। বাথরুমের দিক দিয়েই ও' আর গেল না। চাকরির মায়া? কেলেঙ্কারির ভয়? কিন্তু এই দুটোর একটারও জন্যে ভারিতো কেয়ার করে ও'! কিন্তু তবুও কি জানি কেন ও' হল একান্ত সাবধান। বোট যখন বাঁধতো, তখন গ্রামের মধ্যে সেঁধিয়ে অন্যান্য আমলাদের সঙ্গে স্নান সমাপন শেষে ফিরে আসতো! এ ছাড়া যদিও অনভ্যস্থ, তবু, অসুবিধা সত্ত্বেও প্রকৃতির আহ্বান প্রকৃতির কোলে বসেই সমাধানে অভ্যস্থ হয়ে উঠল এ-কদিনেই।

এবার বজরাখানা যাত্রার শেষ সীমায় এসে পৌছল—অর্থাৎ রহমায়। এখান থেকেই বলতে গেলে একরকম পাণ্ডুয়া তালুকের সীমানার শুরু হয়েছে। রহমায় নেমে পাল্কিতে প্রায় দশ মাইল পথ গেলে তারপর পাণ্ডুয়া গ্রাম, যেখানে কাছারি আর জমিদারের বাসভবন অবস্থিত।

পাণ্ডুয়ায় এবারকার পুণ্যাহের তোড়জোড় খুব জাঁকালো। স্বয়ং জমিদার উপস্থিত থাকবেন পুণ্যাহের সময়—এ একটা অভাবনীয় ঘটনা। অনুপস্থিত জমিদার, বিশ বছরে একবার হয়ত পদার্পণ ঘটে। প্রজামণ্ডলীর মনে এই অনুপস্থিত জমিদার—একটা সুদুর্লভ বস্তু। অনেকটা দেবতার সামিল। তাই এই অনুপস্থিত জমিদারের উপস্থিত দর্শন লাভের আগ্রহ তাদের তরফ থেকে বিরাট অভ্যর্থনায়, বিপুল উৎসব আয়োজনে সচরাচর প্রকাশ পেয়ে থাকে।

পাণ্ডুয়া গ্রাম আমাদের কর্তার আগমন উপলক্ষ্যে এখন অবধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারেনি। সাজ-সজ্জার এখনও অনেক বাকী, তাই সদরের লোকেরা আরও একদিন রহমায়, এই বোটেই সকলে থাকবে স্থির হল। তারপর পরের দিনের পরদিন সকালে, সকলে রওনা হবে পাণ্ডুয়া গ্রামের অভিমুখে। উপযুক্ত সমারোহের মধ্যে দিয়ে।

রহমাটা ছোট্ট যায়গা। একটা চার হাত লম্বা চওড়া খড়ের খুপ্‌রিতে সাব-পোস্টঅফিস—আর কটা চালের গুদোম, এই জায়গাটার পদমর্যাদা অধিক করেছে, অন্য অনেক গ্রামের চেয়েও।

অলক ঠিক করল, কিছুটা ঘোরাফেরা করে তারপর চালের গুদোমওয়ালাদের উদ্দেশে রওনা হবে! যদিও ব্যবসায়ে ও' ক-অক্ষর

গোমাংস, তবুও তারা কি করে না করে, তাদের ব্যবসার হাল-চাল জানার একটা অহেতুক কৌতূহল ও'র মনের কোণে কাতুকুতু লাগিয়েছে। দুনিয়ার সব ব্যাপারেই ও'র অসামান্য ঔৎসুক্য—সব কিছু জানার কৌতূহলে ও' সব সময় যেন চঞ্চল।

অলক তখন নেমেছে বোট থেকে। তারপর কতকটা এ-দিক ও-দিক ঘুরে এসে—সামনের বড় ধানের গুদোমওয়ালার সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই জমিয়ে নিয়েছে, বাংলা মেশানো উড়িয়া ভাষার মারফৎ। উড়িয়া ভাষাকে এ-কদিনেই অনেকটা ও' কাত্ করতে পেরেছে।

একে বড় তালুকের স্বয়ং হুজুরের খাশ সঙ্গের লোক, তাতে, অলকের মত বেজায় মিশুকে আদমি। আলাপ জমতে মোটেই সময় লাগল না। অলকের জন্যে গুয়া, গুণ্ডি, পান, এল—বিশেষ আসন দেওয়া হল ও'র বসবার জন্যে তক্তাপোষে বিছিয়ে। অলক তখন কথোপকথনের ছলে এদের ব্যবসার খবর সংগ্রহে ব্যস্ত। গুদোমওয়ালার সঙ্গে কারবারের হালচালের আলোচনায় ও' বুঝল :—এই বড় তালুকের অধিকাংশ ধানই আগাম এদের করতলগত হয়, এমন কি অনেক সময় ধান জন্মাবার আগেই অনেক গরিব চাষীরা আগাম ভাবী ধান বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে যায়। আর জমিদারের কিস্তির তাড়নাই তার প্রধান কারণ।

অলক বুঝল এই গুদোমওয়ালারাই সস্তা দরে এ-অঞ্চলের সমস্ত ধান শুষে নিয়ে মোটা লাভে নানা শহরে সেগুলো উদ্গার করে বেড়ায় আবশ্যক অনুযায়ী।

এবার অলক সম্ভাষণ শেষে যখন উঠতে যাবে—গুদোমের মালিক গলায় কাপড়ের খুঁট জড়িয়ে জোড় হাত করে এসে হাজির। বড় তালুকের কাছারিতে তার জমি খরিদের কবুলিয়ৎ খানা সেরাস্তা থেকে আজও মঞ্জুরনামা পেল না। অলক যদি তাড়াতাড়ি মঞ্জুরনামা পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেয় তো, ও' চিরকৃতজ্ঞ থাকবে অলকের শ্রীচরণে। এরপর গুদোমের মালিকের হাতের বদ্ধ-মুঠিটা অলকের হাতের চেটোর মধ্যে খুলে গেল—পাঁচ টাকার একটা নোট!

অলক রাগল না, তার বদলে মুচকে হাসল, ও' বুঝতে পারল সবই। আমলাদের রীতিনীতিতে ও' হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়।

এবার ও' বাইরে বেরিয়ে এল—গুদোমের মালিক চলেছে ও'র পিছনে পিছনে। গুদোমের বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট্ট গ্রামের ছেলে ও'কে দেখে দণ্ডবৎ হয়ে অর্থাৎ গড় হয়ে প্রণাম করল। অলক এবার ছেলেটিকে ঐ ধুলো থেকে তুলে নিয়ে, কারুর কাছেই মাথা অমনি করে নত করা উচিত নয় বলে উপদেশ দেবার ইচ্ছে করল—কিন্তু পরিবেশ স্মরণ হওয়ায় মনের ইচ্ছে মনেই চেপে গেল। তার বদলে, সেই হাতে ধরে থাকা পাঁচ টাকার নোটটা হস্তান্তর করে অব্যাহতি পেল যেন। শোষক সম্প্রদায়ের প্রতীক আমলাদের মধ্যে এ-আমেরী, গুদোমের মালিকের কাছে বেজায় বেয়াড়া লাগল। এমন কি বোকামি বলে বোধ হল। অলক তখন আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে এগিয়ে চলল। গুদোমের মালিক ট্যাঁক থেকে একটা চকচকে রুপোর টাকা ছেলেটাকে দেখাল এবং ঐ ছেঁড়া কাগজটা বদলে নেবার প্রস্তাব জানাল। ছেলেটা মহা খুশি। গুদোমের মালিক একটা টাকায় ঐ পাঁচ টাকার নোটটা পেয়ে এই নতুন বহাল বাঙালী আমলার বোকামি সংশোধন করে নিল নিজেই।

অলক পথে বেরিয়ে ভাবল, খাওয়ার তো এখন বহুৎ দেরি। আর একটু গ্রামের মধ্যে সেঁধিয়ে ঘোরাফেরা করে তারপর ও' বোটে ফিরবে। ও' এগিয়েছে গ্রামের পথে, এমন সময় নজরে পড়ল নানা রংয়ের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত বহুলোকের সমাগম! গ্রামের পথ গম্‌গম্‌ করছে এখন। তারপর দেখল, দূরের প্রকাণ্ড বটগাছের চারিপাশে মানুষের মৌসুমী, জিগেস করে জানল, আজ হাটের দিন। ও' বটগাছটা লক্ষ্য করে হাটের অভিমুখে এগোতে লাগল। কত রকম জিনিসপত্তর। টুকিটাকি কত কি, ইয়ত্তা আছে কি তার? তরি-তরকারি খাবার থেকে শুরু করে কাঁচা শাক-সবজি, মাছ-মাংস, প্রসাধনের নানা বিচিত্র সম্ভার—আয়না, চিরুনি, পুঁথির মালা, সবই আছে। যে যার জিনিসপত্তর সব মাটিতে বিছিয়ে—চলেছে কেনা-বেচার চিরন্তনতা—চিরাচরিত অতি সহজ পন্থায়! মেয়ে পুরুষ ছেলের দলে জায়গাটা হয়ে উঠেছে অপূর্ব। এখানকার মেয়েদের চেহারাগুলো' ও'র কাছে চমৎকার লাগল। জমাট যৌবনের জৌলুষের ওপর হলুদমাখা গা-গুলো নিছক পাকা সোনার মত! যেমন নরম—তেমনি নিরেট। নাকে নথের কারুতা, মুন্সিয়ানা মালুম করায়। চুলের খোঁপাগুলো, খোপার মত মাথার মধ্যিখান থেকে উইয়ের ঢিবি হয়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে। তার শেষ প্রান্তে রুপোর ঝুমকোগুলোর ঝনৎকার চিত্তচাঞ্চল্য আনে। এখানকার মেয়েদের কাপড় পরার কায়দাটাই কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর মনে হল ও'র। হাঁটুর ওপর অবধি থাকে তার প্রান্ত। বাইরে থেকে বোঝা না-গেলেও, ভিতর দিয়ে কাছার মতন দিয়েছে তার একটা দিক, তাতে একটা উরুতদেশ মজার রকম উলঙ্গ—যার আবেদন অসম্ভব। হলিউডে এই চাল চালান করলে চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়া যেত ফ্যাশন আবিষ্কারকদের—এই কথাই ভাবছিল তখন অলক। যাক, ঘোরাফেরা করে অলক এবার ফিরেছে, বোট যেখানে বাঁধা আছে।

বোটের জানলাগুলো সব বন্ধ···বেয়াড়া রোদের উৎসুক আস্পর্ধাময় উঁকিঝুঁকি যেন আভিজাত্যের অঙ্গ স্পর্শ করার মতলবী—সে বেয়াদপি এঁদের অসহ্য। তাই তো বোটের চারিধারের দরজা জানালা বন্ধ করে দিনের বেলায় রাত্রি তৈরি করে এরা ঘুমোয়।

অলক মনে মনে এদের পেচক বংশের পিস্‌তুত আত্মীয় বলে বহুবার স্মরণ করেছে। আজকেও এই পেচক বংশের সঙ্গে এদের আরো অন্যান্য সম্পর্কের সন্ধান করতে করতে, ও' বোটের থেকে পাড়ে পেতে রাখা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে না গিয়ে, বন্ধ জানলার একটা ঠেলে টপকে ভেতর আসতেই নাকে এল একটা অদ্ভুত সুগন্ধ। দেখে, অন্ধকার ঘরে কে যেন আগে থেকেই রয়েছে—কে যেন ও'র টেবিলে-রাখা কাগজ-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ও' ঘরে ঢুকতেই সে যেন বাথরুম দিয়ে ফস্কে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, অলক বাথরুমের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল এমন ভাবে, যে চোরের ধরা-না-পড়ে আর কোন পন্থা ছিল না।

বিকেল বেলায় বেহারা এসে যখন জানলাগুলো খুলে দিল, ও' চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এল আয়নার সামনে, চুলটা আঁচড়ে বাইরে বেরোবে বলে। দেখল—কপালে লেগে চন্দনের শুকিয়ে যাওয়া গুঁড়োগুলো, ঠোঁঠে লিপস্টিকের দাগ তখনো ডগ্‌ডগ্‌ করছে। একবার ভাবল, দাগগুলো থাক। চন্দ্রের চিরন্তন দাগের মতই থাকুক লেগে ও'র কপালে এ-চিহ্নগুলো কলঙ্কের মত। কিন্তু তারপর কি জানি কি ভেবে ও' ধুতির খুঁটোটা দিয়ে কপালে চন্দনের গুঁড়িয়ে যাওয়া টুকরোগুলো উঠিয়ে ফেলল ভাল করে, তারপর ঠোঁঠটা লিপস্টিকের

দাগ ওঠাতে ঘষে ছিঁড়ে ফেলবার দাখিল করল, কিন্তু চুলে খসখসের খস্‌বু আর গায়ে নাছোড়বান্দা আতরের আমেজ কিছুতেই ছাড়তে চাইলনা ও'কে।

'হাম ছোড়নে মাংতা, মগর কম্‌লি নেহি ছোড়তা'র দাখিল—

সাত হাত অবধি সকলের সামনে চিৎকার করে ছড়াতে লাগল তাদের অশরীরি অস্তিত্ব।

অলক ভেবেছিল একটু বাইরে বেরিয়ে, ক্যানালের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে হিসেব-নিকেশ করবে হৃদয়লোকের। কিন্তু এর পর তা আর সম্ভব হল না। ও' শরীর অসুস্থতার ভান করে সর্বাঙ্গে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল মটকা মেরে।

ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাঁসর, ঘন্টার বিপুল এক বিশ্রী আওয়াজের মধ্যে ও' যখন চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানায় উঠে বসল—তখন পরের দিনের সকাল অনেক দূর অবধি হাত বাড়িয়েছে দুপুরের বুকে। অলক ঘরের একটা জানলা খুলতেই দেখল ক্যানালের পাড়ে গোটা ছয়েক পাল্কি সারি সারি যেন সাজানো, তার মধ্যে দুখানা বেশ বড়—মানে দিব্বি ছ'ফুট লম্বা লোক সিধে হয়ে স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকতে পারে তার মধ্যে। সেই পাল্কির একটার মাথায় নানা রঙের কারুকার্যওয়ালা চমৎকার চাঁদোয়ার মত জিনিস ঝালর সমেত ঝুলছে। আর একটায় জরির বুটিদার বেনারসির ঘেরাটোপ। পাল্কি বেহারাদের কাঁধ দেওয়ার লম্বা ডাণ্ডিটার শেষে মকরের মুখ, আর পাল্কির গায়েও কাঠের খোদাই করা নানা রকমের বিচিত্র নক্সা। অলক বুঝল এই দুটো হচ্ছে জমিদার

ও জমিদার-পত্নীর জন্যে। বাকিগুলো ওর' এবং পরিচারিকাদের জন্যে হবে হয়তো!

…জীবনে পাল্কি চড়ার সৌভাগ্য অলকের ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। বিংশ শতাব্দীর শরীরে পা দেওয়া থাকলেও সেটাও হয়ে গেল এবার। আদিম যুগের এ-অভিজ্ঞতার আশায়, উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল ও'। মানুষ হয়ে মানুষের ঘাড়ে চড়ে চলা ও'র কাছে সত্যিই একটা গল্পে পড়া জিনিস গোচর করার মতই কতকটা।

কর্তার আর কর্ত্রীর পাল্কির ভিতরে তখন মখ্‌মলের মছলন্দ্‌ পাতা আরম্ভ হয়েছে। ও'দের গুলোতেও চলেছে সাধারণ বিছানা পাতার ব্যবস্থা। কোথাও তোড়জোড়ের কিছু কমতি নেই।…পাণ্ডুয়া কাছারির অনেকেই এগিয়ে এসেছে রহমায় কর্তা আর কর্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে। কাছারির জ্যোতিষ নিত্যানন্দ মহাপাত্র এসেছে—তার তালপাতার পুঁথি-পত্তরের পুঁটলি সমেত। বোটের থেকে পারে ওঠবার জন্যে পাতা তক্তাখানায়, কর্তা আর কর্ত্রীমার পদচারণের উপযুক্ত করার অভিপ্রায় তাতে টেম্পরারি রেলিং তৈরি করতে 'বড়াই'—অর্থাৎ ছুতোরের চলেছে কেরামতি।

দূরে গাছের ছায়ায় জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্কি বেহারাদের চেহারাগুলো কিন্তু চমৎকার! লম্বা ছিপ্‌ছিপে, নন্দলালের শান্তিনিকেতনী ঢংয়ের ছবির মতই অনেকটা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো, টুকরো কাপড়ের ফালি দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা। কানে সোনার ফাঁসি। কাঁধে গামছা জাতীয় কাপড়, যেটার ওপর পাল্কির কাঁধ দেওয়ার জন্যে লম্বা ডাণ্ডার ভার পড়লে কতকটা কষ্ট লাঘব করে। তবু তো কাঁধ দুটোর মাংসগুলো ওদের ফুলে ফুলে আবের মত হয়ে উঠেছে।

পাল্কিচড়া পালার উদ্যোগপর্ব অলকের পছন্দমতই হয়েছে বোঝা গেল।

কর্তা আর কর্ত্রী এবার পাল্কিতে উঠবেন। সামনে প্রকাণ্ড মাছ রাখা হয়েছে একটা রুপোর রেকাবিতে। রুপোর বাটিতে দই। কর্তা আর কর্ত্রীর কপালে দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দিলে জ্যোতিষ নিত্যানন্দ—তাঁদের পাল্কি চড়ার প্রারম্ভে। তারপর পাল্কির সামনে যে আমের পাতা সাজানো পূর্ণ কুম্ভের উপর ডাব বসানো—সেটাও তাঁদের দর্শন করানো হল। এ-সবগুলো শুভযাত্রার আনুষঙ্গিক—মেনে চলতে হয়।

ধাঁই কুড়্ ধাঁই, ধাঁই কুড়্ ধাই···

প্রায় জনা চল্লিশ পাল্কি বেহারার এই অদ্ভুত ধ্বনিতে গ্রামের পথ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মনে হল যেন জটায়ুপাখী রাবণের হাতে আহত হয়ে গোঙাচ্ছে। এবার পাল্কিগুলো একটু এগোতেই দেখা গেল, জমিদারের শুভাগমনে রচিত হয়েছে তোরণ। আর তার ওপরে শালুর লাল কাপড়ে সাদা তুলো দিয়ে লেখা রয়েছে 'গড সেভ্ আওয়ার গড্' অলক এবার এই দৃশ্যে, বিশেষ করে ঐ 'গড্ সেভ আওয়ার গড্' এই লেখাটায়, নিজের মনে হেসেই খুন। গ্রামের লোকরা সব সেখানে, সেই তোরণের সামনে, নানা উপঢৌকন নিয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা আশে পাশে কুঁড়ে ঘরের দরজার আড়ালে, ঢেঁকিশালার আনাচে-কানাচে থেকে উঁকিঝুঁকি সহকারে তাদের 'রজ্জা' কিনা রাজার রূপ দেখার জন্যে ব্যগ্র ব্যাকুল চোরা-চাহনির ব্যাক্সট্ নিক্ষেপ করছে থেকে থেকে···

পাল্কিগুলো তোরণ পেরিয়ে আবার চলল। গাঁয়ের লোকেরা সেই দূর থেকেই—কেউ সাষ্টাঙ্গে, কেউ ছুটতে ছুটতে এসে, পাল্কির কাছ ঘেঁষে, পদধূলি সংগ্রহ করতে পাগল। ব্রাহ্মণেরা দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে জমিদারের আগমনের জন্যে বিশেষভাবে রচিত স্তোত্র এবং শ্লোক উচ্চারণে গ্রামের পথ উচ্চকিত করে তুলল।

দেখা গেল, পাণ্ডুয়া কাছারি পৌঁছতে যে কটা গ্রাম পেরোতে হয়, সেই সব কটা গ্রামে, এক একটা করে তোরণ তৈরি হয়েছে। তার পর সেই সেই গ্রামের সর্দাররা এসে দাঁড়িয়ে সেলামি, ভেটি ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করছে জমিদার দর্শনের আশায়। ভবানীর পোয়া বারো! সেলামির টাকাগুলো হাতাতে, আর হিসেবে এদিক ওদিক করার সুযোগ পেতে এমনিতর একটা ঘটনা না হলে তা কেমন করে সম্ভব হয়। তাই এসব যায়গায় ও'র মোড়লি দেখে কে! ভবানী যেন নবযৌবন ফিরে পেয়েছে। ও' জমায়েত প্রজাদগুলীর মাঝে চর্কি-বাজির মত চক্কর খেয়ে বেড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

রহমা থেকে পাণ্ডুয়া কাছারি প্রায় দশ মাইলটাক হবে। কিন্তু এই দশ মাইল পথ পাল্কিতে পেরোতে রাত্র দশটা বেজে গেল। প্রত্যেক গ্রামের তোরণের সামনে জমায়েত প্রজাদের সম্মানজড়িত সম্ভাষণের গুরুপাক হজম করা কি সহজ কথা!

পাণ্ডুয়া কাছারির আগের গ্রাম, হাতিকানায় যখন পাল্কিগুলো সগৌরবে এসে পৌঁচেছে, তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোয় ধানক্ষেত, গ্রাম, সবশুদ্ধ মিলিয়ে রচনা হয়েছে একটি রহস্যাচ্ছন্ন রূপরাজ্য—স্বপ্নের মত ঝাপ্‌সা, নিও-বেঙ্গল স্কুলের ছবি যেন! আগাগোড়া চাঁদের আলোর একটা ওয়াশ্‌ মেরে করা হয়েছে তা অস্পষ্টতায় অপরূপ।

পাল্কিতে—নরম তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে, মানুষের কাঁধে নাচতে নাচতে চলেছে অলক, ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে। মনের ওপর দিয়ে অজানা ভবিষ্যতের একটা রহস্যময় প্রলেপ। বাইরেও ঐ ধরা-ছোঁয়ার অতীত প্রকৃতির মোহময় রূপ। ও'র মনকে প্রাচ্য দেশের আবহাওয়ার অহিফেনের মৌতাতে, যেন পেড়ে ফেলার আয়োজন করে দিয়েছে।

অতীত কালে পাণ্ডুয়ার অধীশ্বর ষণ্ড রাজার আমলের হাতিখানা অর্থাৎ হাতির আস্তাবল ছিল নাকি এই হাতিকানা গ্রাম। পূর্বের সেই হাতিখানা এখনকার হাতিকানায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে কিংবদন্তী। এই হাতিকানার পরেই সেই পাণ্ডুয়া গ্রাম, যেখানে এই একশত যাট মৌজার কাছারি—অর্থাৎ মফস্বল হেডকোয়ার্টার।

এই জমিদারির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন পশ্চিমেশ্বর মহাদেব, সেখানকার বড় পাণ্ডা হাতিকানায় এগিয়ে এসেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে মহাদেবের মাথায় ছোঁয়ানো বিল্বপত্র আর ডালিমভোগ। মন্দিরের পরিছা নিয়ে এসেছে, শিরপা অর্থাৎ শিরস্ত্রাণ আর একটি স্বর্ণ মুদ্রা—রাজার জন্যে। এই সম্মান আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, তাই আমাদের কর্তাও এই সম্মানের আপাততঃ অধিকারী হয়েছেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে না হলেও, খরিদ-লব্ধ সূত্রে ত বটে। মন্দিরের জায়গীর-প্রাপ্ত বিশেষ ডোমের দল এসেছে ঢাক আর বাদ্যি সমেত। চারিধারে বড় বড় মশাল জ্বেলে, নিরীহ নিশীথের সেই নিবিড় রূপকে পরিবর্তিত করেছে একটা উৎকট উল্লাস, আর কৌতূহল বিজড়িত বিচিত্রতায়।

পাণ্ডুয়াগ্রামে যখন হুম্‌কি মারতে মারতে পাল্কির সারি এসে পৌঁছল,

তখন ঢাক, ঢোল, কাঁসি, ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশটি গাদা বন্দুকের ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দনের শেষে ম্যানেজার বাবু রুপোর থালায় সুবর্ণ মুদ্রা কিনা গিনির দর্শনী সমেত দর্শন করলেন কর্তা আর কর্ত্রীমার সঙ্গে।

অলক আশা করেছিল গাদা বন্দুকের জায়গায় সেই তোপ আর তোপিনীর হুংকার শুনতে পাবে; কিন্তু সে বিষয় ও'কে আপাততঃ নিরাশ হতে হল।

শরতের সকাল—সত্যিকারের সকাল। অভিজাত-মার্কা বেলা দুটোর সকাল নয়। আকাশ স্বচ্ছ নীল। পৃথিবীটাকে পরম চমৎকার লাগল। বিলেতে, রাতের বেলা স্নানের পর পালকের পালঙ্কে শুয়ে, শরীরটাকে ছড়ানোর মত অপূর্ব আরাম অনুভব করতে লাগল ও' মনে মনে।

প্রকাণ্ড পাঁচিল দিয়ে তিন পাশ ঘেরা এই কুঠি-বাড়ি অর্থাৎ কর্তার আবাস। একতলা বাড়ি। ছিমছাম বাংলোবাড়ির পাকা ছাতওয়ালা বড় সংস্করণ। দুপাশের টানা বারান্দা দুটো সব চেয়ে পছন্দ অলকের। এই বারান্দা থেকে পাঁচিলবর্জিত পূর্ব দিকটার দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখে ও' কাটিয়ে দিতে পারে। একটু বাঁ পাশে একটা সানবাঁধানো প্রকাণ্ড বকুল গাছ, অজস্র ঝরা বকুলে তার তলাটা ভরে। বকুলের মিষ্টি গন্ধে ভারাক্রান্ত হাওয়ায় ও' ফুসফুসটাকে ফুলিয়ে তুলে ভর্তি করে নিতে চাইছিল—ফুটবলের ব্লাডারের মত! এত দিন ও-দেশে যন্ত্রচালিত তড়িৎগতির মধ্যে থেকে হঠাৎ এই অনন্তের মহিমা ও'র হৃদয় স্পর্শ করেছে—সকল আন্তরিকতার সঙ্গে। এই সকালে, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ও'র সত্যি সত্যিই মনে হতে লাগল: সময় অনন্ত, জীবন অনন্ত, ও' যেন অমর—মৃত্যু নেই ও'র। শেষহীন অলস অবসর শুধু উপভোগের জন্যে অঞ্জলি ভরে ও'র উদ্দেশ্যে এগিয়ে ধরেছে কে।

ও'র ঘরটা ছোট। ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তাতে কেরোসিন তেলের বড় একটা ডুম্। খাতাপত্তর রাখবার একটা র‍্যাক। আর একপাশে একটা টেবিলে একটা কি কো ফ্যান—কেরোসিনের আগুনে সেটা চলে। সেটা চালাবার কোনো দরকার হয় বলেতো ও'র মনে হল না। হু-হু করছে হাওয়া, এত হাওয়া যে মাঝে মাঝে ভুল হয় বুঝি বা ঝড় উঠেছে। প্রান্তরের শেষ প্রান্তের শংকিনী নদী, দূর থেকে রুপোর তৈরি হেলে হারের মত এঁকে বেঁকে চিক্ চিক্ করছে—চমৎকার, চমৎকার! ও'র ঘরে বসে পূবের বড় জানলাটা খুলে দিলেই বারান্দা। তারপর সেই বারান্দার পর ধূ ধূ করছে বসুন্ধরার এই বিস্তৃতি। ওপরে আকাশ। নীচে পৃথিবী। গাছ নেই পালা নেই, চোখ যেন বল্গা ছেঁড়া বল্গা হরিণের মত শ্লথ মনের স্লেজ টাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় তার ওপর দিয়ে।

• •

অলকের ঘরের পশ্চিম পাশে বড় হল্‌টা হচ্ছে কর্তার। কিন্তু ঠিক ও'র ঘরের গায় ঘেঁষ লাগানো যে ছোট্ট ঘরটা—সেটা মশালচির। কেরোসিন, বাতির সলতে, ডুম ইত্যাদি সরঞ্জামের গুদোম। বাইরে দিয়ে সে ঘরে ঢোকবার ব্যবস্থা আছে—উঁচু প্লিন্থের ওপর বাড়িটা, তাই জমিন থেকে কটা ছোট সিঁড়ির ধাপ সেই ঘরের দরজা অবধি উঠে এসেছে। সে-ঘরের একটা দরজা ও'র ঘরের দিকেও আছে বটে, কিন্তু তৈরি হওয়ার দিন থেকে আজতক সে-দরজা কেউ খুলেছে বলে তো বোধ হয় না।

•

দুপুর বেলায় নানা কর্মচারীর আগমনে মুহুর্মুহু কর্তার কাছে তলব

হয়েছে ও'র। তারপর সন্ধ্যা থেকে কর্তার আরম্ভ হয়েছে অবসর-আসর। সে আসরে ও' ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না আজ। তাই কর্তাকে এমনিধারা ও' একলা পেয়ে, কর্তার মনস্তত্ত্বের বিচার মনে মনে করবার মতলবে, সমালোচকের জাগ্রত নজর তাঁর প্রত্যেকটি আলাপের ওপর, প্রত্যেকটি কথার ওপর, সজাগ রেখেছিল।

আজকে কর্তা ও'কে সুধাপানের প্রস্তাব করলে ও' শরীরের অজুহাতে কোনো ক্রমে ছাড়পত্র পেয়েছিল। একটা বোতল খতম হবার পর, কর্তা সামনের হেলানো চৌকি আর খাটের মাঝামাঝি 'ডিভান' নামক বস্তুটির বুকে নিজেকে বিছিয়ে দিলেন।

অলকও ছুটি পেয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে হাজির হল।

বাতিটাকে ও' নিভিয়ে দিয়েছে—এবার বালিশটাকে দুমড়ে উঁচু করে, শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল: খোলা জানলা দিয়ে প্রকৃতির মোহাচ্ছন্ন রূপ দেখা দিয়েছে। ও' মনে মনে কর্তার হালচাল ভাবছিল —ভাবছিল নবমঞ্জরির ক্ষুধার্ত ক্ষেপার মত আচরণ। অন্য লোকের জীবনে এই রকম ঘটনা, এইরূপে ঘটলে, চিত্ত বিভ্রম ঘটাতো নিশ্চিত। কিন্তু অলকের জীবনে এমনিতর কোন ঘটনাই যেন নতুন নয়, ও' যেন যা ভেবেছিল ঠিক তাই ঘটেছে। ও' যেন এই ঘটনা আগে থেকেই জানতো। ও' নিজেকে তন্ন তন্ন করে তলিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, নারীর প্রতি ও'র দুর্বলতা নেই, কিন্তু তেমন কেউ স্বেচ্ছায় এলে, তাকে অভ্যর্থনা করার ভদ্রতা জ্ঞানের পৌরুষে ঘাটতি ঘটেনি। উপরন্তু এই অদ্ভুত নারীর চেহারা, চাল-চলন, বেশ-ভূষা, সব কিছু সচরাচর নজরে পড়ে না। ও'কে, সবৈব জানার একটা কৌতূহল ও'র মনের কপাটে দস্তুরমত কড়া নেড়েছিল, জোরেই তো। সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনের আস্বাদ ওর' জিভে কখন জড়ায়নি। এখানকার সবটাই তাই অদ্ভুত

বিচিত্র লাগছে। আকর্ষণ থাকলেও, আকর্ষণের চেয়েও যার রহস্য উদ্ঘাটনে ও' সত্যিই উদ্‌ভ্রান্ত।

ও' ভাবে, এই সব পুরুষগুলোই বা কি? দিনের বেলায় ধোপদুরস্ত ভদ্রতার ফিন্‌ফিনে আদ্দির অঙ্গরাখায় এদের ঢাকা থাকে সর্বাঙ্গ, কিন্তু মদের আসরে তার তলার চেহারা ফুটে বেরোয় ন্যক্কারজনক নোংরা কথায়—নারী দেহের প্রতি অস্বাভাবিক উপায়ে আসক্তি চরিতার্থের নানা উপকরণে। বিপথে বাসনা চরিতার্থ করাই যেন এদের চরম অভিলাষ। স্ত্রী থাকতে অন্য নারীর সঙ্গ এদের আভিজাত্যের যেন একটি বিশেষ অঙ্গ।

ভবানীর 'ঝিনিমিনি' নাচের আসর পরশু দিন মধ্য রাত্রে আয়োজন হবে এখানেই!—শেষকাল অবধি কর্ত্রীর নাকের ডগায়, এই কুঠি-বাড়িতে, কর্তার ঘরেই। কর্তা, কর্ত্রীর সামনে সমঝে সামলে চলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হল কৈ? সুচতুর ভবানী নিমেষে তা ভূমিসাৎ করেছে, স্থানের অসুবিধের কথা উল্লেখ করে। কর্তার সংযমের সীমা নিমেষে তাসের প্রাসাদের মত পপাত ধরণীতলে হয়ে গেল। রাজি হয়ে গেলেন কুঠি-বাড়িতেই নাচের আসর জমাতে···কিন্তু কর্তার কি দেখেই আনন্দ? মুখে নারীদেহচর্চাতেই যেন তিনি আমোদ উপভোগ করেন বেশি। কর্ত্রীর কাছে সজ্ঞানে ঘেঁষতে দেখা যায় না তো একবারও। অথচ কর্ত্রীর কাপড়-চোপড়, গয়না, উপঢৌকনে, ঘাটতি কিংবা অবহেলাও তো কখনো অবলোকন করেনি কেউ। আশ্চর্য এই জীব।···শুয়ে শুয়ে পাশের মশালচির ঘরের দরজাটায় কেমন যেন খুট খুট করে মৃদু আওয়াজ, ও'র কানে এল। অলক ইঁদুর কিংবা কোন কিছু মনে করে এবার পাশ ফিরে চাদরটা গায়ে টেনে ঘুমোবার আয়োজন অন্তে চোখ বুজল—রাত্রি অনেক হয়েছে। ঘুমও পেয়েছিল। ও' ঘুমিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। ও' জানেনা কতক্ষণ

ঘুমিয়েছে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যেই যেন নাকে এল একটা গন্ধ, সে—ই গন্ধ, খসখসের আতর। ও'র চোখমুখ ঢেকে কালো, মৃত্যুর মত কালো, কার যেন কালো এলো চুল—সমুদ্রের সাদা ফেনার পুঞ্জগুলো যেন কালো হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে···ঠিক তেমনি করেই ছড়ানো ও'র চারিধারে। ও' যেন জীবনের ওপারের অন্ধকার অনুভব করল। অনুভব করল ওপারের অপরূপ সৌরভ। কিন্তু এ কি···বুকের ওপরে আর একটা বুকের যেন ধুক ধুক্ আওয়াজ! কানের তলায় কার যেন অঙ্গারের মত উত্তপ্ত চুম্বন, চুম্বকের মুখে লেগে যাওয়া ইস্পাতের মত সেঁটে। এখনো সেঁটে। একি সত্যি! কে যেন ও'র বুকের উপর আছড়ে আছে। অলক ধড়ফড় করে উঠতে গেল—চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু নড়বার আগেই, নরম কার একজোড়া বাহু ও'কে বিছানার সঙ্গে আরো চেপে ধরেছে, সে ব্যাকুল বাহু নরম, এত নরম যে লোহার সাঁড়াসির চেয়েও শক্ত অসীম তার ফাঁসে বিল্‌কুল্ ফাঁসিয়ে দিয়েছে ও'কে। মুখ দিয়ে একটি আওয়াজও বেরোল না। ও' মনে মনে, মনে করল যেন বোবায় পেয়েছে ও'কে। কিন্তু কানের কাছে এবার কথা শোনা গেল: বলছে—"ওগো আমায় নিয়ে চল। আমি এই বন্দী অবস্থায় আর থাকতে পারছি নে। চল, আমরা পালিয়ে যাই। এ হীরে জহরৎ? এ মণিময় মুক্তামালা শিকলির মত আমায় পদে পদে আঁকড়ে—আমার দম আটকে এনেছে। আমার প্রাণ ঠেকেছে এসে টাকরার তলায়। তুমি আমায় বাঁচাও। অপরিসীম তৃষ্ণায় আমার প্রাণ এ-মরুভূমির মধ্য দিয়ে আর চলতে পারছে না। তোমাকে আমার জীবনে শীতল ছায়ার মত পেয়েছি। এবার আমাকে বাঁচিয়ে তোল—তারপর পালাবো আমরা।"

অলক এবার থেমে থেমে দম নিয়ে চাপা গলায় উত্তর দেয়—"কিন্তু আমার পয়সা কোথায়, কোথায়ই বা পালাবো?"

—পয়সার দরকার নেই, এই গয়নাগুলো নিয়ে যাও, বিক্রি করে জমিয়ে রাখো টাকা, তারপর সুবিধে বুঝে একদিন···

—কিন্তু এ গয়নাগুলো গায়ে না দেখলে সন্দেহ করবে না ?

—আমার জিনিসের হিসেব সন্ধানের সাহস, এখানে কারুর নেই, কর্তারও নয়।

—না না এ অন্যায়, এ অন্যায়ের ভাগী আমি হবো কেন ?

—কাপুরুষ তুমি জানো আমি তোমার মনিব। আমার হুকুম, না শুনলে এক্ষুনি চিৎকার করব যে তুমি আমার সর্বনাশের জন্যে···

—কিন্তু ভুলে যাবেন না—আপনার ঘরে আমি নেই, আমার ঘরে আপনি। অলকের কথা মাঝপথে হঠাৎ চেপটে গেল—একেবারে চাবি বন্ধ।···ও'র ঠোঁট দুটো উপর থেকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে তখন ক্লিপের মতন ! মুক্তোর মত সে দাঁতগুলো, কিন্তু ইঁদুরের দাঁতের ধার যেন তাতে। ও'কে কথা বলতে দেবে না আর। কিছুতেই নয়। অলকের ঠোঁট ক্ষত বিক্ষত হবার উপক্রম। জ্বলছে। দপ দপ করছে ব্যথায়। অলক অনুভব করল এবার ফুলের পাপড়ির মত সে-মুখের স্পর্শ ও'র মুখে। সাপের সর্পিল সুকোমল শরীরের মতই সে শরীর, ও'র সর্বাঙ্গে পিছলে পিছলে দুলে দুলে উঠছে। শিরশির করা অদ্ভুত তার আবেদন, বিচিত্র তার আস্বাদ। তারপর ও'র কানের কাছে মৃদু কথাগুলো মূর্ছনার মত বাজতে লাগল : "দূরে পালাব আমরা। সমাজ সংসার যেখানে কিছু নেই। কেন ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পল্লীতে বাঁধবো আমরা নীড় ? আমি রাঁধবো তুমি সারাদিন ক্ষেতে খাটবে, ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে খাওয়াব তোমায় পান্তা ভাত। আরও কত কী ? আমি রাঁধতে জানি। গয়না ? নাই বা রইল গয়না। নাই বা রইল টাকাকড়ি। খোঁপায় পরবো কেমন লাল শিমুল ফুলের নতুন মঞ্জরি, হাঁটুর ওপর পরণের কাপড় ! আমার খু-উ-ব ভালো লাগে। তোমার

ভালো লাগে না। আমি আসামের মেয়ে, তাঁত বোনা না শিখলে আমাদের বিয়ে হয় না জানো? যে যত বড়লোক হবে, তাদের বাড়ির মেয়েরা তত ভালো কাপড় বোনে। আমি আগে কত সুন্দর সুন্দর কাজ তাঁতে করেছি। তোমাকে কত নতুন নতুন কাপড় বুনে আমি পরাবো। তুমি হাটের দিনে আনবে কিনে আমার জন্য রুপোর ঝুমকো—আমাকে খুশি করতে। আনবে না? আমি তোমার বুকে, তোমার ভালবাসায়, ভেলার মত আজীবন ভেসে বেড়াতে চাই—আমায় এখানে ফেলে রেখে আমায় ছেড়ে চলে যেও না—না—না।”

অলক গুঞ্জরণের মত ও'র এমনিতর কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। খুব সকালে ও'র ঘুম ভেঙে গেল। মুখ ধোয়ার শেষে আয়নায় চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখল ঠোঁট দুটো ও'র দস্তুরমত ফুলে কামরাঙার আকার ধারণ করেছে। গালে গলায় নীল নীল কালসিটের কলঙ্ক ছেটান রয়েছে চারধারে। আর বিছানায় মিষ্টি মেয়েলী গায়ের গন্ধ।

হঠাৎ ও' যেন চমকে উঠল—দেখে হীরের অতি মূল্যবান বাজু একটা পড়ে খাটের তলায়। ও' উঠিয়ে বাক্সয় বন্ধ করতে করতে ভাবলে, যদিও আগে বহুবার ও' এই মেয়েদের গায়ের পিকিউলিয়র গন্ধ—নোংরা ন্যক্কারজনক বলে উল্লেখ করেছে—কিন্তু আজ এই শরতের স্বচ্ছ সকালে, এই উদাস হু-হু করা বকুলের গন্ধে ভরা হাওয়া···তার সঙ্গে চন্দন আতর পাউডার-এর নানা রকম মিলিত মিইয়ে আসা গন্ধ, মিশ্রিত সুরের মতই অপূর্ব লাগল। অনুভব করল, নারী দেহের সেই সুরভিত আবেশ। ও' যেন মাতাল হয়ে উঠল। ও' শুয়ে শুয়ে বিছানাটার বার বার আঘ্রাণ নিল। ধুতরো ফুলের নেশায় ও'র চোখে তখন শর্ষের ফুলের

ফুলঝুরি ঝরছে !···হীরের বাজুটা, স্থির করল রাত্তিরেই ফেরত দেওয়া সমীচীন।

এরপর কর্তার এখানকার সন্ধ্যাবেলার আসর, একদিন দুদিন করতে করতে নিত্য-ই ছিনিমিনি নাচে, জমাট হয়ে জমতে লাগল—ভবানী যে আসরের পুরোহিত !

কর্ত্রীর কোন আপত্তি নেই এতে—আশ্চর্য পরিবর্তন ! কলকাতায় এমনিতর কোন কিছু ব্যাপার ঘটলে এতক্ষণে চোখের জলের প্যান-প্যানানি ঘ্যানঘ্যানানিতে উপরন্তু ফিটের দমকায় কর্তা যাঁতার পিষে দমে মরার দাখিল হতেন। তার ওপর যখন বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দিত নবমঞ্জরি, তখন আর সহ্য হত না কর্তা তখন তার গা ছুঁয়ে, মাথা ছুঁয়ে, দিব্বি করতেন—আর এ-ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। কিন্তু পনেরো দিন, মাসখানেক যেতে না যেতেই কোথায় কার দিব্বি ! আবার সেই ঘটনার আর একটা মহড়া হয়ে যেত। কিন্তু পরিবর্তন বলে পরিবর্তন ! আশ্চর্য পরিবর্তন ! কর্ত্রী আপত্তি তো দূরের কথা এখানে এসে ইস্তক এ-ব্যাপারগুলোয় যেন ভ্রুক্ষেপই করছেন না। কর্তা ভাবলেন, কলকাতা ছেড়ে এই নতুন জায়গার পরিবেশে হয়ত ও'র মনের পরিবর্তন হয়েছে, শরীরটাও ও'র যে সেরেছে বেশ।

এমনি করে অনেক কিছু দিন কেটে গেল। এখানকার দিনগুলো প্রত্যেকেরই ভালো যাচ্ছে, যে যার সুখে কাটাচ্ছে দিনগুলো। পুণ্যাহের হাঙ্গামা কোন্ কালে চুকে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কর্ত্রী জেদ ধরলেন পশ্চিমেশ্বর মন্দিরে যাবার জন্য। কর্তা যাবেন কেমন করে?—তাঁর সন্ধ্যার আসর আছে যে—বরঞ্চ কর্ত্রী মন্দিরে যাবেন শুনে খুশিই হলেন—আমোদের সীমা অতিক্রম করলে আজ অসোয়াস্তির কিছু নেই—বাঁচোয়া! কর্তা বললেন, "অলককে সঙ্গে নিয়ে যেও—বড় পাণ্ডা আর পরিছাকে খবর পাঠিয়ে দিও একটু আগে।" কর্ত্রী এর উত্তরে বললেন, "আচ্ছা"।

মন্দিরের বড় পাণ্ডার কাছে খবর গেল আজ রাত্তিরে কর্ত্রী আসছেন। কর্ত্রীর জন্যে পাল্কি ঠিক হল। অলকের জন্যেও। রাত্তির দশটার সময় কুঠি-বাড়ির ভিতরে পাল্কি সমেত বেহারারা হাজির। কর্ত্রী পাল্কিতে চড়লেন। অলক চলল হেঁটে, ও' কিছুতেই পাল্কিতে চড়তে রাজি হল না। বললে, "এই তো এক পা—মন্দির, এ আবার কি পাল্কিতে চড়ে যাব।" ভবানী থাকলে হয়তো ধমকে উঠতো, কিন্তু ভবানী আপাততঃ কর্তার নৈশ আসর আহ্বানের কাজে সারাদিনব্যাপী বেজায় রকম ব্যস্ত—অন্য দিকে মন দেবার সময় ও'র কোথায়?—রাত্তির ছাড়া সময়ও ও' পায় না কুঠি-বাড়িতে আসার।

মন্দিরে পৌছে কর্ত্রী বড় পাণ্ডার আশীর্বাদী ফুল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে

জানালেন যে, বিগ্রহের ঘরে যেন কেউ না থাকে—তাঁর বিশেষ মানত আছে। সেই জন্যে তিনি একলাই পূজো করবেন। অলক ব্রাহ্মণ, তাছাড়া তাঁর গুরুদেবের বংশধর, সে পূজোর জিনিস-পত্তর দেবার জন্যে খালি ঘরে থাকবে।

বড় পাণ্ডা, পরিহা, অন্যান্য পাণ্ডারা এই হুকুম শুনে গুম্ খেয়ে মুখটা কালি করে নাট-মন্দিরেই রয়ে গেল।

কর্ত্রীর কাপড়ের সঙ্গে অলকের জন্যেও এসেছিল গরদের জোড়—এক গোছা নতুন পৈতে।

অলক বেশ পরিবর্তন করে, গরদের ধুতি আর পৈতে গলায়, খালি গায়ে গরদের চাদর জড়িয়ে চলল···একহাতে ও'র রুপোর রেকাবিতে ভোগের সামিগ্রী, আর একহাতে জুঁই ফুলের প্রকাণ্ড গড়ে মালা দুটো ঝুলছে। নবমঞ্জরির পিছু পিছু বিগ্রহের ঘরের দিকে চলল ও'। নাটমন্দিরের চাতাল পেরিয়ে যখন ও'রা সোপানগুলো পাশাপাশি পেরোচ্ছিল—তখন চমৎকার দেখাচ্ছিল ও'দের। মুখটা অলকের থ্যাদা-থ্যাদা হলেও লম্বা চেহারায় ও-মুখের একটা মাধুর্যমণ্ডিত গম্ভীর ভাব ছিল, যাতে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে অদ্বিতীয় রকমের। নবমঞ্জরিও পরিবর্তন করেছে ও'র বেশ।

কপালে চন্দনের নানা কারুকার্যের মধ্যে প্রভাতসূর্যের মত সিঁদুরের টিপ। কানে, গায়ে, লক্ষ লক্ষ টাকার হীরে, জহরতের জড়োয়া গয়না, পরনে দামী বেনারসী; রূপে রঙে ও' যেন ঝল্‌মল্ করছিল আজ। যেন বিয়ের কনেটি, মন্দিরে নয়, চলেছে আবার নতুন করে বাসরঘরে! অপূর্ব দেখাচ্ছিল ও'কে।

বিগ্রহের ঘরে ঢুকে নবমঞ্জরি ভোগের রেকাবিখানা আর ফুলের

মালা ছুটো নিল অলকের হাত থেকে। তারপর অলকের হাত ধরে বললে, "চল ঠাকুরকে প্রণাম করবে "

অলক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে তখন। মন্দিরে দাঁড়িয়ে নবমঞ্জরির আজকের এই এমনিতর অসংকোচ আচরণে—ও' বিমূঢ়! ও' যন্ত্রচালিত ভাবে নবমঞ্জরির সঙ্গে একসঙ্গে গড় হয়ে প্রণাম করল, তারপর ও'র দক্ষিণ হাতের উপর নবমঞ্জরির দক্ষিণ হাত মিলে অঞ্জলি দিল একই মালা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। অলক তখন একটু কোণে দেওয়ালের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দেখে ও'র মনিব পত্নী পঞ্চশ্রী শ্রীল শ্রীযুক্তা পাটা মহাদেই নবমঞ্জরিদেবী ও'র পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বাকি-ফুলের মালাটি ও'র পায়ে নিবেদন করছেন। বারো বছর বিলেতে কাটিয়ে অজস্র নারীর সান্নিধ্যে এসেও আজ অলক নার্ভাস হয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও ও'র মুখ দিয়ে বেরোলনা। বুঝতে পারল না কি করবে, মনে করতে পারল না, ও'র কি করা উচিত। এই মন্দিরে ঠাকুরের সামনে, নবমঞ্জরি আজ যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছে। ওকে অজানা কোন দুঃসাহসের অপদেবতা যেন ভর করেছে। অলককে উদ্দেশ্য করে ও' তখন বলে চলেছে: "আমি পাথর হয়ে গেছিলুম। তুমি আমার মধ্যে প্রাণ এনেছ—আমাকে উর্বর করেছ, আমায় রক্ষা করেছ, আমায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। ফসল ফলানোর যে উৎসবের আয়োজন আমার শরীরে—তার পুরোহিত তুমি, আজ যে চারাগাছের সম্ভাবনা আমার মধ্যে উঁকি মেরে, আমার জীবনকে নতুন আশায় উন্মাদ করেছে—সে তোমার কৃপায়। আশীর্বাদ কর: পাণ্ডু-রাজার রাণীর মত আমার নাম, সতী হিসেবে নিত্য সকালে যেন উচ্চারণ করে সতী-লক্ষ্মীরা।"

অলকের মাথা ঘুরে গেছে। ও'র চোখে—মন্দিরের বিগ্রহ, নবমঞ্জরি, নবমঞ্জরির কথা, সব শুদ্ধ মিলে যেন একটা ঘুর্ণি-চক্র রচনা

করেছে, যার মধ্যে কোন জিনিস ধরা যায় না। টুকরো টুকরো হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে—যেখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড! আর ও' তার মধ্যে থেকে ডুবে যেতে যেতে ওপরে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও ক্রমশঃ ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে আরো আরো, যেন কোন্ অতলে—ও'র দম আটকে আসছে—ও' যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়বে।···

নাটমন্দিরের চাতালে পেরিয়ে এসে অলক ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল—দৌড়-ক্লান্ত রেসের ঘোড়ার মত। পরিচারিকারা এসে হাজির হয়েছে কর্ত্রীমার কাছে। কর্ত্রীমা তাদের একজনের হাত থেকে তাঁর জরির ছোট্ট থলেখানা চেয়ে নিলেন। তারপর বড় পাণ্ডা, পরিছা থেকে শুরু করে সকলকে প্রত্যেকের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ শেষে পাল্কিতে গিয়ে উঠলেন।

'জয় রাণীমার জয়' ধ্বনিতে মন্দিরের ভিত্তি মূল থেকে শিখর-দেশ অবধি শিহরিত হল। বকশিশের মাহাত্ম্যে মন্দিরের প্রত্যেকটি পাণ্ডা সবকিছু ভুলে গিয়ে রাণীমার প্রশংসায় তখন পঞ্চমুখ।

বড় পাণ্ডা পরিছাকে বললে—"পুত্রকামনায় মানৎ করে গেলেন রাণীমা, বুঝলে হে পরিছা।" ঐ বুড়ি পরিচারিকা তাকে গোপনে বলে গেল। "আগে জানলে, সেই স্বপ্নাদ্য শিকড়টি দিতুম—থাক কাল দিয়ে আসব এখন, তারপর দেখবো কেমন ছেলে না হয়।"

কুঠি বাড়িতে ফিরে নবমঞ্জরি দেখল, কর্তা তাঁর খাটে এলিয়ে আছেন—কোথায় কাপড়, কোথায় লজ্জা! অজ্ঞান হয়ে। মদের বোতল গেলাসগুলো এখানে সেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। কর্ত্রী হুকুম

দিলেন, কর্তার ঘরের চারিপাশ পরিষ্কার করে দিতে। কর্ত্রী আজ কর্তার সেবা করবেন নিজে। এ মানতের নাকি এক মাসের ব্রত—স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবেই হবে।

অলকের চোখে ঘুম নেই। রাত্তিরে বারান্দায় বেরিয়ে এল, দেখল—নবমঞ্জরি কর্তার কোলে এলিয়ে আছে। তরওয়ালের মত ও'র যৌবন, সেই ম্লান চাঁদের আলোয় অসাধারণ শানিত মনে হতে লাগল। নবমঞ্জরিকে কর্তার কোলে অমনি দেখে, অলক অস্বীকার করলেও—আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, অজানা আক্রোশে মনে মনে ও' আজ ছটফট করতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন? তা ও' নিজেই সমঝে উঠতে পারছিল না ঠিক।···যে ভাবী সন্তান জন্মাতে চলেছে নবমঞ্জরির, সে হবে কিনা এই অকর্মণ্য জমিদারপুত্র? কখনোই নয়, এ-স্বীকার ও'র কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না হয়তো। ফল্গুর মত বালির তলায়, চাপা পড়া ও'র সুপ্ত পিতৃত্ব আজ মাথা চাড়া দিতে চায় যেন। মানুষের সেই আদিম সংস্কার—যার কাছে উত্তাল অনন্ত গান্ধি, বোহেমিয়ান আঁন্দ্রে গোগাঁ, বেদুইন অলক বন্দ্যো, সব বিলকুল বৃথা হয়ে গেল কি?—আর কেউ চিনতে না পারলেও ও' চিনবে নবমঞ্জরির মারফৎ পাওয়া ও'র পুত্রকে—ও' নিজে শিক্ষা দেবে তাকে। বড় আর্টিস্ট করবে, না হয় বড় কবি, কি সায়েন্টিস্ট—আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, পিকাশো। ওআল্টার হুইটম্যানের 'দি উয়োম্যান হুম আই ওআন্ট' কবিতাটা বার বার নিঃশব্দে আবৃত্তি করতে লাগল:

"আমি সেই নারীকে চাই—
যার মধ্যে
আমার বীর্য বপন করব
সৃষ্টি করতে
নতুন কবি, নতুন শিল্পী, সুরকার···"

দিনের পর দিন যে চলে যায়।

অলক আবিষ্কার করল নবমঞ্জরির ক্রমবর্ধমান নিষ্ঠুর উদাসীনতা। না, উদাসীনতা নয়! আকস্মিক অলকের কাছ থেকে অমনি করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ও'কে ব্যথা দিয়েছিল বেশি। কার্য-উদ্ধার সমাধা হয়েছে—তাই বলে সান্নিধ্যের সূত্রটা না ছিঁড়ে, আস্তে আস্তে সহিয়ে গুটিয়ে আনলে কি খুব ক্ষতি হত! নবমঞ্জরির সে উত্তাপের প্রকাশ বিলকুল্ নেই যেন আর আচরণে। দেখাই হয় না প্রায় বলতে গেলে। অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, যেন কখোনো ও'র সঙ্গে কোন চেনাই ছিল না—এমনি একটা ভাব। অথচ ও'র পাশের ঘরেই কর্তা থাকেন সেইখানে ভবানীর আসর শেষে, কর্ত্রীর কথার কূজন মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে, ও'র কানে ভেসে ভেসে আসে বাতাসের সঙ্গে!···

এই পাণ্ডুয়ায় আসার দিন থেকে কিছুদিন আগে অবধি নিত্য নিশীথে নবমঞ্জরির নিবীড় সাহচর্যে ও' উপচে উঠত, কিন্তু সেই মন্দির থেকে ফেরার পর থেকে তার পরিবর্তন ঘটেছে। হঠাৎ পরিবর্তন! এ পরিচ্ছেদে যেন পড়েছে হঠাৎ একটা ড্যাস্—শেষ হয়নি তবুও যেন পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত। এত দেখেছে, এত ঘেঁটেছে, তবু এ-দেশী মেয়েদের মহিমা ও' মনন করে থৈ পেল না আজও। নবমঞ্জরির সান্নিধ্যের জন্যে ও' মনে মনে অধীর উতলা। তবু একবারও আজকাল দেখা হয় না। ও'র চোখের গোড়ায় একে একে প্রথম দিনকার ঘটনাগুলো বায়স্কোপের ছবির মত গড়িয়ে চলতে থাকে—অলকের মনে পড়ে যায় সেই স্টেশনে প্রথম চোখাচোখি! তার পর প্রথম স্পর্শের রোমাঞ্চকর ঘটনা পেরিয়ে বোটের বাথরুমের সেই আকস্মিক ধাক্কা লাগার দুর্ঘটনা, তারপর রহমায় ও'র ঘরে—না-বলে-ঢোকা চোরটির সেই চরম ধরা পড়া। সবার শেষে পাণ্ডুয়ার এই কুঠি-বাড়িতে প্রথম পদার্পণের পর, উজাড় করে নিজেকে অঞ্জলি দেওয়ার—সেকি নিঃশেষিত

সকরুণ নিবেদন! দূর মন্দির থেকে ভেসে ভেসে আসা আরতির ঘণ্টা—আজও সেকথাগুলো অলকের কানে কেঁপে কেঁপে উঠছে মূর্ছিত রাগিনীর মীড়ের মত। এ সবই কি মিথ্যে? হ্যাঁ, নিছক মিথ্যে! অন্ততপক্ষে ও'র এতদিনের নারী-চরিত্র-চর্বণ করা অভিজ্ঞতা তো তাই বলে। ও'তো জানে, মেয়ে মানেই মিথ্যার প্রতিমূর্তি। ছলনার আর চাতুরির জমাট বাঁধা রূপ—আত্মসুখ আর স্বার্থপরতার পরমতম প্রতিমা। তাইতো ও'দের এত ভাল লাগে ও'র। তাইতো এর আগে ও' মেয়ে দেখলেই নিজেকে সব সময় সজাগ রাখতো শেষ পর্বের পূর্বেই সরে পড়ার মতলবে। মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায়, ও' বিশ্বাস করে ডট্ ডট্ আর ড্যাসে—কিন্তু মেয়েরা কেউ পূর্ণচ্ছেদ টানলে ও'র পৌরুষ যেন পদাঘাতের অপমান অনুভব করে। কিন্তু তবু এত জেনেশুনেও আর নবমঞ্জরির তরফ থেকে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া সত্ত্বেও, আজ এই মধুর মিথ্যের মাধুর্যে অহেতুক হত্যা দিয়ে কেন রয়েছে ও'? বুঝে সুঝে নিরেট নির্বোধ হওয়ার এমনিতর দৃষ্টান্ত অলকের জীবনে দেখা যায়নি এর আগে একবারও। একেবারে দাঁড়ি—আর তা টানল কিনা একটা মেয়ে—দিশি মেয়ে! ভারতবর্ষে এসে এই প্রেমের মিথ্যামোহ মিষ্টি লাগছে ও'র কাছে। মিথ্যা জেনেও ও' যেন মাতাল। ও'র মত বদলেছে। ও' এদেশে এসে আবিষ্কার করেছে মনের জগতে সত্যের কোন মূল্য নেই—সত্যি কখনো মধুর হতে পারে না—সম্ভব নয়। মিথ্যাই মধুর। এই প্রতারণা আজ তাই ও'র কাছে এত আদরের, এত আকর্ষণের জিনিস হয়ে উঠেছে—যে এই নারীর সঙ্গ হতে বিচ্যুত হয়ে বিরাট বেদনা বোধ করতে লাগল বুকের মধ্যে। বুঝল, শয়তানত্ব আর দেবত্বের দড়ি ঢিলে হয়ে আবার যেন ও'র মধ্যেকার মানুষ জেগে উঠতে চাইছে, সুখ দুঃখ বেদনার অনুভূতিগুলো যেন তলা থেকে ওপরে ভেসে ভেসে উঠতে চাইছে।

এরপর কিছুদিন থেকে দেখা গেল—জমিদারের, খাস কামরার কর্মী অলক বন্দ্যোকে দিনের বেলায় কাছারিতে নিত্য হাজির! ম্যানেজারের সঙ্গে জমজমাটি ভাব!

ভবানী? ভবানী তখন কোথায়? রাত্রি অন্তে কুঠি-বাড়ি-ফেরতা সে তখন নিবীড় নিদ্রায় নিমগ্ন।

সেদিন অলক রোজকার মতই কাছারিতে এসেছে। হঠাৎ উড়িয়া ভাষায় "বাবারে মারে, মরে গেলুম, মরে গেলুম" চিৎকারে ও' সচকিত হয়ে উঠল। ম্যানেজারবাবু তখনো তার অন্দরমহল থেকে কাছারির গদিতে বিরাজ করেন নি—। তাই ঘটনাটি কি জিগ্যেস করতে না পেরে অলক ছুটল আওয়াজ লক্ষ্য করে—দেখে কাছারির পিছনে পুকুর পাড়ে নারী পুরুষ মিলে সারি সারি জনা ছয়েক লোক, হাতগুলো পিঠের দিকে করে সার সার এক একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। তাদের মধ্যে একজনের পশ্চাৎ দেশের বসন খসানো—শরীরের সেই অংশ রক্তের দলার মত দেখাচ্ছে। ওদিকে অলককে দেখে, সপিল জল-বিছুটির চাবুক হাতে বরকন্দাজদের সর্দার সাধুসিং ভূমি স্পর্শ করে গড় করল। অলক তো স্তম্ভিত। দেখে আর একটু দূরে আর এক ধারে কয়েকটি নারী উলঙ্গ অবস্থায় কান ধরে উবু হয়ে বসে, মাথায় পর পর তিনটে করে ইট সাজানো তাদের।

অলকের মুখ থেকে কথা বেরল না। জালিয়ানওয়ালাবাগের বইটির মলাটের সেই ছবিটা চোখের সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল ও'র। উড়িষ্যায় এই জমিদারের কাছারিতে সেটা যেন কে ছিঁড়ে এনে সেঁটে

দিয়েছে। ও' লাফিয়ে গিয়ে সাধু সিংএর হাত থেকে জলবিছুটির ছিপ্‌টিখানা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুকুরে। তারপরে খুলে দিল লোকটার দড়ি। দড়ি খুলে দিতেই পাথরের মত অজ্ঞান অবস্থায় মাটির উপর উলটে পড়ল লোকটা। সাধুসিং তখন অলকের এই ব্যবহারে অপমানে অবাক হয়ে গেছে। ও'র এই বড় তালুকে তিরিশ বছরের চাকরি, ও'র জীবনে এমনিধারা ও'র হাত থেকে ছিপ্‌টি কেড়ে নেওয়ার সাহস কোন ম্যানেজারেরও হয়নি। বজ্র-গভীর গলায় অলক তখন হুকুম দিলঃ মেয়েদের দড়ি এখনি খুলে ও'দের কাপড় দিয়ে দেবার, এবং এরপর যদি এ-ঘটনা আর ঘটে, তো পুলিসের কাছে নিজে গিয়ে ও' সাক্ষী দিয়ে সাধুসিংএর সাক্ষাৎ হাজতবাসের বন্দোবস্ত করবে। অলক এ-ঘটনায় নিজের ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছিল। ও'র সামন্ত-তান্ত্রিক-অন্যায়ে-অনভ্যস্ত-অন্তর সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। মানুষের এই অপমান ও'র কাছে অসহ্য! এতদিন বাদে ও' মনে মনে এবার কম্যুনিজ্‌মের উদ্দেশ্যে করজোড়ে অভ্যর্থনা জানাল। এ-পোড়া দেশে সাম্যবাদের স্বাগতম্‌ দেখতে পেল অলক্ষে যেন সর্বত্রই লেখা আছে, শুধু পদার্পণ করারই যা অপেক্ষা।

ম্যানেজারবাবু তখন গদিতে এসেছেন। অলকও এসে বসেছে একটা আসনে। অলক উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজারবাবুকে বললে: এ-কি তিনি করেছেন? মাইকেল ওডায়ারের সংস্করণ সব—জালিয়ানওয়ালা-বাগে ইংরেজরা তবে কি কসুর করেছিল? মাইকেল ওডায়ারের নাম শুনেছে কি জীবনে ম্যানেজারবাবু? অলক তখন বলে চলেছে। নারীর গায়ে প্রকাশ্য দিবালোকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত ইংরেজরা করেছিল আর সেই ইংরেজদের গোমস্তা দেশের জমিদারগুলো···

—চুপ—চুপ—অলকবাবু, এটা কাছারি। স্বদেশী-প্রচারের উপযুক্ত আড্ডা এটা নয়। আপনি জমিদারি সেরেস্তার কাজে একান্তই

অনভিজ্ঞ—শুধু অনভিজ্ঞ নন, অনুপযুক্তও বটে। চাকরির গালে এমনি করে চপেটাঘাত করবেন না—বয়েস অল্প, অভিজ্ঞ লোকের উপদেশ মানতে হয়। এমন সময় সাধুসিং হাজির তার ইস্তফানামাখানা নিয়ে। সে আর কাজ করবে না। তিরিশ বছর সে বড় তালুকের সেবা করেছে। প্রজার সামনে এমনি অপমান তার জীবনে কখনো ঘটেনি। ম্যানেজারবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন মুহূর্তে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"কি হয়েছিল?" সাধুসিং বললে—"হুজুর, ও'র মধ্যে চারজনের স্বামী সুদের টাকা ছ'মাস ধরে বাকী রেখে, খালি ফাঁকি মেরে বেড়াচ্ছিল, ওদের 'মাই পো'রা আজ জটলা পাকিয়ে, বাসন-কোসনগুলো নিয়ে এসে বলে সেগুলো নিতে—আমরা কি বাসন নিয়ে পুরোনো বাসনের দোকান খুলব? আর অন্য বাকী ছ'জন সদর খাজনার টাকা দেয়নি। এদের শাসন না করলে সামনের কিস্তিতে একটি আধলাও আর আদায় হবে না। বললাম—'তোদের বৌয়ের নাকের 'গুনাবসনি' নিয়ে আয়, সোনার জিনিস, আমি টাকা দিয়ে দেব।' তাতে বললে, 'পারব না।' তাইত শাস্তি দিচ্ছিলুম।" ম্যানেজারবাবু তাকে ঠাণ্ডা করে বললেন—"আচ্ছা সাধুসিং, এবার তুমি যাও, আমার খাবার সময় অন্দরে এস একবার।"

অলক সাধুসিং যেতে জিজ্ঞেস করল—"সুদ কিসের ম্যানেজারবাবু?"

—কেন এখানে এস্টেটের টাকায় যে লগ্নি কারবার আছে।

—তাই নাকি? কত সুদ দিতে হয়?

—টাকা পিছু চার আনা সুদ মাসে। অবিশ্যি মাসে মাসে না পেলে চক্রবৃদ্ধি হারে তা বেড়ে যায়। শেষ অবধি বৌয়ের গয়না-গাঁটি, বাসন-কোসন, বাড়ি-জমি সব চলে আসে এস্টেটে—খুব লাভের ব্যবসা! আমি এসে এটা শুরু করিয়েছি, সদরের মঞ্জুরি নিয়ে। প্রায় পনেরো

হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেছিলুম, এখন এক লাখ পনেরো হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে।

—"ওঃ", শুধু এই শব্দটুকু ছাড়া অলকের মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরোল না। ম্যানেজার তখন ক্যাশ-স্লিপ্‌এ কত টাকা কি বাবদ আদায় হয়েছে দেখতে লাগলেন। অলক হাতের কাছে আর একটা ক্যাশ-স্লিপ্‌ টেনে নিয়ে তার আইটেমগুলো পড়তে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল 'বাহাচিনি কর'। অলক জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, 'বাহাচিনি' মানে কি ?"

—'বাহাচিনি' মানে বিয়ের সময় জমিদারকে একটা কর দিতে হয়, —তাকেই 'বাহাচিনি' বলে।

—অ্যাঁ! তাহলে বিয়ে করলেও এখানে করের হাত থেকে রেহাই নেই !

—শুধু বিয়ে কেন, ছেলে জন্মালেও জমিদারদের কর দিতে হয়।

—আচ্ছা 'মৃত্যুচিনি', মানে মানুষ মরলে তার জন্যে কিছু…

অলকের অসহ্য লাগে, ও' না সইতে পেরে এবার [illegible] পড়ে—আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে কুঠিবাড়ির পানে। জমিদার তো নয়, নৃশংস পশু এরা। ও' ভাবে—ও'র আর বেশিদিন পোষাবেনা এখানে।…

ওদিকে কাছারি থেকে অলক চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে মহা হুলস্থুল —আমলারা একজোট হয়ে সাধুসিংএর ওপর অলকের অন্যায় ব্যবহারের জন্যে 'মেলি' করবে বলে শাসাচ্ছে। ম্যানেজারবাবু অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে বললেন—"অলক ক'দিনের জন্যে আর আছে ? জমিদারের সঙ্গে সঙ্গেই ও'-ওতো বিদায় হবে—শুধু শুধু গোলমাল করে কি কিছু লাভ আছে ? বরঞ্চ জমিদার থাকার জন্যে খারিজ-দাখিলগুলো বেশি

আসছে, তার আমলান পাওনাটা বন্ধ হয়ে যাবে। জমিদারের এই খাস কর্মচারিটি গোমুখ্যু। শুধু পড়াশুনা করলেই জমিদারি-বুদ্ধি হয়না। এম, এ, পাশ করলেই যদি জমিদারির হালচাল বোঝা যায় তো কথা ছিল না। কাল থেকে কাছারিতে যাতে না আসে তার ব্যবস্থা আমি করব। কাজের ক্ষতি হবে তা নৈলে। ভবানীবাবু উঠলে জমিদারের কর্ণগোচরের ব্যবস্থা করব।" ম্যানেজারবাবুর এই উক্তিতে অগ্নিতে জল সিঞ্চনের কাজ হল—বিশেষ করে খারিজ-দাখিলের আমলান পাওনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় সবাই ঠাণ্ডা হয়ে গেল মুহূর্তে।

অলক তখন কাছারি থেকে বাড়ি ফিরেছে—দেখে সারা কুঠিবাড়ি যেন অকস্মাৎ কর্মতৎপরতার উৎসাহে রূপান্তরিত হয়েছে। সকলেই যেন মহা ব্যস্ত, মহাখুশি! রাজজ্যোতিষ নিত্যানন্দ এসেছে। পশ্চিমেশ্বরের পাণ্ডা, পরিছা সবাই কুঠিবাড়ির সিং-দরওয়াজায় সার সার দণ্ডায়মান। অলক ব্যাপারটা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে—বড় পাণ্ডাকে অভিবাদনের পর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে শুনলো, রাণীমা সন্তানসম্ভবা—আর তা বড় পাণ্ডার দেওয়া সেই অব্যর্থ দৈব শেকড়ের শক্তিতেই নাকি সম্ভব হয়েছে। তাই সবাই আজ জোড়ে রাজারাণী দর্শনের অভিলাষে এসেছে। আজকের দিনের চেয়ে বড় শুভদিন, বড় উৎসব আনন্দের দিন, সারা তালুকের ললাটে কখনো লেখা হয়নি ইতিপূর্বে। অলক বুঝল সবই। এদের মিথ্যাচার কত মহান, কত নিপুণভাবে অঙ্গাঙ্গি জড়িত, এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে, তাও অনুভব করল। শুরু থেকে শেষ অবধি মিথ্যাচারের সুশৃঙ্খল

শৃঙ্খলা ও'কে স্তব্ধ করে দিল, ও' আস্তে আস্তে ধীর পদে সেখান থেকে নিজের ঘরে এসে খাটের উপর এলিয়ে দিল নিজেকে।

শীতের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো আকাশে তখন বসন্তের আমেজ মেরেছে। দেখল, সেই প্রসারিত প্রান্তরের শুধু হয়নি কোন পরিবর্তন। সাতদিন কাছারির ছুটি ঘোষণা হয়েছে, প্রত্যেক কর্মচারীর একমাসের করে উপরি মাইনে বরাদ্দ হয়েছে—নতুন একজোড়া কাপড় সমেত। সন্ধ্যা বেলায় পাণ্ডুয়া গ্রামের প্রত্যেক ঘরে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর শুভ কামনায় জ্বলেছে ঘিয়ের প্রদীপ—যেন দীপাবলির উৎসব। যাত্রার দল বায়না করবার জন্যে লোক ছুটেছে কটকে। সারা জমিদারি জুড়ে একটা হৈ-হৈ ব্যাপার। এই সাতদিন দৈনিক পাঁচহাজার ভিখিরি খাবে। পশ্চিমেশ্বরের মন্দিরে এবং মহাদেবের মাথায় প্রতিদিন সাত কলসি দুধ আর বিশেষ ভোগের বরাদ্দ হয়েছে। অলক সন্ধ্যা বেলায় গ্রামের পথে এই উৎসব আয়োজন দেখে ফিরে এসে ঘরে ঢুকল। তারপর বলিকুদের রাজাকে চিঠি লিখতে বসল। "পাণ্ডুয়া তালুকের' জমিদারকে এতদিন ধরে কার্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করা সত্ত্বেও তার মাইনে না বাড়ানোয়, এই অতি অল্প বেতনে তার আর পোষাচ্ছেনা—যদি পূর্ব কথামত 'পটায়েৎ' সাহেবের পড়াশুনার ভার ন্যস্ত হয় তার ওপর, তো এখুনি ও' কাজে এসে যোগ দেবে।"

সাতদিন উৎসবের উত্তেজনায় সবাই মশগুল কে কার খোঁজ রাখে। সাতদিন বাদে অলকের অসুস্থতা সকলে জানতে পারল—ও'র পেটে নাকি অসহ্য যন্ত্রণা! উৎসবের প্রথম দিনের সেই সন্ধ্যাবেলায় যা' পশ্চিমেশ্বরের ভোগ খেয়েছিল একটু, তা ছাড়া এই সাতদিন উপোসে

আছে। মুড়ি আর একটু দুধ, তাও নাকি সহ্য হচ্ছেনা। ক' দিন বাদে কর্তার কানে গেল কথাটা। কর্তা ডাকলেন অলককে। অলক রুক্ষ বেশে কোঁথাতে কোঁথাতে কর্তার সামনে এল। বললেন—"কি হে, তোমার হল কি?"

অলক বললে—"স্যার বেশ ছিলুম, কি যে হল পেটে, কিছু পড়লেই ভীষণ ব্যথা বোধ হয়।"

—তা হলে কি করবে, কটকের সিভিল-সার্জনকে একবার দেখিয়ে এসো।

—স্যার, আপনার অনুমতি পেলে একবার কলকাতায় গিয়ে দেখিয়ে আসতুম।

—দেখো অলক, বুঝি তুমি এখানে সে রকম কাজকর্ম কিছু পাচ্ছনা, কিন্তু তবু তুমি আছ, তাতে আমার মনে অনেকখানি সাহস পাই। ও ভবানীদের দ্বারা তোমার কাজ করা কি সম্ভব? কখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব আসবেন, তখন তাদের কে উপযুক্ত খাতির করবে? আমার দ্বারা ত ও-কম্ম সম্ভব নয়। ভবানী ত এক অক্ষর ইংরিজি বলতে পারে না। তা ছাড়া আর বছরে হয়নি—নজরসেলামির টাকায় এ-বছর লক্ষ্মির বাহনকে যেমন করেই হোক লোহার দড়া দিয়ে বাঁধব। তোমাকে দরদস্তুর করতে বম্বে যেতে হবে একবার।

—লক্ষ্মির বাহন?

—রেসের ঘোড়া গো!

—আজ্ঞে, তাহলে আমি মাত্র দশ দিনের ছুটি চাইছি। আমি দশ দিনের আগেই আসতে চেষ্টা করবো; অন্ততঃ পক্ষে এটুকু কথা দিতে পারি, যে দশ দিন ছেড়ে এগার দিন কখনই হবে না।

—তবে যাও কলকাতায়। দেখো, দেরি কোরনা আবার।

—আজ্ঞে না, ডাক্তারকে শরীরটা দেখিয়েই সটান চলে আসবো।

—তবে কালকেই যাবার ব্যবস্থা করতে বলে দিও। আমাদের ফেরা তুমি এলে হবে। কর্ত্রীর শরীরটা বোঝ তো···সঙ্গে তোমার মত একজন না থাকলে মহা বিপদে পড়তে হবে।

—না স্যার, আপনি কিছু ভাববেন না। ডাক্তারের বাড়ি আমি গিয়েই আবার সটান ইস্টিসন ধরবার ব্যবস্থা করব না হয়।

অলক মনে মনে অনুভব করলে জমিদারি সেরেস্তার চালে এই ক'মাসেই সে বেশ দুরস্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। কথাগুলো বেশ হচ্ছে। কর্তা বললেন : "রহমায় আজকেই লোক পাঠিয়ে মোটরে তোমার সিট রিজার্ভ করে রাখে যেন। পাল্কির ব্যবস্থা আজ না করলে কাল দেরি করবে।"

—যে আজ্ঞে, ভবানীবাবুকে এখনি বলছি গিয়ে।

—আচ্ছা তবে যাও।

অলক ঘাড়টা একটু বেশি নুইয়ে নমস্কারান্তে ঘর থেকে নিষ্কাসন হয়ে এল নিজের ঘরে। রাত্রির সামনে বলিকুদের রাজাসাহেবের উত্তরটা আর একবার পড়ল। কালকেই তা হলে এখানের এই একশত ষাট মৌজার জমিদারের চাকরি শেষ। নবমঞ্জরির জন্যে ও'র মনটা বারেকের জন্যে নরম হয়ে উঠল—ক্ষণিকের জন্যে হয়ে উঠল সকরুণ। এই ক'মাস গোপনে কত আদরই না ও' পেয়েছে। কত যত্ন, কি নিবীড়, কি নরম! এ-যত্নের আস্বাদ বিভিন্ন, বিলেতের মত নয়—একেবারে উজাড় করে দেওয়ায় কি অপূর্ব অভিনয়! কিন্তু অলকের এ-মোহ কেন? তবু যে কারণেই হোক, এ-মোহ ও'র হয়েছিল হয় তো। হয়তো ভালবেসেছিল। ভালো লেগেছিল কিংবা। নৈলে নিত্য সকালে সব শক্তি জড় করে মনকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কত দৃঢ় করার প্রচেষ্টা করেছে—এতদিন ধরে প্রতিদিন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভগ্ন হয়েছে, পারেনি ও'। তারপর নবমঞ্জরি যখন থেকে ও'র সান্নিধ্য

এড়িয়ে চলতে লাগল তখন থেকে ও'কে নিকটে পাবার সেকি বিরাট ব্যগ্রতা। অনুযোগ, কত কি···অভিমান? হয়তো বা হবে। কিন্তু কেন?

পুরুষের মন নারীর সেবায় যত্নে, লুকোনো অভিসার অভিজ্ঞতার নতুনত্বে, হয়তো হারিয়েছিল নিজেকে।

নবমঞ্জরি শুনলে অলক চলে যাচ্ছে—পরিচারিকা এই খবর কি কথায় কথায় উল্লেখ করলে। নবমঞ্জরি ক্ষণিক স্তব্ধ হয়ে রইল। উদাস হয়ে চেয়ে রইল অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোকের দিকে—ও' তখন 'শিঙার' করছিল। চন্দন-লেপন-পর্ব কপালে তখন শেষ হয়েছে। ও' আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে গেল ভুলে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব পালটে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে :

—কেন রে হঠাৎ চলে যাচ্ছেন?

—রাণীমা উনি পেটের যন্ত্রনায় এ-কদিন বেজায় ভুগছেন, খাওয়া-দাওয়া আর নেই, সেই যে এই উৎসবের প্রথম দিনে পশ্চিমেশ্বর ঠাকুরের ভালিমভোগ খেয়ে ওঁর অসুখ করে গেল···

—ও তাই নাকি?

—হ্যাঁ রাণীমা···কেমন রোগা হয়ে গেছেন। এ-কদিন ঘর থেকেও তো বেরোন না। অন্য অন্য দিন রোজ বকুলগাছের ঐ সানবাঁধানো, তলায় সকালে এসে বসে থাকতেন। আজকাল আর সকালে ওঠেনই না।

—তা এখানকার ডাক্তারকে দেখিয়েছিল?

—না, কলকাতার ডাক্তারকে দেখাবার জন্যে ছুটি নিয়ে চলেছেন।

—কেন কটক থেকে দেখিয়ে আসলে, ক্ষতি ছিল নাকি কিছু?

—ওঁ'র কলকাতার ডাক্তার ছাড়া এখানকার ডাক্তারের ওপর তেমন বিশ্বাস নেই।

—কেন এখানকার লোকেরা কি মানুষ নয়, এদের বুঝি প্রাণ নেই, এরা যদি এইখানকার ডাক্তার দেখিয়ে বাঁচে, তবে উনি কি এমন লাটসাহেব—মরুকগে যাক্—চুলোয় যাক্!

নবমঞ্জরি এমন একটা ভাব দেখাল যে, কর্মচারী এমনি কত আসে যায়, কে তার খোঁজ রাখে—এসবের হিসেব-নিকেশে ও'র কোনই আবশ্যক নেই। কিন্তু মনটা ও'র গামছার মত কে যেন পাক খাইয়ে মুচড়ে নিঙড়ে নিঙড়ে তুলছিল—কিন্তু জল তাতে কি ছিল, যে বেরোবে কিছু?

অলক পাণ্ডুয়া ছেড়ে চলেছে।

ও' তখন পাল্কি চড়ে পেরিয়ে গেছে হাতিকানা গ্রাম—পড়েছে এসে ধানক্ষেতের দিগন্ত বিস্তৃত জমিনে। মনটা ও'র উদাস মরুভূমির বেশ ধারণ করেছে, শুধু ধূ-ধূ করছে বালি—যদি-বা একটা শ্যামল তৃণের উদগমের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, বালির ঝড়ে অচিরাৎ অপমৃত্যুতে তার সমাধান হয়ে গেল। বেদনা বোধ হলেও, এই জিনিসই ও' চায় চিরজীবন ধরে। এমনিতর পাওয়া আর ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে পেণ্ডুলামের মতই দুলতে চায় যেন ও'। ও' চলল দেখতে দেখতে চারপাশের গ্রাম, পুকুর, লোকজন।

ও'কে দেখে গ্রামের লোকেরা দণ্ডবৎ করতে লাগল—কেউ কেউ পাল্কি থামিয়ে তাদের আবেদন নিবেদন পেশ করতে লাগল—কেউ কেউ আবার নজর দিয়ে ও'কে কর্তার কাছে যাতে তার কাজটা তাড়াতাড়ি ফয়সাল হয়ে যায় তার ব্যবস্থার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু ও' সেলামির টাকা গরীবদের কিংবা ভাগবৎ ঘরে দানের ব্যবস্থা করে চলল এগিয়ে। ও' তাদের বললে: 'কলকাতায় যাচ্ছে, ফিরে এসে চেষ্টা করবে, যদি কিছু করতে পারে।'

যারা চলে যাবার তারা এমনি করেই তো ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে যায়—কিন্তু ফিরে কি আর আসে? অন্ততঃ অলক যে আসবে না, এ-কথা অলক ভালোভাবেই জানতো।
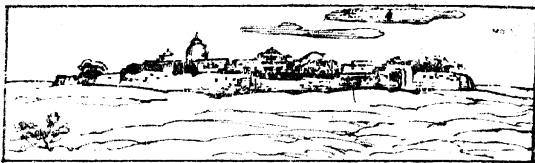
যদিও বলিকুদ রাজবাড়িতে ও'র কাজ, তা হলেও গড় বলিকুদ অর্থাৎ আদৎ বলিকুদ দেখার সৌভাগ্য ও'র আজতক ঘটে উঠলনা। বলিকুদের রাজাসাহেব, জেলার সদর, গঞ্জাম বহরমপুরেই আপাততঃ বিরাজমান। এখানেও বলিকুদ রাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদ। সে প্রাসাদ ঘিরে যে একশ বিঘে জমির বিশাল দেহ বিস্তৃতি, তার সর্বাঙ্গ—দেড়-মানুষ উঁচু পাচিল দিয়ে শাড়ির মত ঘিরে রাখা। অন্দরের সতীত্ব এমনি করেই রাখা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত মহলে সাধারণতঃ প্রচলন।

প্রাসাদের সেই প্রাকারের মধ্যে একটা ছোট্টখাট্টো শহর, যেন কে থাব্ড়া মেরে—চেপ্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে: জনা পঞ্চাশেক চাকর। শ'খানেক পরিচারিকা। এক ডজন কি দু'ডজন রাঁধুনে বামুন। হাফ ডজন পুরোহিত। অসংখ্য আমলা তহশিলদার। এ-ছাড়া তাদের আবার সাঙ্গপাঙ্গও আছে। হাতিশালা, ঘোড়াশালা, মোটরের গ্যারাজ এবং তাদের আনুষঙ্গিক লোকজনও পিঁপড়ের গুষ্টির মত পিল্‌পিল্ করছে চারধারে। প্রাসাদের এই হাতার মধ্যেই বিরাজিত গৃহদেবতার মন্দির। বাহিরের স্থাপত্যে সে মন্দির, পুরীর মন্দিরকে জিব বের করে ভেংচি কাটলেও, মন্দির তো বটে, এবং গতরেও সে কিছু কম্‌তি যায় না। মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের মত তার মাথায় রাজাসাহেব শখ করে একটা মোটরের হেড্‌লাইট ফিট করেছেন, সেটার গর্বে তিনি সব সময় গর্বিত, কারণ তা জ্বালালে না কি অনেক মাইল দূরের রম্ভা ইস্টিশান থেকে ট্রেনের যাত্রীদেরও নজরে পড়ে।

বলিকুদে পৌঁছে, কিছু দিনের মধ্যেই রাজাসাহেবের একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছে অলক। কাজ চালানো উড়িয়া ভাষাতে কথা কইতে এখন তো ও' ভালই পারে দেখা যাচ্ছে। পটায়েৎ মানে মধ্যম রাজ-কুমার মাস্টার বলতে অজ্ঞান! মাস্টার না হলে তার বিকেলটা মোটেই কাটতে চায় না আজকাল। মাস্টার না থাকলে কার সঙ্গে ব্যাড্‌মিন্‌টান্ খেলবে?—খেলাই হয় না যে!

অলক এখানে এসে ছেলেটির ভদ্রতা, আদব-কায়দা শিক্ষা, আর ইংরিজি লেখাপড়ার দিকেও যেমন নজর দিয়েছিল, খেলা-ধুলো আর ছাত্রের স্বাস্থ্যের দিকেও অলকের তেমনি ছিল ঔৎসুক্য। তাই অলকই তো পটায়েৎকে নিয়ে ব্যাড্‌মিন্‌টান্ খেলার রেওয়াজ করেছে এখানে।

ইংরিজি ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্-এর প্রথম গল্পটা পটায়েৎ এখন গড় গড় করে মুখস্থ বলে যায় রেলগাড়ির মত। পাটমহাদেইকে, মানে বলিকুদ রাজার পাটরাণী—কিনা তার নিজের মাকে, সে এই নতুন অর্জিত বিদ্যা 'ইংরিজি' আউড়ে অবাক করে দিয়েছে। তাতেও শেষ হয়নি, আবার উড়িয়া ভাষায় তার তর্জমা করে গল্পচ্ছলে সারমর্ম বোঝাতেও ছাড়েনি।

পাটরাণী মা ছেলের ইংরিজি বিদ্যের বহর এ-হেন কিছু দিনের মধ্যেই যে এত হু-হু শ্বাসে প্রসারিত হয়ে পড়েছে, তা দেখে সত্যি সত্যিই 'কাব্বা' কি না হাঁ হয়ে গেছেন। কৃতিত্ব সবই তো অলকের। অলক না এলে, ছেলের বিদ্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেড়ে যাওয়া···কখনোই সম্ভব হত না এ-কথা তিনিও বুঝেছেন।

পাট্টমহাদেই এতো খুশি, যে পরিচারিকা মারফৎ রাজাসাহেবকে ডেকে পাঠালেন : রাজাসাহেব সন্ধ্যার সময় আজ অন্দরে শুভাগমন করবেন—পরিচারিকা এই শুভ-সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে হাজির হল আবার অন্দরে।

বিকেল হতে না হতে অন্দরে বড়রাণীমার ঘর, ধূপ ধুনো গুগ্গুলে মশগুল। ঘরের মাঝখানে একটা নিচু তক্তাপোষ জাতীয় চৌকো আসন। তার গদির ওপর মখমলের আস্তরনি বেছানো হয়েছে। তারই এক পাশে স্বয়ং বলিকুদের পাটরাণী আসিন হয়ে রাজাসাহেবের অপেক্ষা করছেন। পাটরাণীসাহেবা'র পাশেই খানিকটা জায়গা খালি রাখা হয়েছে। তাতে আবার একটা জরির কারুকার্য খচিত আসন রাখা—রাজাসাহেবের জন্যে।

...চন্দ্রাবতী প্রকাণ্ড একটা হাতপাখা নিয়ে পাটরাণীর ঠিক পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। পাটরাণীর পায়ের তলায় রাজাসাহেবের সবে বিয়ে করা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নম্বর পত্নী প্রথমটির—বয়স চতুর্দশ বর্ষ, পরেরটি ত্রয়োদশী। এঁরা দুজনেই হিরাপুর রাজার 'জেম্মা', অর্থাৎ রাজকুমারী—সহোদরা ভগ্নি! বেচারারা—হাঁটু দুটি ভাঁজ করে একটা হাতের ওপর ভর দিয়ে, ঘাড়-বেঁকানো কুরঙ্গীর ভঙ্গিমাটি—হুবহু টুকলি করেছে। মুখ দুটি ও'দের ঈষৎ অবনমিত. ঘোমটার ঘটাও ও'দের অন্যান্যদের চেয়ে অনেক অধিক। নতুন নতুন বিবাহিত নারীদের লজ্জার আধিক্য একটু বেশিই হয়ে থাকে বলে শোনা যায়।

কিন্তু সর্দা আইন? অলক ভাবে—শুধু সর্দা আইন কেন? বড় লোকদের বেলায় সব আইনেরই সর্দি হয়ে যায় শেষ অবধি।

পাটরাণী সাহেবের বাঁ পাশের মেয়েটির নাম মধুমালতি, বিনি সুতোয় খাসা ফুলের মালা তৈরি করেছে আজ ও'। রুপোর থালায় সেই মালা গুলো সাজিয়ে ভঙ্গিমা করে দাঁড়িয়ে আছে যেন অজন্তার একটা দেয়ালে আঁকা মূরতি। বয়েস পনের। ছিপ্‌ছিপে গড়ন। চোখ নয় তো, যেন শিকারী বন-বেড়াল। সব সময় তাক্-এ আছে—নির্ঘাৎ টুঁটিটি ছিঁড়ে শুষে নেবার জন্যে শরীরের সমস্ত শোণিত। এই পরিচারিকাটিই রাজাসাহেবের আপাততঃ বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে। এর জাতটা নাকি 'কন্ধ'। শোনা যায় 'কন্ধমালে' শিকারে গেছিলেন যখন, তখন, রুপোর জাল ফেঁদে একে জ্যান্ত শিকার ধরে এনেছিলেন। রাজাসাহেব ও'র বাপের কাছ থেকে নগদ মূল্য একশত রৌপ্য মুদ্রায় চিরজীবনের জন্যে সর্বস্বত্ব সংগ্রহ করে আনেন। তারপর অন্দরে আসার কিছুদিন পরই ও' হয়ে উঠল রাজাসাহেবের নয়নের মণি। তাতে সবাই বলে ঃ—কন্ধরা অনেক শিকড়-মাকড় গুণতুক্ জানে, তাই দিয়ে ঐ নিচু জাতের মেয়েটা রাজাকে মুঠোর মধ্যে পুরেছে। ও' আসার আগে, পালা করে রাজাসাহেবের সঙ্গসুখ কম বেশি অন্দরের সবাই পেয়ে থাকতো। কিন্তু মেয়েটা আসবার পর উনিশ-বিশ প্রায় সবার কপালই সমান দাঁড়িয়েছে—এমনকি পাটরাণীর অবদি। তাই জন্যে বলিকুদের অনেক পুরনো পুরনারীরা থেকে হালফিলেরা অবদি, কেউই ও'র উপর খুশি নয়। বহুবার বহু খুঁতে ও'কে খোঁড়া করবার নানা প্রচেষ্টা চলেছিল—তবু আজ তক্ তাতে কৃতকার্য কেউই হতে পারলনা। অন্দরমহলে এই নিয়ে খণ্ড যুদ্ধ থেকে খাণ্ডব-দাহনের ছোট খাট মহড়া, বহুৎ হয়ে গেছে, কিন্তু স্বয়ং রাজাসাহেবের মধ্যস্থতা—দমকলের মত সকলকেই দমিয়ে অবশ্যম্ভাবী অগ্নিকাণ্ড নিভিয়েছে মুহূর্তে।

এই মধুমালতী—রাজাসাহেবের যতই প্রিয়পাত্রী হোক না কেন, অন্দরের আচার অনুষ্ঠানে পাটমহাদেইর সম্মান সবার ওপরে। এর

কোন নড় চড় হবার উপায় নেই। তাই মধুমালতীও রেকাবি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। পাটমহাদেই বসবেন রাজার বামে, অন্য রাণীরা পাটমহাদেই আর রাজার পায়ের কাছে, আর সব পরিচারিকারা থাকবে দাঁড়িয়ে। রাজ আগমন কালে অন্দরের দরবারের কানুনই হচ্ছে এই। তাইত—মল্লিকা, চন্দ্রাবতী, অমনি আরো অনেক পরিচারিকারা সবাই নানা ভঙ্গিতে পাটমহাদেই-এর চারপাশে—কেউ পানের বাটা, রূপোর থালায় ডিবে···কেউবা সুপুরি, কেউ গুণ্ডি, কেউ এলাচের, এমনিতর নানা সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এবার রাজাসাহেব প্রবেশ করলেন—অন্দরের অভ্যর্থনায় সুসজ্জিত পাটরাণীসাহেবার দরবার ঘরে। রাজাসাহেবকে দেখে পাটরাণী উৎসাহের আতিশয্যে রাজাসাহেবের আসন গ্রহণের আগেই বলে উঠলেন, "জগন্নাথ মহাপ্রভুর কৃপায় মোর পুয়ো আজি ইংরিজি শিখি গলানি।" তারি ধুয়ো ধরে, পরিচারিকাবৃন্দ এক সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল, "ইংরিজি শিখি গলানি।"

এর পর পটায়েৎকে ডাকা হলে, তার মুখ থেকে ইংরিজি বিদ্যার নমুনা রাজাসাহেব স্বয়ং স্বকর্ণে শুনে, তাজ্জব! টিকায়েৎ—ভাবী রাজ-গদির যে উত্তরাধিকারী, তার ওপর রাজাসাহেব বিশেষ কারণবশতঃ মোটেই খুশি নন। সে তার সহধর্মিনী সমেৎ কটকেই সব সময় অবস্থান করে। পটায়েৎ? এর বয়েস—তের থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে, তবু রাজাসাহেব একেই তো টিকায়েৎ-এর আসন দেবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার 'রাজ-জোড়া'র নিয়ম এবং জনমতের বিরুদ্ধে তা তিনি

করে উঠতে পারেন নি। আজ পটায়েৎ-এর এমনি ইংরিজি পড়া শুনে এত খুশি, যে নতুন-কেনা তালুক নয়াগড় পটনা ও'র নামে দানপত্র করে লিখে দেবেন স্থির করলেন। এরপর রাজাসাহেব অলকের ওপর হয়ে উঠলেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট—তাকে একজোড়া 'পাট্টযুগা' সম্মান হিসাবে উপহার দেবার হল হুকুম. রাজাসাহেবের মনে শিক্ষক হিসাবে গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থার পাত্র হয়ে পড়ল অলক।

পটায়েৎ তার ইংরিজি পাঠের নমুনা শুনিয়ে রাজাসাহেব আর পাটরাণীসাহেবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পড়তে চলে গেল। রাজাসাহেবেরও সময় ঘনিয়ে এসেছে—গঞ্জিকা আর মোদক সেবনের সময়। তিনি এবার ব্রীড়াবনতা নতুন বিবাহিতা কিশোরী পত্নী দু'টির ঘোমটা সরিয়ে চিবুক দু'টি দু'হাতে ধরে মুখটা তাদের একবার উঁচু করে ধরলেন—ঐটুকুই আপাততঃ তাদের পক্ষে যথেষ্ট! কিন্তু যাবার সময় সেই কন্ধ-কন্যার রেকাবি থেকেই উঠিয়ে নিলেন একগাছা মালার থেকে একটি ফুল! এর ইঙ্গিত—রাত্রিতে শয়নের সময় আজ রাজাসাহেবের সেবার ভার তারই ওপর। এরপর পাটরাণীর গালটা একটু টিপে, চুম্বনের ভঙ্গিতে দূরে থেকেই মুখে একটা চুমকুড়ি কেটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

আজ পাটরাণীসাহেবা অলককে অন্দরে আহ্বান করার আয়োজন করেছেন। 'বঙালি বিদ্যান মাস্টার, দেখিবারো বড় ভল্,' বাঙালী বিদ্বান মাস্টার দেখতেও বড় ভালো; মানে ফাঁকে-ফোকে মাস্টারের চেহারাটা আগেই চেকে নেওয়া ঘটেছে বোঝা গেল।

এ ছাড়া সারা রাজবাড়ি অলকের বিদ্যার প্রশংসায় প্রতিধ্বনিত। চাকর-বাকর আমলা-কর্মচারী সকলের মুখেই ঐ এক কথা, "আমর পটায়েৎ ইংরিজি শিখি গলানি"! এর পর লোকের কাছে অলককে অন্দরে আনার কৈফিয়ৎ-এর জবাবে ঘাটতি ঘটা মোটেই উচিৎ নয়, উপরন্তু ছেলের মাস্টার তো, তার কাছে পর্দার প্রয়োজন এমন কিছু কি আছে? তা নৈলে এখানকার অন্দরের মেয়েরা পর্দানশিনই বটে। অর্থাৎ ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচের···

বলিকুদ রাজপ্রাসাদে আসবার পর অলকের এখানকার অন্দর মহলের অন্তরলোকে প্রবেশের সেই দিনই হল প্রথম মহরৎ— অলকের হয়েছে পাটরাণীমার কাছে আমন্ত্রণ, বিশেষ আমন্ত্রণ! অন্দর মহলে তিনি নিজে বসে অলককে আহার করাবেন। একে তাঁর ছেলের মাস্টার, তাতে এত ভালো লোক, যে সমস্ত লোকের মুখেই তার প্রশংসায় খই ফুটছে। অলক কিন্তু ও'কে এই খাওয়ানোর প্রস্তাবনার প্রথম পর্বেই তার ছাত্র মানে পটায়েৎ মারফৎ পাটরাণীসাহেবার কাছে আব্দার মিশ্রিত আর্জি পেশ করেছিল, যে, নিছক উড়িয়্যার খাওয়াই ও' খেতে উৎসুক। তাই বড়রাণীসাহেবা মেনু করেছিলেন: "পক্ষালো ভাত্‌ত, কখারু আউর বায়গন ভজ্জা, মুগ্‌গ ডালি, শুখুয়া মন্‌জি, তেন্তুলি চট্টোয়ানি।" এছাড়া মিষ্টির মধ্যে ছিল ক্ষীর, পায়েস, আর দু'চার রকম পিঠা। রাণীমা অলকের সামনে সিংহাসন-মার্কা সেই চেয়ারটায় বসেছেন। পাতা হয়েছে অলকের আসন। সামনে নানা পাত্রে এবং বাটিতে সব খাদ্য-সম্ভার সাজানো। আজ অলকের সামনে বেরোবার জন্যে যত্নে তুলে রাখা রুপোলী জরির চাঁদ-তারা-তোলা কলকাতার লিণ্ড্‌সে-স্ট্রীট-মার্কা জর্জেটের শাড়িখানা বের করে পরেছেন। সিঁথি কেটেছেন আবার বাঁকা। মুখের ভিতর এক টোপ্‌লা পান আর গুণ্ডি থাকলেও সারা মুখমণ্ডল পাউডারের

আনাড়ি অপর্যাপ্ততায় উদ্ভাসিত—নতুন চুনকাম-করা দেয়ালের মত!

অলক এখানকার লোকের ধারণা অনুযায়ী সৌভাগ্যবান, পরম সৌভাগ্যবান, পাটরাণীমা নিজে রেঁধে সামনে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন। একি চাট্টিখানি কথা নাকি?

খাওয়া-দাওয়া অন্তে একটি সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণালাভের পর, অলকের সে দিনের জন্যে অন্দর-মহল-খণ্ডের সূচনা-পর্বের হয়ে গেল একটা মোটামুটি মাপ-জোপ—যাকে বলে কি না জরিপ-কার্য—তাই!

অলক পাট্টমহাদেইর সঙ্গে উড়িয়া ভাষায় 'কথাবাসা', কিনা কথা-বার্তা চালিয়ে তোফা জমিয়েছিল। তারপর অন্দর থেকে আহারাদি অন্তে বিদায় নিয়ে ও' যখন নিজের ঘরের দিকে চলছিল, তখন ও' রাণী-সাহেবার চেহারাটা সমালোচকের চোখ দিয়ে মনে মনে বিচার করতে বসে গেছিল: কি জানি কেন, ও'র তো রাণীসাহেবাকে বেজায় পছন্দ। লোকে হয় তো বলবে, মুখে মেয়েদের উপর অলক যতই বেগড়াক না কেন, আদতে মেয়ে মাত্রেই অলকের মন মুচ্ড়ে তোলে! তা নৈলে, পাট্টমহাদেইকে ও' দেখল—আর পছন্দ হয়ে গেল? না, সত্যিই অলকের ভারি ভাল লেগেছে ঐ চেহারা—একটু বয়েস হয়েছে, তা হোক, কি নিটোল নিতম্ব! স্তনদ্বয় কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যিই যেন সুমেরু সমান। একটা বিরাট বলিষ্ঠতা সে রূপের মধ্যে যেন আস্পর্ধায় মাথা উঁচিয়ে! অনেকটা কোনার্কের ভরাট ভাস্কর্যের সঙ্গে কোথায় যেন তার

আদল। ও' ছবি আঁকতে না জানলেও, মনন শক্তিটা ও'র আর্টিস্টের মতই নানা ভঙ্গির গবেষণায় গোলমেলে। তাইত ও'র কাছে নবমঞ্জরির নবনী-কোমল রূপের সঙ্গে এ-রূপের পার্থক্যটাই এইখানে অমন করে ধরা দিল। নবমঞ্জরি ছিল যেন হলদে-হয়ে-যাওয়া পুরোন হাতির দাঁতের তৈরি—ভঙ্গুর ভঙ্গিমাটি, যার গায় ভুলেও হাত লাগলে কালসিটে পড়ে যেতে পারে, এমনি একটি ভাব। শ্যাম্পেনের বুদ্‌বুদের মত হালকা, জোরে ফুঁ দিলেও যার ফেটে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা। তার আবির্ভাব উপযুক্ত শুধু 'নাজুক' নিশিথিনীতে, যেখানে ফুলের গন্ধ অঙ্গের আগে আগে এগিয়ে এগিয়ে চলবে, সেইখানে। সে ছিল, জ্বলে-যাওয়া চাঁদের তীব্র তৃষ্ণায় অহরহ যেন জলন্ত! অসাবধানী শিকারের ওপর সাপের মতই তার সম্মোহন ক্ষমতা, সবার অজান্তে বিস্তার করে আস্তে আস্তে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠে, তারপর তাকে পাকে পাকে পিষে গুঁড়িয়ে আত্মস্থ করাই ছিল তার কায়দা। যেখানে এই বলিকুদের পাটরাণীর অ্যামাজোনিয়ান প্রকাণ্ড অবয়ব, আর তার বিশাল বিস্তার! রাহুর প্রেমের মতই সর্বগ্রাসী যার আবেদন, যার আকর্ষণ সব সময় মনে হয় শক্তিশালী সিংহিনীর মত থাবা উঁচিয়ে রয়েছে নিশ্চিত নিশ্চিন্ততায়। অলকের ঐ চাঁদ-তারা-মার্কা জর্জেট আর বাঁকা সিঁথেটাই খালি বেয়াড়া বেমানান মনে হয়েছিল। ও-চেহারায় কোথায় নাকে থাকবে প্রকাণ্ড একটা বেঁকিয়ে পরা 'গুনা'—কি অদ্ভুত মানাতো? উড়িষ্যার কাপড়গুলো কি চমৎকার কারুকার্যময়—ডেকোরেটিভ্ আর্টের যেন শেষ কথা উচ্চারিত তাদের মধ্যে। কি রং সে কাপড়গুলোয়, প্রজাপতির পাখনাকেও প্যাঁচ মেরে পটকান্ মারতে পারে যেন, তবু এদেশের এই পাটরাণী থেকে শুরু করে অন্দরের সকলকারই কলকাতার যত রাজ্যের বাজে-মার্কা সস্তা কাপড়-চোপড়ের ওপর এত অনুরাগ কেন, ও' বুঝে উঠতে পারে না। পাউডারের খড়ি-গুঁড়ো রংয়ের পরিবর্তে হলুদ-মাখা

এখানকার মেয়েদের গা, কাঁচা সোনার মত! যেমন সুন্দর, তেমনি মানানসই। তবু এই রাজবাড়ির মহিলা-মহলে, নিতান্তই অপদার্থ সস্তা দরের বিলিতি প্রসাধনের জিনিসগুলোর ওপর, কি জানি কি এক অপরিসিম মোহ!
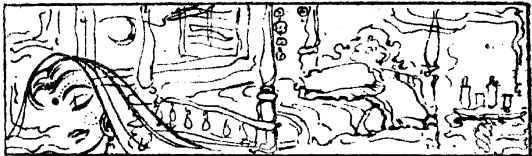
...অলক পড়ছিল হোঁচট খেয়ে আর একটু হলেই—হাসির আওয়াজে চমকে উঠে চাইতেই চোখাচোখি কন্ধমালের সেই বনবিড়ালীর সঙ্গে! অন্যমনস্কে হাঁটিতে হাঁটতে অন্দর-মহলের বারান্দার শেষ প্রান্তের চৌকাটটা অলককে চিৎপটাং খাওয়াচ্ছিল আর একটু হলেই। অলক ও'র দিকে এবার ভালো করে চাইল—ছুরির মত ধারালো হাসির ছর্‌রা আর এক দফা ছড়িয়ে পড়ল অলকের চার ধারে।

অলক হোঁচট না খেলেও, মনে করল সে যেন হোঁচট খেয়েছে। ও' সত্যি সত্যিই পায়ের বুড়ো আঙুলটা দু'হাত দিয়ে চেপে, বসে পড়ল সেই চৌকাটের ওপরই, তার পর একদৃষ্টে আতুর ভঙ্গিতে মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে রইল। দেখতে পাওয়া গেল সাপের জিবের মত মেয়েটির চোখ দু'টো যেন বার বার বেরোচ্ছিল ঢুকছিল—যেন ফনা তুলে ছোবল বসাবার আগে নিস্‌পিস্ করছিল ও'।

মাস্টারের কাছে চলে এসেছে ও' তখন, একেবারে কাছে। মাস্টার তখন ও'কে জড়িয়ে ধরে অনেকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্‌গিস সেখানে কেউ ছিলনা!

মধুমালতী জ্বলে উঠেছে...অন্ধকার আকাশ চিরে উল্কার বহ্নিময় পথের মত জলছে ও'র সর্বাঙ্গ! মাস্টার ছোবল না মেরেও শুধু স্পর্শের মারফৎ একটা বিষাক্ত বিবসতায় সর্বাঙ্গ ও'র আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তখন। মধুমালতীর ও'কে চাই-ই চাই, ও' যেমন করেই হোক মাস্টারকে ছিনিয়ে নেবে আর সকলকার কাছ থেকে। তারপর খুশিমত খুব্‌লে

খুবলে খেতে চায় ও'কে—একা, একেবারে একা, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়।

কিন্তু মানুষের দিল্ অনুযায়ী দুনিয়াটা যদি চলত সব সময়, তা হলে তো কথাই ছিলনা। অলককে একান্ত নিকটে পাওয়া সম্পর্কে ঐ কন্ধ-কন্যাটি যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা কামনা করছিল, কার্যতঃ হল ঠিক তার উল্টো। আগে থেকেই পাট্টমহাদেইর সঙ্গে ও'র লেগেছিল বিষম রেশারেশি, আর তা শেষ সীমায় পৌছল এসে অলককে নিয়েই। অথচ, যাকে নিয়ে এত কাণ্ডকারখানা, সেই অলক এ-ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানেনা। কন্ধমালের বনবিড়ালীর সঙ্গে সে দিনের সেই মুহূর্তের অন্তরঙ্গতা ও'র কৌতূহলে কাতুকুতু দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারিনি এখনো অবধি!

বলতে গেলে, এইতো, ক'দিন আগেই তো নবমঞ্জরি ও'র জীবনে এসেছিল। ও'র কথায়, ও'র কাজে বিশ্বাস করেছিল—তাইত হৃদয়াবেগে অলক মনের দিক থেকে ও'র কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল অনেকখানি। তার ফলেই তো সেখান থেকে নিতে হল বিদায়। আদতে ও-দেশী অঙ্গনাদের অর্থাৎ মেয়েদের সঙ্গে সমঝে চলার চাল, মেপে পা ফেলার প্যাঁচ, সময় মত সরে পড়ার কায়দা, সবই করতলগত করেছে সেই কত বছর থেকে—যত বছর ও' ও-দেশে ছিল, ঠিক ততবছর ধরেই তো। কৈশোরের শেষ প্রান্ত থেকে যৌবনের বিষুব-রেখা অবধি! কিন্তু এ-দেশের মেয়েদের মেজাজের বগলে থার্মোমিটার মারায় ও' মোটেই পোক্ত নয়—ও'দের মানসিক হালচাল কিংবা মন-দেয়া-নেয়ার নাড়ি টেপায় ও' একেবারে নাবালক। এদিককার বালিকাদের বুকের ব্যারোমিটার পড়ার বুদ্ধিতে ও' সত্যি সত্যিই ছিল বিল্‌কুল

নিরেট। এ-দিশী দুহিতাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বলতে তো একমাত্র ও'র স্ত্রী—বিলেত যাবার আগে সেই যে মেয়েটিকে ও' বিয়ে করেছিল—যদিও মাত্র ছ'মাসের জন্যে ছিল ও'র সে বিবাহিত জীবন, তবু তারই ধাক্কায় চির-জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির হয়ে গেল মূলোৎপাটন। জীবনটা ও'র চক্রাকার ছড়িয়ে গেল তখন থেকেই তো। সবার দৃষ্টির আড়ালে—এমনকি নিজের অনুভব শক্তির অগোচরে, ও'র চিত্তের সারাটা চত্ত্বরময় ছায়ার মত যার অশরীরী অস্পষ্ট অস্তিত্ব বিস্তার হয়ে আজও, শূন্যতার বিপুল পরিপূর্ণতা নিয়ে। বিস্মৃতির শ্যাওলাঢাকা ও'র স্মৃতির সৌধ খুলে উঁকি মারে অনেক অনেক যুগ আগেকার কথা: মনে পড়ে, সেই মধুচন্দ্রের মদালস মাধুর্যের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা বরাতের বোল্‌তা কি বিষাক্ত হুল্‌-ই না ও'কে বিঁধিয়েছে। মিলনের পূর্ণিমা-রাত পোহাবার পূর্বেই ধরা পড়েছিল তার রোগ! ও'র পাশে স্বপ্নের মিনারে দাঁড়িয়েই অলকের সেই প্রথম দর্শন হল দুনিরার নিকট-মুখভঙ্গিমা, আর তার বাস্তব রূপ। অকস্মাৎ একেবারে সামনা-সামনি মুখোমুখি।

···নিত্য ডাক্তার আসে, ভিজিট নিয়ে চলে যায়। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ অনুযায়ী ওষুধ আনারো ত্রুটি নেই—এক দিন ধরা পড়ে গেল: দেখে ওষুধগুলো না খেয়ে নর্দমার মুখে দাগ মিলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে···কত বকল, কত বোঝাল, ও' তখন হেসে উত্তর দিয়েছিল—নিতান্ত গাঁয়ের মেয়ের একান্ত অনুপযুক্ততা নিয়ে ও' নাকি অলককে একান্ত করে পেয়েছে, ও' পরিপূর্ণ। অলকের মত ঝড়ের ঝুঁটিটি যে সে তার ভীরু দু'টি মুঠির মধ্যে আটকেছে, এই তার গর্ব—এখন মরণ যদি নামে তার জীবনে—নামুক, তার আক্ষেপ কিংবা বাসনারও বাকী কিছু নেই। অলকের কোলে শুয়ে ও'র মুখের পানে চেয়ে চেয়েই যদি চরমক্ষণ আসে, তবে আসুক, সেই হবে নাকি তার পরম মুহূর্ত···

অদ্ভুত—অত্যন্ত অদ্ভুত, না ?

মিলনের মত্ততায় লোকে যখন মাতাল থাকে, তখন সেই মূর্খ মেয়ে কি করে মৃত্যুর মহত্ত্ব মনন করেছিল, একথা আজও অলকের মনে চির জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতই জীবন্ত রয়ে গেল সকল বিশ্লেষণের বাইরে।

তারপর কত দীর্ঘ বর্ষের সুদীর্ঘ মিছিল সময়ের সড়ক বেয়ে চলে গেল। জীবনের এই অনিশ্চিত স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল অলক বিদ্রোহীর ভঙ্গিতে। একে একে উড়িয়ে দিল ও'র যা কিছু ছিল—বাড়ি, ঘর, সম্পত্তি। নিজেকে সরিয়ে নিল দূরে—আত্মীয়স্বজন থেকে। দানা বাঁধবার আগেই ভাগ্যের কিতিনাশায় যখন ও'র জীবনের ইমারৎকে উপড়ে অমনি ভেঙে ধসিয়ে দিয়ে গেল, তখন অনুভব করল আজীবন ভেসে বেড়ানোর ভাগ্যই লেখা আছে বুঝি ও'র জীবনে। স্থির করল ঝড়ের ঝাপটায় ঝরে পড়া পাতার মতই জীবনটা নিয়ে করবে ও'—ফুঁ দিয়ে-ওড়ানো সাবানের ফেনার সেই ছেলেখেলা। যা কিছু মানুষের মহত্ত্ব, তারই ওপর উর্দ্ধবাহু আস্ফালন ক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে উঠতো ও'র, যেন আক্রোশে। যা কিছু এ-পৃথিবীর পবিত্র, মহান, তারই ওপর ও'র যেন উগ্রমূর্তি অভিযোগ। ও'র কাছে রাজাও যা, রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ভিখিরিও যেন তাই। ও' যেন রাজার মধ্যে সেই ভিখিরির 'ভূখার্ত্ত'-কে আবিষ্কার করে, আর ভিখিরির মধ্যে দেখতে পায় রাজাকে। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির ঘটে গেল এক প্রলয়কাণ্ড পরিবর্তন! অলক তখনকার ও'র সেই বিচ্যুত-শ্রেণী জীবনের উপার্জন আর অন্ন-সংস্থানের উপায় হিসাবে শুরু করল সস্তা সাময়িক সাহিত্য আর সংবাদ-পত্রের সেবা। দেখল, তাতে সংবাদপত্রের সেবার চেয়ে সংবাদ-পত্রের সত্ত্বাধিকারীদের পদতল সেবারই একমাত্র আবশ্যক। আর সাহিত্য ?

এখানে সাহিত্য সেবার একটি মাত্র অর্থ—উঞ্ছবৃত্তিতে ওস্তাদ হওয়া।

অলকের পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল বহু পূর্বে বাল্যকালেই। মাতা, পুত্রের বিবাহের পর পুত্রবধূর হাতে সংসারের চাবির গোছাটি তুলে দিয়ে কাশীতেই বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন খবর পেল—সেই তার মাতৃদেবীও কাশীতে মরজগতের মায়া থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। পৃথিবীতে একান্ত আপন বলতে আর ও'র কেউ রইল না। মাতার মৃত্যুর শেষে ইনসিওর থেকে পাওয়া যৎসামান্য অর্থে ও' পাড়ি মারল বিলেতে। নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে বার বার আছাড় খেয়েও বারো বছর ও-দেশে ও' বন্যার মত ভেসে বেড়িয়েছে—এক কূল থেকে আর এক কূলে। বাঁধা পড়েছে এক তরণী থেকে আর এক তরণীতে। তারপর রামচাঁদের দ্বাদশবর্ষ বনবাসের মত ও'-ও এক দুই করে গুনে বারোটি বছর বিদেশে কাটিয়ে, আজ ফিরেছে দেশে। তাই এ-দেশের চেয়ে ও-দেশের মানুষ চরিত্রে, নারী চরিত্রের অভিজ্ঞতায়, ও' অনেক বেশি অভিজ্ঞ, তাদের নিয়ে ও' পাকা খেলোয়াড়ের মত বাঁশবাজি দেখাতে পারে—কিংবা দড়ির খেলা। কিন্তু এই নবমঞ্জরি? এ-চরিত্র ও'র কাছে যেমন অদ্ভুত, তেমনি অস্বাভাবিক, যেমন মিথ্যা, তেমনি মধুর, যতখানি স্বার্থান্ধ সাজ্যাতিক মনে হয়, ততখানিই আবার মনে হয় নাগালের বাইরে রহস্যাচ্ছন্ন। গোলকধাঁধার মতই ও'কে ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের দুরূহ প্রবলেমের মত যার সমাধান করা ও'র সাধ্যের অতীত! ও' ভাবে পাণ্ডুয়ার কুঠিবাড়িতে নবমঞ্জরি যে ও'র ঘরে ঢুকে নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতায় বুকের ওপর আছড়ে বলেছিল—"মরুভূমির মত জীবনের ছায়াহীন বালুরাশি ভেঙে ও' আর চলতে পারছে না, বাঁচবার জন্যেই ও'র আবশ্যক অলককে, সেটা নিছক মিথ্যা, না? বন্ধুত্ব, প্রেম, সবার ওপর কার্য উদ্ধার করাই কি সব চেয়ে বড়? না, না, তার চেয়ে বড়, তার ওপরে, হচ্ছে এ-দেশী নারীদের গুক্কারজনক লোক দেখানো সতীপনা—ও'র কাছে যা অসহ্য!

নারীত্বের চেয়ে অধিক, প্রেমের চেয়ে পরিপূর্ণ, লোকের কাছে এই মিথ্যা 'সতীলক্ষ্মী' প্রচার করায় কি লাভ? অলকের ও-দেশী মনের কাছে এ-ঘটনা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি আশ্চর্যজনক হয়ে ক্রমাগত ও'কে ধাক্কা মেরে ভূতলশায়ী করে ফেলেছে যেন। ও' মনে মনে কামনা করে—'হোক নবমঞ্জরির সিঁথির সিঁদুর ক্ষয়হীন। 'হাতের নোয়ার' কড়া, হাত-কড়ার মতই এঁটে বসুক আরো জবরদস্ত। ও'র সতীত্ব ঘোষিত হোক শতাব্দীর সূর্যালোকের মত। শাখার সহস্র বাহু, শৃঙ্খলের মতই থাক ও'র মনের সর্বাঙ্গ ঘিরে—সুখী হোক ও'।' অলক বরাতের পদাঘাতে আরো দুরান্তের পদচারী। ভবিতব্যের তাঁবে ও' এমনি তাঁবেদার—যে তাঁবু ও' কোথাও ফেলতে চাইলেও পারবে না। কেননা, কোন না কোন অঘটন ঘটনায় চিরন্তন-ই ও' ঘূর্ণায়মান থাকবে, এই ও'র ললাটের লিপি। নবমঞ্জরির কাছ থেকে এ-বাক্যায় হুমড়ি খেয়ে পড়বার পর কাপড়ে ধুলো ঝেড়ে উঠতে উঠতে এই কথাই বার বার অনুভব করেছে ও'। এর পর আর না, জাহাজে দাঁড়িয়ে নারীর প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তি এ-নয়। এবার মনে মনে ঢুকেছে ও'র ভয়। ভারতীয় মেয়েদের শুরু করেছে ও' দস্তুরমত ভয় করতে। তাই এখানে এসে পাটরাণী আর ঐ কন্ধ-কন্যা ও'কে করায়ত্ত করার যতই প্রচেষ্টা করুক—ও' আর ও-দিক দিয়েই মাড়াবে না। হৃদয়াবেগের সদর দরজায় সত্যিই ও' খিল এঁটেছে এবার। কিন্তু তবু ও'কে নিয়েই বলিকুদ প্রাসাদে মাস কয়েকের মধ্যেই কলহের কাঁটাগাছ জমিন নিল পাকা-পাকি, শুধু তাই নয়, অলককে আদর দিয়ে মাথায় তোলা নিয়েও রেশারেশির রোপণ হোল সাজ্যাতিক বিষবৃক্ষের বীজ।

ও'দিকে পাট্টমহাদেইর অন্দর আবাসেই অলকের 'নিত্য আহারের নৈমিত্তিক নিমন্ত্রণ—দৈনন্দিন অন্য সব ঘটনার মতই ঘটে, অতি সাধারণ রূপ নিয়ে! খালি দেখা যায়, আদরের আতিশয্য এগিয়ে চলে নিত্য নতুন নানা পথে। প্রথমে পাট্টমহাদেই সিংহাসন-মার্কা চৌকিতে বসেই আহার দেখতেন অলকের, তারপর হয়—মাছি তাড়াবার জন্যে মাটিতে নেমে চাপটি খেয়ে মেজেতে বসে তিনি নিজেই অলকের মুখের সামনে তালবৃন্তের হাত-পাখাখানা নাড়ছেন, এতেও মনঃপূত হল না, এক দিন দেখা গেল, তাঁর বক্ষাঞ্চল তালবৃন্তের স্থান অধিকার করেছে। ঘনিষ্ঠতা ঘনায়মানের উদ্ভাবনীতে পাট্টমহাদেইর তখন 'উন্মাদিনী দিশাহারা' অবস্থা।

কল্প-কন্যা মধুমালতী বলিবুদ রাজার বিলাস-কক্ষে সে সময় তাঁর বুকের উপর লুটিয়ে ব্যাকুল বাহুর নিবিড় বেষ্টনির সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু আকুল আবেদন জানাল—'সে ইংরিজি পড়তে চায়—বাণপুরার রাণীর মত সে-ও হতে চায় শিক্ষিতা। ঘোড়ায় চড়বে, ইংরিজি খবরের কাগজ পড়বে, চালাবে মোটর গাড়ি…'

আবেদনের আতিশয্যে, আর কতকটা উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত রাজাসাহেব অনুমতি দিলেন তাকে অলকের কাছে পড়াশোনা করতে। তবে পড়তে হবে এই ঘরে এবং তাঁর উপস্থিতিতে।

মধুমালতীর শিক্ষা কার্যের আরম্ভে অলক উৎসাহিত হয়ে উঠল অত্যন্ত। কারণ ইংরিজি প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকার জন্যে বরাদ্দ হল ইংরিজি খবরের কাগজ-ও। অলকই তো নির্দেশ দিয়েছিল ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ার। ইংরিজি খবরের কাগজ পড়লে নাকি খুব তাড়াতাড়ি ইংরিজি আয়ত্বে আনা যায়। এরপর রাজপ্রাসাদে খবরের কাগজের পদার্পণ দেখে অলক আহ্লাদে আটখানা। ওঃ, খবরের কাগজের সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্দর-বৌয়ের সম্পর্ক ও'র দাঁড়িয়েছে সেই পাণ্ডুয়া থাকার সময় থেকেই তো। যাক আজ থেকেই নিত্য সকালে রাজ-কক্ষে চায়ের বাটিতে চুমুক মারতে মারতে কাগজ পড়বে··· আঃ কি আরাম, বাঁচা গেল! সভ্যতার সঙ্গে, ছাপার হরফের মারফৎ হলেও, তবুতো কিছুটা মুখোমুখি হবে।

সারা সকাল মধুমালতীর সান্নিধ্যে রাজাসাহেবের সামনে চা খেতে খেতে আগাগোড়া স্টেট্‌স্‌ম্যানখানা চেঁচিয়ে পড়ে, তারপর মানে বোঝানোর পালা। খবরের কাগজের পাঠ খতম হলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ও'র ফেনা। ভাবে, কি কুক্ষণেই খবরের কাগজ শুনিয়ে মধুমালতীকে ইংরিজি ভাষায় দুরস্ত করবার বাসনা করেছিল প্রকাশ। এখন সামলাও ঝক্কি। সমস্ত কাগজটা চেঁচিয়ে পড়তে গলাটা ও'র চৌচির। মধুমালতী কিন্তু ভারি মজা পেয়ে গেছে। খবরের কাগজের খবরগুলো শুনতে ও'র ভারি ভালো লাগে। অলকের সঙ্গে সঙ্গে-ও'-ও

ইংরিজি ভাষা উচ্চারণে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, এমন কি রাজাসাহেবের লেগেছে খবরের কাগজের নেশা। আজকাল মন্দিরে যাবার সময় পেছিয়ে দিয়ে স্নানের পর সারা সকালটা খবরের কাগজ শুনেই কাটান।

যাক, অলকের সকালে এইরকম কণ্ঠ বিদীর্ণকারী খবরের-কাগজ-পাঠ-পর্ব সমাপ্তে স্নান-আদি শেষ হলে দ্বিপ্রহরে পাটরাণীমার পরম পরিচর্যায় ইতি ঘটে আহার। আহার অন্তে শুরু হয় পটায়েতের পঠন-পাঠন কাণ্ড। তারপর একচোট বিকেলে ব্যাড্‌মিন্‌টান্ খেলা হয়ে যায়, এমন সময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজাসাহেবের ঘর থেকে আসে আবার আহ্বান। মধুমালতীর শুরু হয় ফার্স্ট বুক পড়া। বইয়ের পাতা উল্টোবার নামে, কখনো বা বইটা নিজে পড়বার ছুতোয়, এরই ফাঁকে মাস্টারের আঙুলগুলোর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির থেকে চেনাচিনির নিবিড়তর সম্পর্কে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। এখন মাস্টারের কোন্ নখের উপর কটা সাদা দাগ আছে, ও' সচ্ছন্দে মুখস্থ বলে দিতে পারে। কোন্ আঙুলে একটা তিল—কোন্ আঙুলে একটা কাটা দাগ, কোন কিছুই বাদ পড়বে না—সব, সব। তারপরে মানে বুঝতে গিয়ে মাঝে মাঝে চোখের চাকু ছুরিতে মাস্টারের মনের পেন্সিলটা চোখা করতে হয়ে ওঠে বেমক্কা চঞ্চল!

রাজাসাহেব?

সন্ধ্যাবেলায় রাজাসাহেব তো তখন ধাপে ধাপে মোদক, গাঁজা, আফিং আর সিদ্ধির নেশায় শিবশম্ভুটি। অলকের মনের মেন্ মিটার ফিউজ হয়ে যাওয়া—তাই মধুমালতীর আঁখির বিদ্যুতের সঙ্গে শরীরের স্পর্শেও ও'র বুকের মধ্যে একটি বাতিও আর জলেনা, কিন্তু মধুমালতীর তো আর ফিউজ হয়নি মেন্ মিটার, তার মনের মতিমহলে হাজার ঝাড়ের নিভে-থাকা বাতিগুলো এতে এক সঙ্গে জলে উঠে, তৈরি করে যৌবন-জয়ন্তীর উজ্জ্বলাময় বিজয়-উৎসব।

এমনি করে অলকের দিনগুলো নিজের অজান্তেই ব্যাড্‌মিন্‌টানের স্যাট্‌ল্‌-কর্কের মতই একবার মধুমালতীর হাত থেকে পাট্টমহাদেইর ব্যাটে, আবার পাট্টমহাদেইর হাত থেকে মধুমালতীর ব্যাটে, এধার থেকে ও-ধার, ও-ধার থেকে এধার করে বেড়াচ্ছে, এমন এক সময় আমলাদের কায়দা-কানুন ভব্যতা শেখাবারও ভার পড়ল অলকের ওপর, উপরি খাটুনি হিসেবে। মহারাজাধিরাজবাহাদুর সম্বোধনটাই যাতে সকলকে ও' শিখিয়ে দেয়, এইটেই বলিকুদ রাজার বেজায় অভিলাষ। এই সূত্রেই প্রথম ও' পট্টনায়েকের সংস্পর্শে আসে। পট্টনায়েক বলিকুদ কাছারিতে ছামুকরনের কাজ করে। ছামুকরনের পদ অনেকটা এ-দিককার সাব-ম্যানেজারের মত অর্থাৎ কিনা ম্যানেজার কিংবা দেওয়ানের ঠিক পরের ধাপ আর কি।

পট্টনায়েক লোকটি অলককে অল্প দিনেই পটিয়ে ফেলেছে। খুব কিছু শিক্ষিত না হলেও আই. এ. অবধি সে পড়েছে। আচার-ব্যবহার আর সহজ বুদ্ধিতে এই 'করন' তরুণটি সদাই সজাগ সর্ব বিষয়ে। অলকের সঙ্গে ও'র অন্তরঙ্গতা অল্পদিনের মধ্যেই অতিশয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ও'র বাড়ি খাস বলিকুদ, কিন্তু এই গঞ্জাম বহরমপুরের ইস্কুলে ও' মাইনর পাস করে ইণ্টারমিডিএট অবধি পড়ার সুযোগ পেয়েছিল—সারা বলিকুদের এলাকায় ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম ম্যাট্রিক পাস! অলক জিজ্ঞেস করে, "কেন বলিকুদ তো শুনেছি বেশ বড় এলাকা, সেখানে ইস্কুল নেই ?"

—ছিল, সারা বলিকুদ রাজত্বে মাত্র গড় বলিকুদে একটি মাইনর ইস্কুল ছিল, কিন্তু প্রজারা শিক্ষিত হলে অসুবিধা হয় পাছে, তাই রাজা-সাহেব সেটা উঠিয়ে দিয়েছেন।

—অ্যাঁ, বল কি, প্রজারা শিক্ষিত হলে রাজার অসুবিধে হয়, তাই একটি মাত্র ইস্কুল উঠিয়ে দিল ?

—তা, একবার চলুন গড় বলিকুদে, দেখবেন সেখানকার লোকরা

কত সরল, রাজার খাজনা না দিলে জমিতে ফসল ফলবেনা মনে করে, নিজের থেকেই ঘটি-বাটি বিক্রি করেও খাজনার টাকা দিয়ে দেয়।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, সত্যিই তারা মনে করে রাজা প্রজার সম্পর্ক বাপ্প পুয়োর সম্পর্কই—শুধু তাই নয় পূর্ব জন্মের সঙ্গেও এর যোগাযোগ আবিষ্কার করে।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে পুয়ো কিনা পুত্র তো তার কর্তব্য পালন করছে ঘটি-বাটি বিক্রি করে খাজনা দিয়ে! আর বাপ কি করছে সেই অনুপাতে তার কর্তব্য পালন ? একশ চাকর, পঞ্চাশ জন পরিচারিকা, একাধিক স্ত্রী! এ সবের খরচ তো ঐ দরিদ্র পুত্রতুল্য প্রজার ঘটি-বাটি বিক্রি করেই চলে—পঞ্চাশজন চাকরের মাইনেই তো কম পক্ষে দু'হাজার টাকা মাসে।

—কি বলছেন মাস্টারবাবু, রাজবাড়িতে মাইনে কে নেবে ? দেবেই বা কে—ও'রা তো সব বেঠি খাটে।

—'বেঠি' মানে ?

—'বেঠি' মানে, রাজার আবশ্যকে প্রজারা পালা করে বিনি পয়সায় খেটে দেওয়ার যে রেওয়াজ আছে—তাই।

—ও বুঝেছি, ইংরিজিতে যাকে ফোর্সড্ লেবার বলে।

—তা হবে হয়তো, আমার অত ইংরিজি জানা নেই।

—আচ্ছা মেয়েরা—ঐ পরিচারিকারা—তারাও কি মুফ্‌ত খাটে ?

—ও'দের তো দেখতে সুন্দর দেখে ও'দের বাপ মার কাছ থেকে কিছু টাকা দিয়ে কিনে আনা হয় চিরকালের জন্যে, ও'দের আবার মাইনে কী ?

—কোথা থেকে কিনে আনা হয়, এক এক জনকে কিনতে কত টাকা পড়ে ?

—এই রাজ্যের মধ্যে থেকেই প্রায়শঃ, কখনো কখনো বাইরে থেকেও, বাপকে পঞ্চাশ থেকে একশ টাকা দিলেই যথেষ্ট! সে লেখাপড়া করে দানপত্র করে দেয়।

—বাঃ, মানুষ বিক্রি! এরকম জিনিস তো কখনো শুনিনি! ক্রীতদাস-প্রথা শুনেছিলুম সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে, এমন কি অ্যাবিসিনিয়াতেও। নেটিভ স্টেটের তুলনায় এই গড়জাতের জমিদাররা তো নেংটি ইঁদুর! উপরন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের খাস তদারকির তলায়। সাহস করে মানুষ কেনা-বেচার ব্যাপার করতে? আশ্চর্য!

—কেন এই পরিচারিকা আনার এই ধরণের প্রথা আপনাদের বাংলা-দেশেও তো আছে।

—অসম্ভব, হতেই পারেনা।

—কি বলছেন, আমি নিজে গেছিলুম টিকায়েতের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে সেখানে—সেটা বাংলা-দেশের একটা রাজ-জোড়া—পুলিস পাহারা, কোর্ট, কাছারি সব তাদের নিজের। সেখানেও তো দেখেছি 'কাছুয়ানি' রাখার কায়দা রাজ-পরিবারের ঘরে ঘরে। বিয়েও তো করে তারা অনেকগুলো করে। এত কী? আগে এ-রাজ্যেই তো নিয়ম ছিল কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে প্রথম রাজার কাছে আসবে উপঢৌকন, তারপর সে যাবে স্বামীর ঘরে।

—বড় চমৎকার প্রথা দেখছি!

—তা দুনিয়ার হালচালের মোড় মোড়বার সঙ্গে ক্রমে সে প্রথার প্রচলন আজ ঠিক ওই ভাবে আর নেই। তবে রাজা ইচ্ছে করলে যে কোন কুমারী কন্যাকে রাজপ্রাসাদের আসবাব হিসাবে সংগ্রহ করতে সক্ষম।

অলক আপন মনে এই সামন্ততান্ত্রিক বিলি ব্যবস্থার ব্যাপারগুলো মনন করে বলে ওঠে—বাঃ, খাসা নিয়ম। একেবারে রামরাজত্ব!

—মাস্টারবাবু, এর বিরুদ্ধেই তো আজকাল ক্রমশঃ জনমত জেগে উঠছে।

—কোথায় সে জনমত? কোথায়, কোথায়? মানুষের মত মানুষ থাকলে কোন কালে এরা—এই নোংরা ফিউডাল ক্লাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। যে উড়িষ্যার অপূর্ব অতীত সাক্ষী দিচ্ছে কোনার্কে, ভুবনেশ্বরে, তাদের অতুলনীয় বয়ন-শিল্পের কারুকলায়—কোথায় সে উড়িষ্যা? পট্টনায়েক, আমি সেই উড়িষ্যা দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। একদা ইতিহাসে ছিল—ধর্মে, দর্শনে, শাস্ত্রে, শিল্পে, সাহিত্যে, উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যমণি···সে জিনিস আজ কোথায়?

—আবার উড়িষ্যা জাগবে মাস্টারবাবু। এই ভ্রষ্ট চরিত্র রাজাদের দেখে উড়িষ্যার ওপর যেন ভুল ধারণা না করেন। ধন-তান্ত্রিক সমাজের এই সব ধ্বজাধারীরা সব প্রদেশে সব দেশেই উনিশ-বিশ প্রায় একই প্রকার দেখতে। এখনো অনেক ভাস্কর আছে, যাদের হাতের কাজ জগতের দরবারে উড়িষ্যার কলা-কৌশলের প্রতিপত্তি আগের মতই প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের প্রচারের দিকে বিলকুল উদাসীন, আমাদের প্রদেশের শক্তিশালী এ-যুগের কবিদের মধ্যে অন্যতম শচিরাউতরায়ের 'বাজিরাও' পড়েছেন? কিংবা কালিন্দিচরণ পাণিগ্রাহির লেখা কোন বই?

—না উড়িষ্যা ভাষা অল্পবিস্তর কিছুটা বুঝতে এবং বলতে পারলেও, পড়তে পারা অবধি এগোনো এখনো হয় নি।

—কিন্তু জানবেন, অন্য প্রদেশের তুলনায় প্রগতিশীল সাহিত্যিক হিসাবে কমতি যান না কিছু তাঁরা···মার্জনা করবেন, সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের কাছে আপনারা, বাঙালীরা, বড় প্রাদেশীক মনে হয়। নিজের প্রদেশ ছাড়া অন্য প্রদেশের দিকে আপনাদের অসম্ভব অজ্ঞতা। ইংরেজদের আওতায় আপনাদের প্রদেশ সর্বপ্রথম এসেছিল

কিনা, তাই ঐ ইংরেজদের তাঁবেদারির তক্ত-তাউসে বসে নিজেদের আত্মপ্রচারে আপনাদের প্রদেশ পোক্ত হওয়ার সুযোগে নিয়ে, অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক আগে থেকেই অগ্রগামী—সত্যি, সেদিক দিয়ে উড়িষ্যা কেন, অন্য সব প্রদেশই অনেক পিছিয়ে।

—যাক্, সে ত গেল বাঙালী-বিদ্বেষের তথাকথিত তথ্য, কিন্তু 'বাজিরাও' টা কি ব্যাপার?

—উড়িষ্যায় সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বহ্নিময় বাণী! এদেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা যত দিন আছে, আমাদের কোন উন্নতি নেই মাস্টারবাবু।

—পটনায়েক, জানবে, এই বাঙালী-বিদ্বেষ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ-গুলির অনেকটা মুদ্রাদোষের মত দাঁড়িয়ে গেছে। বাঙালীরা যে নিছক দেবতা, তা অবিশ্যি আমি বলছিনে, আর আমি বাঙালী হয়েও বাঙালীর গুণও যেমন পাইনি, বাঙালীর দোষও তেমনি আমার মধ্যে নেই—তাই নিরপেক্ষ সমালোচক হিসেবে বলছি—বাঙালীরা এগিয়ে চলার পথে অনেক বেশি দূর অবধি দেখতে চেষ্টা করার প্রয়াস করে।

—তার মানে?

—তার মানে বাঙলা মুল্লুকে আজও সামন্ততন্ত্রের চলন চলতি থাকা সত্ত্বেও, তাদের ধ্বজাধারীরা কালোপযোগী নিজেদের কর্তব্য কতক কতক যে করে চলার চেষ্টা করে, তা' অস্বীকার করা যায় না। নেটিভ স্টেট কিংবা ফিড়ুডারি স্টেট বাঙলা দেশে দু'টি বই তিনটি নেই। তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজবংশ নির্ঘাৎ সাহিত্য-শিল্পের উন্নতির দিক দিয়ে কিছুদিন আগে অবধি অনেক কিছু করার প্রচেষ্টা করেছে। এ ছাড়া বাঙলার পুরোন জমিদার ঘরের মধ্যে নাটোর রাজবংশ, ঠাকুর পরিবার, সুসাং, মৈমনসিং এই সব জমিদারদের মধ্যে অনেকেই, বাঙলা দেশের

নানা উন্নতির দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন কিন্তু আজ তাদেরও যুগ ফুরিয়ে এল-এল হয়েছে। একথা বাঙলা দেশের সাধারণ দশজন লোকে যেমন বোঝে, তারাও সেকথা বোঝার কতকটা বুদ্ধি লাভ করে সাধারণ ভদ্রলোক হওয়ায় সচেষ্ট—সে জায়গায় তোমাদের উড়িষ্যায় একজন বছরে-বারো-হাজার-টাকা-আয়ের জমিদারও অন্য-জগতে বিচরণ-বিলাসী হয়ে নেই কী?

—কেন, সেরকম ত আমাদের এ-প্রদেশেও অনেক রাজারা আছেন, আপনি আমাদের শুধু খারাপ নমুনার উল্লেখ করলে চলবে কেন মাস্টার-বাবু? সেরাইকেল্লার রাজবংশকেই দেখুন না কেন—উড়িষ্যায় 'ছাউ নৃত্য'-কলার প্রসার এবং প্রচারের জন্য তাদের বংশের প্রচেষ্টা আজ দেশের প্রত্যেক লোকই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য—তাঁদের বংশের প্রত্যেকটি বংশধরই কেউ উড়িষ্যার সাহিত্য, কেউ উড়িষ্যার শিল্প, কেউ-বা উড়িষ্যার সঙ্গীত নিয়ে এ-প্রদেশের চারু কলা, সাহিত্য ইত্যাদির নানা বিভাগের উন্নতির জন্যে একান্ত মনে চেষ্টা করছেন, অবিশ্যি সেরাইকেল্লা, জেপুরএর রাজবংশের মত দেশের কৃষ্টির অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ক'জন রাজাকে পাওয়া যায় সারা উড়িষ্যায়? সত্যি কথা বলতে কী, সামন্ততন্ত্রের নাভিশ্বাসও নিকটবর্তী। ও-জিনিস যুগধর্ম হিসাবে হয়ে এসেছে জরাজীর্ণ।

—ঠিকই বলেছ পট্টনায়েক, এই রাজা-জমিদারদের আয়ু ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, এদের শেষ হয়ে আসতে বেশি দেরি আর নেই।

—তাই ত বলছি, চলুন আমার সঙ্গে গ্রামে, সেখানে দেখবেন যে মানুষ তারাই, সেই গ্রামের লোকেরা—উড়িষ্যাবাসীরা দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু জীবনে শিল্প-সৌন্দর্য-সঙ্গীত তাদের মরেনি। শোনাব সেখানে গ্রামের গান। দেখাব সেখানে পাথর কুঁদে কোনার্কের

মূর্তি যারা বের করেছে, তাদের বংশধর। মেয়েদের বয়নকার্যের কারুতা, আরো কত কী? তালপাতার পুঁথির পৃষ্ঠায় নানা কারুকার্যময় রেখার সূক্ষ্মতা।

—না, না, আর লোভ দেখাবার দরকার নেই। যেতেই হবে তোমার সঙ্গে গ্রামে, একেবারে খাটি উড়িষ্যার গ্রামে।

অলক খবরের কাগজের পাতা নিত্য সকালে উল্টোবার সঙ্গে সঙ্গে ও'র জীবনের পাতাও তার সঙ্গে যেন তাল মারার তালে থাকে নতুন পাতা পাল্টাবার। তার প্রধান কারণ—খবরের কাগজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও'র মনটা এখানকার মাটি ছেড়ে কোন দূরান্তে পাড়ি দেবার জন্যে মনে মনে মেতে ওঠে। সেই দূরান্ত দেশের রাজনৈতিক দলাদলিতে তুমুল তর্কাতর্কির তরঙ্গভঙ্গে ভাসিয়ে দিতে ও'র মনটা তরল হয়ে মনে মনে মেতে বেড়ায়। কালিতে আর ছাপার অক্ষরে কাগজের পাতায় দেখা যায় যে, ইয়োরোপে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। জার্মানির সে কি জাঁক, হিটলারের সে কি হুমকি— অলক ভাবে—অত জাঁক ভাল নয়। হিটলারের 'গুজ স্টেপের' গমকে পৃথিবীর হার্ট-পেলপিটেশন। এখন বাঁচলে হয়! ও' আপন মনে কপচায় 'অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে পড়ে যাবে, বেশি নিচু হোয় না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।' ইংরেজদের অতটা অ্যাপিজিং পলিসি—ওদের অত 'মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলির তলে' মনভাব ও'র মোটেই মনঃপুত হয়না। এখন, বিলেতে থাকলে, ওফ্! ও'র কি উত্তেজনা···বন্ধুদের সঙ্গে এই সব ঘটনার কি ঘনঘটা আলোচনা চলত

এতক্ষণ। কি জানি কেন ফ্যাসিস্ট জার্মানির আর ইটালির কথায় কথায় অমনিতর হুমকি ও'র কাছে নিছক বেয়াড়াপনা মনে হয়। তারপর যখন আইনস্টাইন, টমাস মানের মত লোকের জার্মানি থেকে দূর হতে হল, তখন বুঝল—এদের আর বেশি দিন নেই।

পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি দেশের প্রতিই ও'র অপরিমেয় অনুরাগ। বলতে গেলে একরকম অলকের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি ও-দেশেরই পরিবেশে জমাট বেঁধেছে। যখন এ-দেশের দরিয়া-কিনার ছেড়েছিল, তখন তো ও'র বিলকুল ছোঁড়া-বয়েস। তাইতো ইয়োরোপে কোথাও কিছু ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে ও'র বেদনা বোধ হয়। সে বেদনা-বোধ ও-দেশী লোকের তুলনায় কোনমতেই কমতি তো নয়—বেশিও হতে পারে। বিলেতেই তো বেশির ভাগ দিন কাটিয়েছে ও'। খাঁটি ইংরেজরা মানুষের মত মানুষকে সত্যিই শ্রদ্ধা করতে জানে। অবিশ্যি মাইকেল ওডাআর অথবা এ-দেশে অবস্থানকারী ট্যাস-মার্কা আই-সি-এস কিংবা কারবারী বড়-সাহেবরা নয়—ও-দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ইংরেজরা যে সব গুণের অধিকারী ভারতবর্ষের লোকেরা যদি তার পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্য হত, তাহলে কোন কথাই ছিলনা।

ও-দেশী লোকেরা যে কত বড়, কত অশেষ গুণে বিভূষিত তার ইয়ত্তা নেই—ও' ওদের সে গুণাবলী অস্বীকার করবে কোন মুখে? খেতাবের লোভে নয়, সওদাগরী অফিসে চাকরির লোভও ও'র নেই। তাই ও'র যে ও-দেশের উপর শ্রদ্ধা, সেটা নিতান্তই ওদের গুণের সাক্ষাৎ পরিচয়ে—গাওআর স্ট্রীটের গোয়াল ঘরের আওতায় বাড়ন্ত দিশি কভেনেন্টেড অফিসারের পো কিংবা ভারতীয় ঝানু আই-সি-এস-এর ছা সব—যারা বিলেত গিয়ে স্বরাজ-মার্কা উগ্র ক্ষত্রিয় হয়ে কর্নার হাউসে পরিবেশনকারিণীদের কাছে তড়পে বেড়ান, তাঁরা ও'র এই রকম সাদা-চামড়া প্রীতি, তথা সাহেবদের সংগুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাকে দাস মনোবৃত্তি

বলে যতই গাল পাড়ুক না কেন—অলক নিছক মুক্ত পুরুষ! ও'র মন, দাস মনোবৃত্তির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনা, অসম্ভব! আদতে সত্যি সত্যিই ও' যেন সব দেশেরই লোক, সব দেশই যেন ও'র, তাই দেশের প্রতি নাড়ির টান থাকলেও 'স্বদেশ-মার্কা' অন্যায়ের প্রতি দোষাবলীর উপর অকারণ মোহ হতে ও' মুক্ত। যেখানে মসলিন তৈরি হত সেখানে চটের মত খদ্দরের বাহাদুরি ও'র কাছে বোকামি কিংবা ন্যাকামি বলে মালুম দেয়। অন্য দেশের নানা ভালো দিকের প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টি দিতে ও' কিছুতেই কমতি করতে পারেনা। যতই না কেন নিজের দেশকে ও' ভালবাসুক।

আছেই তো ইংরেজদের প্রতি ও'র নিশ্চিৎ অনুরাগ, কারণ দেখেছে মানুষ হিসেবে সত্যিই ও'রা উঁচু চিজ। ও-জাতের বুদ্ধি বিবেচনাশক্তি, সবার ওপর নিয়মানুবর্তিতা তুলনার তুলাদণ্ডে অনেক ভারি দেখা যায় ওজন করলে। ভারতবর্ষের সওদাগরী অফিসের বড়-সাহেবদের কথা বলছি না। ও-দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের অতি সাধারণ সভ্যরাও যে সব গুণাবলীতে গুণধর, যে সব ভব্যতায় ভারাক্রান্ত, তার ছিটেফোঁটাও যদি এ-দেশের স্বদেশীয়-মার্কাদের থাকতো, তাহলে কোন কালে স্বাধীনতার সাবালকত্ব ঘটত। সারা ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক আত্মচেতনা সে তো ঐ সাদা-চামড়ার কৃপায়। নানা টুকরোয় নানা সামন্তরাজ্যে দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষে ওদের একছত্র নিয়মতান্ত্রিক আধিপত্য যে একত্ববোধ আনয়ন করেছে, একথা আজ বুকে হাত রেখে কেউ অস্বীকার করুক তো দেখি? সবার ওপর এ-দেশের কৃষ্টি—সে চিত্রকলা থেকে শুরু করে সাহিত্য, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব যাঁয় ধর্মতত্ত্ব অবধি আমরা যেটুকু সচেতনতা লাভ করেছি, নিজের দেশের অতীত গৌরব সম্পর্কে আজ যেটুকু অবহিত হয়েছি, তা সব ওদেরই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দয়ায়। আজ কলা, কৃষ্টি, সমাজে-

সাহিত্যে যেটুকু আমাদের দেশের প্রগতি ঘটেছে, তা বুকে হাত রেখে বলতে গেলে বলতে হয়, ওদের পা ফেলার সঙ্গে পা মেলাতে গিয়েই সম্ভব করেছি। উডরফ সাহেব না থাকেলে কোথায় কে জানতো আমাদের দেশের তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম! হ্যাভেল সাহেব সহায় না হলে কোথায় থাকতো আচার্য অবনীন্দ্রনাথের আসন? সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্যের ভীম বিভীষণ গোলার কোন কালে ধোঁয়ার মত ধূলিসাৎ করে দিত ঐ শিল্পাচার্যের উচ্চাসন। এ-কথা অস্বীকার করলে চলবে কি করে, যে রোনাল্ডসের মত লাট না থাকলে তখন, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট—খোলবার আগেই তো লাটে উঠতো। বেচারা রবীন্দ্রনাথ—বেনাবনে মুক্তফল! তাঁর ওপরেও এ-দেশের লোকেরা কি কম তড়পেছে—'পায়রা কবি' থেকে শুরু করে ডি, এল, রায়ের চোখ-রাঙানি অবধি এমনিতর নানা পুরস্কারের পরই তো তাঁকে গাইতে হয়েছিল "যদি কেউ না আসে, তবে একলা চলরে"। তাঁর বিশ্বভারতীর নিঃস্ব অবস্থায় তখন সত্যি সত্যি কেউ আসেনি। দেশের লোক কেবল উপহাস করেছে তখন। সে সময় কিন্তু এল এণ্ডরুজ আর পিয়ার্সন সাহেব—আর খাঁটি ইংরেজ সাহেব! এই এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন আর এলমার্স্ট সাহেবের মত নিঃস্বার্থ বিদেশী কর্মীর বুকের রক্তেই বোলপুরের ঐ ভুবনডাঙার মাঠ শেষকালে ভুবনবিখ্যাত হওয়ার কতখানি সাহায্য পেয়েছে, তা ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। ধর্ম! তাও বিবেকানন্দের পেতে হয়েছিল অ্যামেরিকান পিঠ-চাপড়ানি—বেলুড়-মঠে ঐ বিশাল মন্দির—অ্যামেরিকান ডলারের দৌলতেই। সবার ওপর এই যে আমাদের দেশাত্মবোধ, তাও প্রকারান্তরে ওদেরই শিক্ষার সাহায্যে জাগ্রত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। দেখতে গেলে, প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য দেশনেতাই ও-দেশে গিয়ে তারপর দেশাত্মবোধের দর্শন লাভ করেছেন।

এখন যদি ও-দেশে যুদ্ধ লাগে তাহলে নিশ্চিত অলক ও-দেশে গিয়ে ওদের কোন না কোন সাহায্যে লাগবার চেষ্টা করবে—ও' শান্তি-সেনা রচনা করতে চেষ্টা করবে নতুবা সেবা-বাহিনী! এ-চেষ্টা ও'র অবশ্য-করণীয়।

নাঃ, অলকের বেশিদিন অপেক্ষা করতে আর হলনা। সেদিন পয়লা সেপ্টেম্বর—খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণে দেখল : জার্মানি পোলাণ্ডের বুকে পা বাড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ডও তারপরই সত্যি সত্যিই এবার করেছে যুদ্ধ ঘোষণা। একি, এ-দিকে জাপানও যে তড়পাচ্ছে। ও'র মন এবার চঞ্চল! এই অকর্মাদের অলসতার অসার আসরে কাঁহাতক কাটানো যায় দিন!

ওঃ! সময়গুলো ভ-হু শ্বাসে কেটে গেল দেখতে দেখতে—এতগুলো দিন ভারতবর্ষের মাটিতে কোনখান দিয়ে যে কোথায় কস্কে গেল, ও' ধরতেই পারলনা কিছুতে। কোথায় না ও' ভেবেছিল দেশে ফিরে লাগবে বাংলা-দেশকে নিজের মনের মত তৈরি করার চেষ্টায়—তা না—ছি-ছি, পাণ্ডুয়ায় নবমঞ্জরির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আজ ওর মনের নাকে নিতান্তই নোংরা শিকনির মত সড় সড় করতে লাগে। অনুশোচনায়, আপসোসে ও' উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ও'র যুক্তি-বিবেচনাবোধ ও'র নিজের ওপর ও'কে দারুণ বিতৃষ্ণ করে তোলে। ও' ভাবে, এই সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের যে সব অনাচার ও' মনে মনে এতদিন একান্ত ঘৃণা করে চলছিল—নিজের অগোচরে নবমঞ্জরির সঙ্গে ও'র ঐ সম্পর্কটা আজতক তারই কী করেনি কতকটা পৃষ্ঠপোষকতা?

ও' ভাবছে, ভাবতে ভাবতে সকালবেলার পড়ানোর সময় তখন যে শেষ সীমায় এসে পৌচেছে, তা ও'র খেয়াল নেই। হঠাৎ চন্দ্রমুখী পরিচারিকার আবির্ভাবে ও'র চিন্তায় পড়ল পরিসমাপ্তির পরিচ্ছেদ—রাজাসাহেবের আহ্বান এসেছে।

পড়ানোর আহ্বান আসলেও সেদিন মধুমালতীকে পড়ানোয় অলকের কেমন যেন মন লাগলনা। ক্রমাগত নানা চিন্তায় ও' অন্যমনস্ক হয়ে ঠোকর খেতে লাগল।

মধুমালতী বললে: "আজকে অনেক দেরিতে পড়া শুরু হয়েছে, তাই খবরের কাগজটা সবটা পড়া হলনা ঠিকমত। কাগজটা আর একবার সন্ধ্যার দিকে আসলে পড়া যেতো--যুদ্ধের খবরটা জানাই হলনা ভাল।"
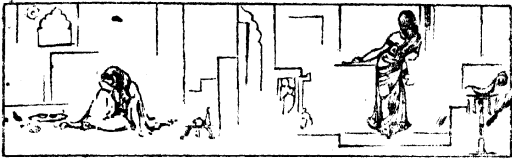
দুপুরের রৌদ্রময় দাপাদাপি কমে এসেছে। ব্যাড্‌মিন্‌টান খেলার চত্তরে পৃটায়েৎএর সঙ্গে পাল্লাটাও জুৎসই হলনা···বিলেতে সত্যি সত্যিই যুদ্ধ—এইটেই ক্রমাগত ও'র মনে চক্রাকারে পাক খেতে শুরু করেছে। সন্ধ্যায় মধুমালতীকে আজ আবার খবরের কাগজ থেকে এই যুদ্ধের তথ্য ব্যাখ্যা করতে হবে—নাঃ, আর পারছেনা এ-সব ও'—মেজাজ বিগড়েছে ও'র।·. আজ সত্যি সত্যিই ও' ক্লান্ত হয়ে অকারণ উদাস হয়ে উঠেছে—কোন কিছুতেই মন বসছেনা। খেলার শেষে ব্যাড্‌মিন্‌টান খেলার পরিপাটি চত্তরের প্রান্তে রাখা একটা চেয়ারে বসে আকাশে নক্ষত্রের নিত্যকার দিপালী উৎসবের পানে চেয়ে রইল, একটা উদাস অবসাদময় নজর নিক্ষেপণ করে। চাঁদ উঠল। পূর্ণিমা না হলেও বেশ জোৎস্না! সে জ্যোৎস্নার আলোয় হেনা-বন ফুঁপিয়ে উঠছে। সে আলোয় মন্দিরটা সাদা শ্বেত পাথরের তৈরি বলে মালুম দিচ্ছিল। এমন সময় আচমকা ওর মনে এল—মধুমালতীকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাবার কথা আছে। ও আলিস্যি ভেঙে উঠল। প্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দের অলি পেরিয়ে পৌছবে এসে পড়ার ঘরে, এমন সময় সেই জমে-ওঠা অন্ধকারের আড়ালে ওৎ-পেতে-থাকা কে যেন ও'র ঘাড়ে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—শিকারের ওপর বাঘেরা যেমন ঝাঁপ খায়, ঠিক তেমনি। শোনা যায়ব াঘের গায় নাকি এত জোর থাকে, যে বড় বড় মোষের টুঁটিটা ধরে ছোট ছোট নদী অনায়াসেই পারাপার হয়ে যেতে পারে লাফ মেরে। নিশ্চিৎ পারে। তা নৈলে কোমর

ধরে অত অবলীলাক্রমে ঝট করে অন্ধকার কুঠরিতে কেমন করে এক ঝটকায় সরিয়ে নিল—রোগা হলেও অলকের শরীরটা তো কিছু কম উঁচু নয়! বাঘের চেয়ে বাঘিনীদের শক্তির সঙ্গে সাহসও সত্যি অসম্ভব।

রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি চত্বরে যে চর আছে—প্রত্যেকটি ঘুলঘুলিতে যে ঘুরঘুরে পোকার মত জোড়া জোড়া সজাগ চোখ সর্বদা চকিবাজির মত ঘুরছে—সেই দিনই অলক অবগত হল, যে দিন পাটমহাদেইর ঘরে খাবার পিঁড়ের পিঠে চড়ে অলক তাঁর আকার ইঙ্গিতে অনুভব করল—যে এবার পাটমহাদেইকে বাস্তব কিছুর বিনিময়ে সন্তুষ্ট না করলে, ওঁর এবং 'কন্ধ'-কন্যার এই বলিকুদ রাজপ্রাসাদে রাত পোহালে কালরাত্রির ঘনিয়ে আসতে বাধা।

পাটমহাদেই প্রকারান্তরে ব্যক্ত করেছেন, যে মধুমালতীর সঙ্গে সংযুক্ত সেদিনের রাত্রের অনিচ্ছাকৃত সেই হামলায় ওঁর হুমড়ি খাওয়া ঘটনা করতে বাধ্য হবেন···

অলক পাটরাণীর এই একটি প্যাচে—চিৎপটাং! নিরুপায় অলক—বালকের মত বিলকুল বেয়াকুফ বনে গেছে। কলিঙ্গের জাঁতি-কলে সুপুরির মত তথাকথিত বিশ্ব-বকা বাংলা-দেশের এই খোকাটি এবার কুচি কুচি হবার উপক্রম।

দুপুরে বয়স্থা পাটরাণীর অভিজ্ঞতাপূর্ণ দুরন্তপনার দরিয়ায় ভেসে এসে, হাবুডুবু খেতে হয় নিত্য রাত্রে মধুমালতীর উদ্দাম উত্তেজনাময় মদমত্ত বিহ্বলতার বন্যায়।

সকাল-বেলার চেয়ে মধুমালতীর খবরের কাগজ পড়ার পাট আজকাল সন্ধ্যার আসরেই এসে ঠেকেছে। রাজাসাহেব যখন গাঁজা ভাঁর মোদকের নেশায় ঢুলতে থাকেন, তখন অলকের মুখের সামনে এই কাগজের বুকে উপুড় হয়ে ও' কাগজের ইংরিজি অক্ষর আয়ত্তের ফাঁকে ফাঁকে আস্তে আস্তে গুঞ্জন করে ওঠে—

"…কাঁহিকি কোকিল ডাকুরে অবেলে
এখুনি বঁধু টানিছে ছাতিরে
অধরে পড়িসে চুমা দিলা যরে…"

একটানা এই সুর করুণ উদাস বাউল কিংবা ভাটিয়ালির টানের মতই অনেকটা। অলক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভুল হয়ে যায় পড়া, ও' থেমে মধুমালতীর দিকে চায়। মধুমালতী তখন গান থামিয়ে অলকের চোখে চোখ মেরে ফিস ফিস করে বলে—"শিমলি ফুলে রাতা রাতা, মাঝিরে মুহুষে গুটে কথা"—অলক এই ছড়ার মানে বুঝবার আগেই শুয়ে থাকা রাজাসাহেব ওপাশ থেকে এপাশ ফিরে হাই তোলেন—অমনি সব আস্তে কথার ফিসফিসিনিতে ফিনিসিং টাচ হয়ে যায়—আবার জোরে জোরে আরম্ভ হয় খবরের কাগজ পড়া।

রাজাসাহেব মধুমালতীর পড়াশোনায় অমনিতর মন দেখে খোস মেজাজে সেইখানে শুয়ে শুয়েই দুটো মোদক পুরে ফেললেন মুখে—তারপর প্রকাণ্ড তাকিয়াখানা জড়িয়ে সেই খানেই শুয়ে পড়ে শুরু করেন নাক ডাকাতে। মাস্টার অর্থে অলক তখন পড়া শেষ করে তার কোয়ার্টারের দিকে এগিয়েছে…আগে আগে মধুমালতী মৃদুগলায় গেয়ে ওঠে—

"চাঁদুনি রাতে কহিবু কথা
…মোর বাহু তোর ভিড়িলা লতা…"

মধুমালতী মাস্টারকে পাবার পর যেন উপচে উঠতে চায়—সমস্ত ক্ষণই ও' আজকাল গুনগুন করে যেন বসন্তের মৌমাছি।

আবার সেই অন্ধকার অলিন্দের অলি!—মাস্টার ফেরতে থমকে যায়। না, যা ভাবা যায় তা নয়—বাঁশের কঞ্চি কিংবা পেরেক থাক। জানলার কোণ—কোনটাই নয়, মালতীলতার কাঁটায় অলকের পাঞ্জাবিটার একটা দিক গেছে আটকে—এখন পাঞ্জাবিটার অর্ধেক ছিঁড়ে চলে আসতে হয়, নয় তো নিকুঞ্জে কাটাতে হয় মধুরাত।

মালতীলতার মালঞ্চে মধুরাত যাপন ক্রমশঃ অনিচ্ছুক অলকের কাছে আনে শুধু বিবমিষা—পাটমহাদেইর পাল্লায় দিবসগুলোও বিবশ, বিষাক্ত! আঁখির আগায় শর্ষে ফুলের আবাদ আরম্ভ হয়ে গেছে…

কিন্তু সেদিনকার ঘটনা—হল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই যেমন আকস্মিক তেমনি সাজ্ঘাতিক। অলক তখনো পাটমহাদেইর বিশ্রাম-কক্ষে। রুদ্ধ দ্বারে শোনা গেল রুদ্র-করাঘাত। অলকের দিব্য দৃষ্টি উন্মোচনের সেই হল সূচনা—ওর কুলকুণ্ডলিনীর শিকল সেই আওয়াজে হঠাৎ যেন ছিটকে গেল খুলে। অলক ঘরে বসে চোখে মুখে মালুম করতে লাগল শুধু চোখ ধাঁধানো অন্ধকার। এত বছর ধরে ও' শুধু ঘুঘু দেখেছিল, আজ চোখের সামনে ফাঁদ দেখে ও' ফেঁসে যাবার দাখিল।

কিন্তু পাটমহাদেইর ভয়-ডর বলে কোন পদার্থই যেন নেই—সত্যি, বাঘিনীদের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহস—বাঘেদের বিলকুল বসিয়ে দিতে পারে পথে। পানের বাটা থেকে মুখে খানিকটা পান আর গুণ্ডি পুরে, অলককে পাশে গল্পির মত বাক্স-প্যাটরার গুদোমটার মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে নির্বিকার চিত্তে পান চিবুতে চিবুতে

...চেঁচিয়ে ওঠেন—"কেরে এত বড় আস্পর্ধা, আমার বিশ্রামের এত জোরে দরজা ঠেলছিস্—চন্দমুখী আবার বুঝি ভাং খেয়েছিস দুপুরে—"

তারপর দরজা খুলে পাটরাণী যখন সামনে দাঁড়ালেন—তাঁর পদ-... ও ব্যক্তিত্ব বিজড়িত রোষকষায়িত নয়নের সামনে মুহূর্তে বি...জিত হল স্তব্ধতা—সেই স্তব্ধতায় দেখা গেল, কঙ্ককন্যা মধুমালতী পিছনে, আর সামনে স্বয়ং দাঁড়িয়ে বলিকুদের রাজাসাহেব।

রাজাসাহেবকে মধুমালতী সমেত দেখে রাণীসাহেবা মুহূর্তে মুখের ভাব পরিবর্তন করে স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা সহকারে বললেন—"পরম সৌভাগ্য—আজ কি পূর্ব্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় হয়েছে—আজ কার মুখ দর্শন করে সকালে ঘুম ভেঙেছিল···যে মহারাজের এই অবেলায় দর্শনলাভ!—এই মধুমালতী দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভালই হয়েছে এসেছিস, আমার পা-টা একটু টিপে দেতো···মহারাজাধিরাজ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভিতরে আসুন, বসুন। আমি পান সেজে দিই।"

মধুমালতীর তুরুপ পাটরাণী চক্ষের নিমেষে হাত সাফাইয়ে কি করে তাঁর হাতে নিয়ে এলেন—রাজাসাহেব অবধি বনে গেলেন বোকা। দেখা গেল, রাজাসাহেবের সামনে তাঁরই নয়নের মণি, তাঁর কে দোলানো বালিকা, মধুমালতীকে দিয়ে পদসেবা···

মধুমালতী রাগে, অপমানে ভোঁদড়ের মত ফুললেও, পাটরাণীর খের সামনে তাঁর এই অধিকার নাকচ করার ক্ষমতা স্বয়ং রাজা-সাহেবেরও নেই।

—১২—

সেদিন বিকেল থেকে অলকের পাত্তা পেল না কেউ। মধুমালতীর

মন খারাপ, তাই পড়ার ঘরেও জ্বলেনি সেদিন বাতি। হয় তো কাজ না থাকায়, গেছে স্টেশনের দিকে বেড়াতে—মাঝে মাঝে যেতো, তেমনই। কিন্তু রাত্তিরে খাবার সময়ও মিলল না ওর পাত্তা, তখন সকলে বিচলিত হলেও আসল খোঁজাখুঁজির শুরু হল তার পরের দিন সকাল থেকে।

রাজাসাহেব ছামুকরন পট্টনায়েককে ডেকে অলকের হদিস ক[illegible] হুকুম দিতে যাবেন, এমন সময় যে বরকন্দাজটি রোজ ডাকের[illegible] রাজাসাহেবের কাছে আনে প্রাসাদের চিঠির বাক্স থেকে—সেই এক খোলা চিঠি এনে দিল। অলক লিখেছে, স্বপ্নে আদেশ হওয়ায় সিমাচলমের নৃসিংহদেবের দর্শন করতে চলেছে—দেবতার হুকু[illegible] যাত্রার পূর্বে যেন কেউ না জানতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে না ব[illegible] চলেছে—তাকে যেন রাজাসাহেব নিজগুণে ক্ষমা করেন।

পাটরাণীর পাথরচাপা হৃদয় আজ যেন বাঁধ ভেঙে উথলে উঠে গানের উৎসে—

"হেথা মুণ্ডি করি যাউছ কুমার
এবে হইবি কাহারি
ঘরে ছন ছন বাহারে মন
কিপরি দোখাবি [illegible]লিয়া দন…"

ও দিকে তখন মধুমালতীকে নন্দারাণী বলছে—অলক সেই চ[illegible] গেছে এখান থেকে—মধুমালতী একে গত কালের ঘটনায় বিষা[illegible]